

420





মহামহোপাধ্যায়  
শ্রীযুক্ত রাখালদাস গায়রত্ন মহাশয়ের  
কালীবাস ।

মহামহোপাধ্যায়োপাধিক  
শ্রীশিবচন্দ্র সার্বভৌম  
সঙ্কলিত ।



কলিকাতা,  
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট হইতে  
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ।

Printed at  
Messrs J. G. CHATTERJEE & CO.'S PRESS,  
44, Amherst Street, CALCUTTA.

সন ১৩১২ ।

---

মূল্য ১ টাকা মাত্র ।





ঐহর্গা ।

## উৎসর্গ পত্র ।

সতীকুলশিরোমণি, আশ্রিতপালিনী, অন্নপূর্ণাক্রপিনী,

### হাতুরার মহারানী

তাঁহার পবিত্র-নামে উৎসর্গীকৃত এই

কুদ্রোপটোকন গ্রহণ করুন ।

বিনিঘহ-মহাশনি-দ্বিষদরশ্মি-বিদ্রাবিণী  
ধরাপ্রথিত-হাতুয়া-শুভবিমানমালম্বিনী ।  
সদাধিদবহারিণী জগতি কাপি কাদম্বিনী  
মহামাহিমশালিনী বিজয়তাম্রহীপালিনী ॥

তত্সূনুলভতাং গণেশগুরুতাং কৌমারিকীং দীরতাং  
যস্মাত্ সা শরণাগতায় জননী স্নেহপ্রদা চানন্দদা ।  
লব্ধ্বা তত্তনয়াপি সিন্ধুতনয়া-দৃষ্টিং শুভাং শোভতাং  
ইত্থং নিত্যমহং পরং পুরমিদং পাদদ্বয়ে প্রার্থয়ে ॥



## নিবেদন ।

যাঁহার উদ্বেগরাশি            ভবে গিয়াছেন নাশি'  
মা তোমার স্বর্গগত স্বামী,  
স্বামী তব স্বর্গে গেলে            যাঁহার উদ্বেগ এলে  
বিক্রাচলে ঘুচায়েছ তুমি,  
মাগো এই ক্ষুদ্র গাথা            তাঁহারি জীবন-কথা  
সে জীবন তোমারি সংসারে  
ল'য়ে আত্মপরিজন            অনুদ্দিন, অনুক্ষণ,  
সুখে দুঃখে স্মরিয়া তোমারে,  
যাপিছে বার্ষিক্য-দিন            অত্ৰ যত আশা ক্ষীণ,  
হুটী মাত্র ভিক্ষা বিভূ-পাশে—  
তোমার কল্যাণ ; আর,            ভবরজ্জু আপনার  
যায় যাহে চিরতরে থ'সে ।  
ধন্য সে বিবুধ-মণি            অন্নপূর্ণা-স্বরূপিণী  
তুমি যার জননীর প্রায়,  
রাজ্যেশ্বরী ধন্য তিনি            নিত্য পূজিছেন যিনি  
নররূপি-পূর্ণ-দেবতায় !  
শক্তি যথা শক্তিদরে            স্মৃত যেন শক্তি ধরে  
সিদ্ধুস্মৃতা পালুন স্মৃতায়,  
পূর্ণ আয়ুঃ পাও সবে,            চিরানন্দ চিরোৎসবে  
রাজ্যেশ্বরির বিরাজ' ধরায় ।







সত্যেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী ।





অসঙ্গের মস্তকের চূড়া পূজাপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত  
রাখালদাস ভাষরত্ন মহাশয় ভট্টপন্নী পরিত্যাগ করিয়া কালীবার্ণ  
গমন করিলে পর হঠাৎ, দেশের বহু-সম্মত ব্যক্তি কর্তৃক সর্বদাই আমরা  
অনুরক্ত হইয়া আসিতেছি বাহাতে বঙ্গদেশে তাঁহার স্মরণ-চিহ্নরূপে  
একখানি পুস্তক লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু এই কার্যটি সম্পন্ন করা  
আমরা নিতান্ত সহজ জ্ঞান করিতে পারি নাই। কারণ, কেবলমাত্র সন-  
তারিখ সহযোগে বাহু-ঘটনাবলীর সমাবেশ ভাষরত্ন মহাশয়ের জীবনের  
পক্ষে পথ্যাপ্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নহে। আমাদের বিশ্বাস এই,  
যাহার জীবনে যে অংশে অলৌকিকত্ব, চরিতাবলী লিপিবদ্ধ করিতে  
হইলে তাঁহার জীবনের সেই অংশ বিশদরূপে বিবৃত করা সর্বপ্রধান  
প্রয়োজনীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, ভাষরত্ন মহাশয়ের জীবনের বাহা  
অলৌকিকত্ব, তাহা সর্বসাধারণের অনূভূত হইবার বস্তু নহে। শাস্ত্র-  
তত্ত্বে দীর্ঘকাল শ্রম করার পর, শাস্ত্রোক্ত-প্রথায় বুক্তিবাদ পর্যালোচনা  
করিবার পক্ষে যাহারা তীক্ষ্ণদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, ভাষরত্ন মহাশয়ের  
অলৌকিকত্ব তাঁহারা ইমাত্র অনুভব করিবার অধিকারী। যাহার  
অলৌকিকত্ব অনুভব করিতে হইলে, তুলা পথের পথিক হইয়া অগ্রে  
দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া লইতে হয়, সর্বসাধারণকে তাঁহার অলৌকিকত্ব



সম্যাক্রূপে প্রদর্শন করান-সম্ভবপর হইতে পারে না। জীবনের যে যে অংশ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই মাত্র এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অতএব, এই পুস্তকখানি প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবনচরিত নহে। জীবনের বিশেষ-ঘটনা উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পরিচায়ক মাত্র। কোনও যোগাতর ব্যাক্ত-কর্তৃক ভবিষ্যতে জীবনচরিত রচিত হইলে, এইগুলি তাহার উপকরণ-রূপে গৃহীত হইতে পারিবে।

তায়রত্ন মহাশয়ের জীবনে যেন তিনটি জীবনের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। কবিজীবন, অধ্যাপকজীবন ও ঋষিজীবন। তায়রত্ন মহাশয় আপনার কবিজীবনকে কোনও রূপ প্রতিষ্ঠা-অর্জনে নিয়োগ করেন নাই। কিন্তু শেষোক্ত দুইজীবনে রাঢ় বঙ্গে সর্বত্র তাঁহার ছাত্র, শিষ্য এবং ভক্তসম্প্রদায় পরিগঠিত। আমরা এই পুস্তকে উক্ত তিন জীবনেরই কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কাল এক্ষণে ভাল নহে। দেশের হিতকর বোধে শিক্ষামার্জিত-বুদ্ধি, পক্ষেশ-মনোবিগণ যে বিষয়ের শিক্ষক, অসম্যাক্-পরিপক্ববুদ্ধি, আত্মাভিমানী, যুবক এক্ষণে অনেকক্ষেত্রে সেই বিষয়ের সমালোচক। পথের প্রকৃত পথিকে যে বিষয়ে তত্ত্বাত্ত্বের নির্দ্বারক, স্বতন্ত্র-পথচারী, লৌকিকবুদ্ধি-সকল, অপরিণতবয়স্ক ব্যক্তি সেই বিষয়েরই হয়তো পরীক্ষক। এইরূপ স্ব-স্বপ্রধান বিচারক-পরিব্যাপ্ত সময়ে, সকল সিদ্ধান্ত সকলের নিকট সমানভাবে পরিলোকিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি দেশের উপকারার্থ আত্মজ্ঞান মতে চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে অকর্তব্য নহে, এইরূপ বিশ্বাস থাকায় এই পুস্তকটান আমরা স্বাধীনভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এবং স্বদেশবাসীদিগের জ্ঞাত ভগবানের নিকট সন্মান্তঃকরণে প্রার্থনা করি,

ପୃଷ୍ଠା ।	ପଂକ୍ତି ।	ଅନୁକ୍ର	ପ୍ରକ୍ର
୧୨୭	୧୧	ଅନୁସନ୍ଧ	ଅନୁସନ୍ଧ
୨୦୭	୭	ଲୋହଗିନୀ	ଲୋହମଣିନୀ
୨୭୬	୧୭	ପୁରୀତତିତ	ପୁରୀତତିତେ
୨୭୭	୧୨	ପ୍ରାମାନ୍ୟ	ପ୍ରାମାନ୍ୟ
୨୯୧	୧୨	ମୌମାଂସା	ମୌମାଂସାର ବିଷୟ
୨୮୨	୧	ବିଭକ୍ଷେତ୍	ବିଭାଗକ୍ଷେତ୍
୨୮୬	୬	ଜୀବାନଂ	ଜୀବାନାଂ
୨୮୬	୧୦	ଭେଦ-ସଂସ୍ଥାପନେ ସେ ତର୍କସିଦ୍ଧଦୋଷ }	ସେ ଭେଦ-ସଂସ୍ଥାପନେ ତର୍କ
୨୯୭	୧୦	ନିତ୍ୟା	ନିତ୍ୟା:
୩୧୨	୫	ପୁରାଣାଦି	ପୁରାଣାଦି
୩୦୨	୨	ପ୍ରାଣାୟାମ	ପ୍ରାଣାୟାମ
୩୦୨	୧୮	ପ୍ରାଣାୟାମ	ପ୍ରାଣାୟାମ
୩୨୦	୧୭	ମଜ୍ଞାନ	ମଜ୍ଞାନ



পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৫	১	অসীং	আসীং
১৬৯	৩	তদৈক্ষত	স ঐক্ষত
১৭২	১৮	অশ্নং	অশ্নং
১৭২	২৩	কর্তা	কর্তৃত্ব
১৭২	২৩	অব্যয়ত্বাবচ্ছেদে	অবিভাগাহিত্যাবচ্ছেদে
১৭২	২৩	অকর্তা	অকর্তৃত্ব
১৭৩	১	সহে	নহে
১৭৩	১৮	উৎপত্তি	উৎপাদক
১৭৫	৪	†	†
১৭৬	১৩	জলধারা	জন্তুজলধারা
১৭৬	২০	রক্ষন্তক	রক্ষ
১৭৬	২১	ত্রাসরেণু	ত্রাসরেণু
১৭৭	১	ভূতধারার	জন্তু ভূতধারার
১৭৭	১২	ত্রাসরেণু	ত্রাসরেণু
১৭৭	২২	ত্রাসরেণু	ত্রাসরেণু
১৭৯	২১	জুষমানো	জুষমাণো
১৮০	১৪	সমমেত	সমবেত
১৮১	১২	মুখ্যন্ত	মুখ্যাত্ত
১৯১	২০	ধম্মের	ধম্মীর
১৯২	১৯	সথয়া	সথায়ী

† ১৭৫ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তিতে “তৈজস পরমাণুমূলক।”—ইহার পরেই এই অ শব্দটুকু  
হইবে। বখা—“তৎপরেণষ্ট জল ভূতধিতরাস্বক।”



মহামহোপাধ্যায়  
শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের  
কাসীবাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

— ০০ —

ভট্টপল্লী-সমাজ ও বশিষ্ঠবংশের পরিচয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের  
জন্ম। পূর্বপুরুষ ও ভ্রাতৃবর্গের পরিচয়। পূর্বপুরুষের  
বঙ্গদেশে আগমন ও ভট্টপল্লীতে বাসস্থাপন বৃত্তান্ত।  
পাঠারম্ভ। বিবাহ। তদনুসঙ্গে পত্নী পুত্রাদি  
পরিজনেরও পরিচয় সমাপন।

ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া বঙ্গীয় বিষ্ণু-সমাজে বহুকালাবধি সম্মানিত  
হইয়া আসিতেছে। এই পবিত্র স্থান ভারত-রাজধানী কলিকাতা  
হইতে ন্যূনাধিক ২৪ মাইল উত্তরে, জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত, এবং  
পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর পূর্ব-কূলে অবস্থিত।

মহর্ষি বশিষ্ঠ-দেবের বংশ-সম্ভূত কতিপয় হিন্দু পরিবার এই স্থানে  
বাস করেন। স্বধর্ম-নিষ্ঠা ও পবিত্রতার জন্ত, বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের

মধ্যে, এই বংশের গুরুতা বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে। এই বংশে পূর্বাধি অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন নৈয়ায়িক ও স্মার্ত পণ্ডিত-গণ জন্মগ্রহণ করিয়া, ভট্টপল্লী-সমাজকে এইরূপ প্রাচীন বিদ্বৎ-সমাজের শীর্ষস্থানে সমাক্রুত করাইয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয় সন ১২৩৬ সালের ২৮শে ভাদ্র তারিখে এই পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পিতা ৮ সীতানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বেক্রপ ক্রিয়াকর্ম, দানাদি করিতেন, কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেন, বিষয়ী লোকেও সকলে তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না। তিনি জীবনে কত বস্ত্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতি বৎসরই শীতকালে চাদর ও বনাত দান ছিল। এতব্যতীত বিশেষ ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে ভাল শালও সদব্রাহ্মণে দান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরই পিতার একোদ্দিষ্টের সময় অতিষত্রে বিবিধ প্রকার খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিয়া দলহু সকল ব্যক্তিকে ভোজন করাইতেন, এবং ঐ সময় প্রতিবৎসরই ত্রিবেণী-সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আহ্বান করিতেন। বিশেষ বিশেষ সময়ে নবদ্বীপ-সাধারণও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এতব্যতীত দুর্গোৎসব, শ্রামাপূজা প্রভৃতিও যাবজ্জীবন করিয়াছেন। গোসেবা তিনি অসাধারণ ভাবে করিতেন। অকর্মণ্য জ্ঞানে অন্যে যে গাভী পরিত্যাগ করিতেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেই গাভী খরিদ করিয়া অনেক সময় হৃৎকবতী করিয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এত ক্রিয়াশীল ছিলেন যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ক্রিয়াকর্মে কেহ প্রশংসা করিলে অনেক সময়েই তাঁহাকে বলিতে শুনা যায় “বাবা বেক্রপ

ক্রিয়াকর্ম করিয়া গিয়াছেন, তাহার তৃতীয়াংশও আমি কুরিতে পারিলাম না।”

বিদ্যাভূষণ মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও স্ববাহবলে ধর্ম-ধন উপার্জনের দ্বারা এই সকল ক্রিয়াকর্ম দানাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অথচ নিজ সন্তানগণকে একেবারে নিরস্ত করিয়া যান নাই। স্কুল ভাবে অল্পবয়স পাইয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন, নিজের চারি পুত্রের জনাই বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশীলাভ করেন। তখন নান্দরত্ন মহাশয়ের বয়ঃক্রম আনুমানিক ৩৬ বৎসর। মৃত্যুর একমাস মাত্র পূর্বে তিনি কাশীবাস করিয়া-ছিলেন। তাদৃশ মহাত্মার অবস্থানে গ্রামের মঙ্গল, ইহা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় বিশ্বনাথ অধিক পূর্বে তাঁহাকে কাশীধামে লইয়া যান নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় অতীব রসিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সেই রসিকতা বাঙ্গালা মেয়েলি ছড়ার সময়ে সময়ে প্রকাশ করিবার গুরু ভার বিধাতা তাঁহার মস্তকে ফেলিয়া ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দুই বিবাহ ছিল। সপত্নী-বিবেশ বশতঃ জগতের চির-প্রচলিত নিয়মানুসারে যখন পত্নী-দ্বয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়া সাংসারিক কার্যে বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা ঘটিত, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎক্ষণাৎ এমন রসিকতাপূর্ণ মেয়েলি ছড়া বাধিতেন যে, পরিবারদ্বয়ের কলহ ঘুচিয়া গিয়া হাসি সঞ্চরণ করিবার উপায় থাকিত না। এখনও কোন' যুবক দুই বিবাহের নাম করিলে, ভট্টপল্লীর পাঁচবাটীর পাড়ার (অর্থাৎ যে পাড়ায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাস ছিল, সেই পাড়ার) বুড়ীরা নানারকম রঙ্গভঙ্গের সহিত বিদ্যাভূষণ ঠাকুরের রচিত ছড়া আবৃত্তি করিয়া দুই বিবাহের দোষ এইরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন শোনা যায়।

সাত জন্ম থাকি যেন  
 আইবড় হ'য়ে,  
 এমন স্ত্রের মুখে ছাই  
 (যে জন) করে দু'টো বিয়ে ॥  
 দুটো বিয়ের কথা কিছু  
 সংক্ষেপেতে কই  
 কত মজা দেখ'ব যদি  
 আর কিছু কাল রই ॥  
 টাকার উপর টাকার বোঝা  
 শাড়ীর উপর শাড়ী,  
 ভারে ভারে এনে যোগাই  
 তবু বদন ভারি ॥  
 সৃষ্টিছাড়া নূতন সৃষ্টি  
 এমনি মিষ্টি বচন,  
 অকারণে হিংসে সদা  
 মিন্সে জ্বালাতন ॥  
 ব'লে ক'য়ে গেলেম যদি  
 ছোট রাণীর ঘরে,  
 অমনি শুনি, “দূর হ'য়ে যাও  
 কাষ কি আছে মোরে।”

যত সাধি, অপরাধী,  
কেবল বলেন রোষে  
“মাথায় করে’ এনে ঘরে  
পায়ে হান, শেষে ।”  
বড় মহিমী, বল্ব কি হায়  
তাঁর ব্যবহার,  
প্রাণপণে মন যোগাই যদি  
তবু বদন ভার ॥  
বোঝা ব’য়ে মরেন শালা  
চোরের মতন সাজা,  
বুকে বসে’ দাড়ি ছেঁড়ে  
এই টুকু কি মজা !!  
কার সাধ্য কে টেক্তে পারে  
তুই সতীনের চোটে,  
যখন যিনি বলতে থাকেন  
মুখ দিয়ে খই ফোটে ॥  
বড় বলেন “সর্বনাশী  
তুই বাড়ীর দাসী,  
ছোট বলেন “কর্তা আমি  
কথা শুনে হাসি ॥”



প্রথম পরিচ্ছেদ ।

“আটকুড়ি” “চোক খাগী”

উভয়েরই বোল,

মাঝে মাঝে মারামারি

নিত্য গণ্ডগোল ॥

পাড়াপাশি, বড়ই খুসী,

মজা দেখেন বসে’ ;

যার জ্বালা, সেই জানে,

মিন্‌সে বেড়ায় ভেসে ॥

বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের বহুপরিজন সঙ্গেও পুণ্যবলে জীবনে কখনও তাঁহাকে শোক পাইতে হয় নাই। কেবল তাঁহার মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর এবং দুই বৎসর পূর্বে কনিষ্ঠা পত্নীর গঙ্গালাভ হয়।

বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের ঐ জ্যেষ্ঠা পত্নীর নাম বিমলা দেবী এবং কনিষ্ঠা পত্নীর নাম হরমোহিনী দেবী। প্রথম পত্নী বিমলা দেবীর গর্ভে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্ম। ৬ তারাচরণ তর্করত্ন ও ৬ অন্নদা-চরণ তর্কভূষণ নামে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আরও দুই কনিষ্ঠ সহোদর ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হরমোহিনী দেবীর গর্ভে ৬ অন্তরাচরণ বিদ্যারত্নের জন্ম হয়। ৬ তারাচরণ তর্করত্ন জ্যেষ্ঠ জ্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট নব্যপ্রাচীন সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া কাশীরাজের সভাপণ্ডিতরূপে ৬ কাশীধামে অবস্থান করতঃ কাশী সমাজে অসামান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পশ্চিম দেশীয় ৬ দয়ানন্দ পরমহংস প্রমুখ সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রীয় বিচার সভায় সর্বদা তর্করত্ন মহাশয়ের প্রাধান্য স্বীকার

করিতে হইত। ইহার কবিত্ব শক্তিও অসাধারণ ছিল। কেহ কোনও সমস্তা পূরণ করিতে বলিলে, তিনি সেইকণেই তাহা করিতে পারিতেন। ভ্রাতা অভয়াচরণ এবং অন্নদাচরণও স্মৃতিশাস্ত্রে উপযুক্ত অধ্যাপক হইরাছিলেন। কলতঃ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিবারের মধ্যে বাহার প্রতি দৃষ্টি করা যায়, কাহাকেও শাস্ত্রানভিজ্ঞ দেখা যায় না।

ভায়রত্ন মহাশয়ের পূর্বপুরুষগণও সকলেই কোন' না কোন' শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিয়া গিয়াছেন। পিতা ৮সীতানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। পিতামহ ৮গোপীনাথ তর্কালঙ্কার ন্যায়শাস্ত্রে এবং প্রপিতামহ ৮বিষ্ণুরাম তর্কসিদ্ধান্ত স্মৃতি শাস্ত্রে অধ্যাপক ছিলেন। বৃদ্ধপ্রপিতামহ ৮রাম গোপাল বিদ্যা-বাগীশের ন্যায় নৈয়ায়িক তৎকালে কুত্রাপি ছিলেন না। এই সকল মহাত্মারা কেবলমাত্র এইরূপ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির গৌরবে গৌরবা-ধ্বিত নহেন, প্রত্যেকেই এক একটি ঋষিবিশেষ ছিলেন, এবং অনেক সময় দৈব কার্য্য করিয়া দেব-দয়্য প্রত্যক্ষ করিতেন। কথিত আছে, এক সময় অবস্থা-বিপর্য্যয় সংঘটিত হওয়ায়, ৮রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সংকল্প করতঃ সংযতভাবে শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করেন। ঐ চণ্ডী-পাঠ শেষ হইবামাত্র, একটা ক্ষেমঙ্করী পক্ষিণী দক্ষিণদিগ্ হইতে উড়িয়া আসিয়া বিদ্যাবাগীশ ঠাকুরের নিকট একটা মোহর ফেলিয়া দেয়। তদনুসারে দক্ষিণদেশে গমন করতঃ, মেদিনীপুর জেলার দোয়ো পরগণায় বিদ্যাবাগীশ ঠাকুর ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ঐ ভূসম্পত্তি 'রামগোপাল চক' নামে অদ্যাপি অভিহিত হইয়া আসিতেছে, এবং ঐ সম্পত্তি নিবন্ধন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের বংশধরগণ এপর্য্যন্ত অন্নকষ্টে পতিত হন নাই। দক্ষিণ দিক্ হইতে পক্ষিণীকে আসিতে দেখিয়া দক্ষিণ দেশে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ভাগ্যোন্নতি হওয়া দেবীর

অধিপ্রেত, ইহা তাঁহার পিতা ৮ রঘুদেব ন্যায়ালকার ঠাকুর বৃষ্টিতে পারেন এবং তাঁহারই অনুমতি ক্রমে বিদ্যাবাগীশ ঠাকুর ঐরূপে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া উক্ত ভূমি, দান-রূপে লাভ করিয়াছিলেন।

স্বীয় ব্রাহ্মণ্য রক্ষার দ্বারা তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণ সন্তান কতদূর উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে ঋষি-গণের অলৌকিক চরিতাবলী যেমন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে, ভট্টপল্লীর পূর্বোক্ত ন্যায়ালকার ঠাকুরের জীবনী অন্বেষণ করিলেও সেইরূপ তাহার জাজ্ঞ্যমান দৃষ্টান্ত সকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কথিত আছে ন্যায়ালকার ঠাকুর সাধনাবলে সর্বজ্ঞ বিশেষ হইয়া ছিলেন। তাঁহার সর্বজ্ঞতা সত্ত্বেও যেরূপ অপূর্ব অপূর্ব কাহিনী ভট্টপল্লীর বৃদ্ধ-পরম্পরায় ও শিষ্য-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঙ্কিত হয়। বাহ্যিক বিবেচনায়, সে সকল এতদূর উদ্ধৃত হইল না। কিম্বদন্তী আছে, লোকে মৃত্যুর পূর্বে যেমন কাশীবাস করে, ন্যায়ালকার ঠাকুর সংকল্প করতঃ সেইরূপ গঙ্গাগর্ভে শতহস্তের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যু-সময়ে নানারূপ দৈব চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া জনরব আছে। এই সকল মহাত্মার অবস্থান সময়ে ধর্ম-পরায়ণ হিন্দু-সন্তানের চক্ষে ভট্টপল্লী, মহর্ষিগণের পুরাকালীন তপোবনের ন্যায় পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হইত। এক কালে ঈদৃশ মহাত্মারা ভট্টপল্লীর বশিষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুসন্তানকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই, বঙ্গব্যাপি-শিষ্যাবলীর বিস্তৃত শাখা প্রশাখার চক্ষে অদ্যাবধি ভট্টপল্লীর বশিষ্ঠ-সন্তানেরা অনেকেই দেব-ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন।

ভায়রত্ন মহাশয়ের পূর্বপুরুষের বঙ্গদেশে প্রথম আগমন ও ভট্টপল্লীতে বাসস্থাপন সত্ত্বে ইতিবৃত্ত এইরূপ। ন্যায়রত্ন মহাশয় হইতে

একাদশ পুরুষ উর্কে ৬গদাধর ঠাকুর নামে বশিষ্ঠ-বংশোদ্ভূত কানাকুজবাসী একজন বজ্রকর্ষদী মহাসুধী ব্যক্তি, তীর্থ-যাত্রা করিয়া সন্ন্যাসিক ভ্রমণ করিতেন। একদা শ্রীশ্রী ৬ জগন্নাথ-ক্ষেত্রে গমন কালে পশ্চিমমুখে বাঙ্গালা দেশে তাঁহার পত্নীর পঁভ-চিহ্ন লক্ষিত হয়। গর্তা-ক্রান্তা পত্নীকে লইয়া আর অগ্রসর হওয়া গদাধর ঠাকুর অবৈধ বিবেচনা করিলেন। অতঃপর রথ-যাত্রা সময়ে শ্রীশ্রী ৬ জগন্নাথ সন্দর্শন করিবার সংকল্প থাকায় তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। পত্নীর প্রসবাপেক্ষা না করিয়াই ঐ ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মা বকদ্বীপ বা বগুড়ি নামক স্থানে কোনও সুবিশ্বস্ত ভদ্র লোকের বাটীতে পত্নীকে রাখিয়া একাকী পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া আসিলেন। সেই স্থানে তাঁহার এক পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ট হয়। ঐ পুত্রের নাম জনার্দন। শিশু জনার্দনকে লইয়া তৎকালে কানাকুজে বাওয়া অসম্ভব বোধে গদাধর ঠাকুরকে অগত্যা বকদ্বীপেই অপেক্ষা করিতে হইল। তথায় নিজ পাণ্ডিত্য, অনুষ্ঠান ও দৈবী-শক্তি দ্বারা অচিরেই সর্ব-সাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করায়, অবশেষে বঙ্গদেশে স্থায়িতাবেই থাকিয়া গেলেন। অতএব জায়রত্ন মহাশয় হইতে একাদশ পুরুষ পূর্বে, বঙ্গীয় সন দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিৎনাধিক সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে, বঙ্গদেশে জায়রত্ন মহাশয়ের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস স্থাপিত হয়।

পরে জনার্দন ঠাকুর, পাঠান-অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বকদ্বীপ হইতে পূর্ব-বঙ্গে নরুপদ্রব-সমৃদ্ধিশালী প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে গমন করতঃ যমুনোপকূলস্থ ধূলিপুর নামক স্থানে বাস-স্থাপন করেন। ধূলিপুর বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত, সাতক্ষীরা সর্বাভিমানের আদীন। তথায় নানারূপ সাধনার দ্বারা ৬ জনার্দন ঠাকুরের পুত্র

নারায়ণ ঠাকুর সিদ্ধিলাভ করেন। কিংবদন্তী এইরূপ, তিনি গঙ্গান্নান করিবার জন্য প্রতাহ প্রত্যাষে ধূলিপুর হইতে ভাটপাড়ায় আগমন করিতেন। ভাটপাড়া ধূলিপুর হইতে তিন দিবসের পথ হইবে। সিদ্ধপুরুষ তপোবলে এই সুদীর্ঘ পথ প্রতাহই প্রত্যাষে গমনাগমন করিতেন। ভাটপাড়ার ভূম্যধিকারী হালদার বংশীয়গণ, এই অলৌকিক তপঃপ্রভাব জ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপরে অন্যান্য বহুতর আস্তিক ব্রাহ্মণ-সন্তানও তাঁহার শিষ্য হন। এই সকল পরিবারের অধস্তন বংশধরেরা অদ্যাবধি নারায়ণ ঠাকুরের বংশেরই শিষ্য। জমীদারেরা গঙ্গাতীরে গুরুর একটি তপস্শা-স্থান নির্মাণ করিয়া দিলেন। তদবধি নারায়ণ ঠাকুর সেই স্থানে থাকিয়া অনেক সময়ই গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিতেন। পরে ঐ স্থানে তাঁহার গঙ্গালাভ হইলে, তাঁহার পুত্র ৮রামনাথ ঠাকুর ধূলিপুর হইতে সপরিবারে আসিয়া গঙ্গাবাস করিলেন। অতএব ত্রায়রত্ন মহাশয় হইতে অষ্টম পুরুষ পূর্বে, ভট্টপল্লীতে তাঁহার পূর্ব-পুরুষের নিবাস স্থাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, রামনাথ ঠাকুর সপরিবারে ভাটপাড়ায় আসেন নাই। অস্থায়ি ভাবে সময়ে সময়ে আসিয়া তিনিই মাত্র ভট্টপল্লীর পিতৃ-আশ্রমে তপোজপাদি করিতেন। তাঁহার পুত্র ৮চন্দ্রশেখর ঠাকুর সপরিবারে ভাটপাড়ায় উঠিয়া আসেন।

যে সকল বশিষ্ঠবংশীয় মহাত্মারা এক্ষণে ভাটপাড়া উজ্জল করিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই পূর্বোক্ত সিদ্ধপুরুষ নারায়ণ ঠাকুরের বংশ-সম্মত, আহার পরিচ্ছদাদির সাত্ত্বিক নিয়ম, মংস্ত, মাংস প্রভৃতির ত্যাগ, শূদ্রাদির নিকট প্রতিগ্রহ বর্জন, যথানিয়মে ঈশ্বর আরাধনা ও হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত অন্যত্র কঠোর নিয়ম সকল অদ্যাবধি

ভট্টপন্নীয় সিদ্ধ-সম্ভানগণের মধ্যে বহুলভাবে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, এবং সংস্কৃত-শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদির দ্বারা পূর্বপুরুষ-গণের পদানুসরণ করিবার জন্য, এখনও এই বংশের বহুতর সম্ভান সচেষ্টিত আছেন । ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন পাঠন ও ত্রুক্ষনিষ্ঠা বাতীত অন্য কোনও কাৰ্য্যই এই বংশে চলিত হয় নাই । এবস্থিধ পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বংশ-ব্যাপি গুণাবলীর সাহচর্য্য দর্শনে বালক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাল্যকালীন মনোবৃত্তি সকল গঠিত হইতে লাগিল ।

বাল্য-সহচরগণ সহ ধূল্যেখলা করিতে করিতে ক্রমশঃ ন্যায়রত্ন মহাশয় পঞ্চম বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন । এই সময় শুভ দিনে যথা নিয়মে তাঁহাকে বিদ্যারম্ভ করান হইল । বিদ্যারম্ভ দিনে বালকের হাত ধরিয়া খড়ির অক্ষরে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ যখন প্রথম লেখান হইল, তৎপূর্বে সর্বসিদ্ধিদায়ক “শ্রীচূর্গা” এই তিনটি অক্ষর লেখাইয়া লওয়া হয় । তদবধি এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় “শ্রীচূর্গা” না লিখিয়া একটীও বর্ণ কদাপি লেখেন না । অপর কর্তৃক লিখিত বিষয়ের তলদেশে যদি নিজ নাম স্বাক্ষর করিবার কখনও প্রয়োজন হয়, অথবা দলিল পত্রাদি কিম্বা ইংরাজি আফিস সম্পর্কের অন্য কোনও রূপ কাগজ পত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার কখনও আবশ্যক হয়, তখনও স্বতন্ত্র কাগজে “শ্রীচূর্গা” এই তিন অক্ষর লিখিয়া পরে নিজ নাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন । ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বাক্ষরিত লিপি যদি কোনও উদ্দোষ্য সাধনে কখনও শক্তি দেখাইয়া থাকে, অথবা তাঁহার লিখিত পত্রাদি কখনও ভদ্র-স্থানে যদি আদর পাইয়া থাকে, তবে বিদ্যারম্ভ দিনে গুরুর নিকট প্রথম-প্রাপ্ত ঐ ত্র্যক্ষরী

মহামন্ত্রই তাহার মূলভূত হেতু, ইহাই বেন নায়রত্ন মহাশয়ের চিরদিনের অন্তর্করক বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এইরূপে হাতে ঝড়ী হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যেই গুরুমহাশয়ের নিকট ষথানিয়মে অক্ষর পরিচয়াদি হইল। তাহার পরেই নায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর তাৎকালিক সর্বপ্রধান বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক ৮জয়রাম নায়রভূষণের নিকট সুপদ্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে চতুর্দশ বৎসর বয়সে ঐ ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ হইলে উক্ত অধ্যাপকেরই নিকট অমরকোষ অভিধান, সাহিত্য ও অলঙ্কার অধ্যয়ন যথাক্রমে আরম্ভ হইল। এই সময়ে (চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে) নায়রত্ন মহাশয়ের বিবাহ হয়।

নায়রত্ন মহাশয়ের স্বগুরু ৮কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাগবত ও পুরাণাদির ব্যাখ্যা করিতেন। পত্নী সুপ্রভা দেবী রূপে ও গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন। নায়রত্ন মহাশয়ের ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পত্নীর গঙ্গালাভ হয়। লক্ষ্মীর বিবিধ-প্রকার উপকরণের দ্বারা তিনি নায়রত্ন মহাশয়ের সংসার সাজাহিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বহু সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইলেও, জীবন-মূল্য গরু তাঁহার চিত্তে কখনও উদিত হইত না। কোনও স্ত্রীলোকের সহিত জীবনে কখনও তিনি কলহ করেন নাই। ছাত্র, অতিথি, ভৃত্য ও আশ্রিতগণকে ভোজন করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, সর্বশেষে তিনি তাহাই ভোজন করিতেন। প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা এক-বাক্যে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার তুল্য মায়া, দয়া, সদবুদ্ধি ও সাংসারিক কার্য্যকুশলতা অধুনাতন স্ত্রীলোকগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বহুতর পুত্র-কন্যার মাতা হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক পুত্র ছয় কন্যা ইদানীং বিদ্যমান।

পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত হরকুমার শাস্ত্রী। ইনি কলিত ও গণিত উভয় জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও অসাধারণ কাব্য-সাহিত্য-সেবী। কবিত্ব-শক্তি ইহাদের বংশগত গুণ হইলেও সেই গুণ ইহাতে আরও বিশিষ্ট পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ‘বৃন্দাবন-কল্পলতিকা’ নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থ ও ‘শঙ্করাচার্য্য’ প্রভৃতি কয়েক খানি বাঙ্গালা দৃশ্য-কাব্য ইনি রচনা করিয়াছেন। ‘শঙ্করাচার্য্য’ গ্রন্থের কবিত্বে কি সংস্কৃত, কি ইংরাজি উভয় বিদ্যায় পারদর্শী যাবতীয় সুধী ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়াছেন। এই ‘কাশীবাস’ গ্রন্থের শেষভাগে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কবিতা সমূহের তল-দেশে যে সকল বাঙ্গালা মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ও পুত্রেরই কবিত্ব। ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন-ঘটিত ন্যায়রত্নমহাশয়ের যে সকল মীমাংসা প্রদর্শিত হইবে, তৎসমুদয়ও ইহারই দ্বারা বঙ্গভাষায় লেখান হইয়াছে। ইহার এখনও পাঠ্যবস্থা। কবিত্ব-শক্তির তুল্য বিদ্যা-গৌরবেও ইনি বংশের মধ্যে সর্কীপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করুন, ইহাও আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

বিবাহের পর আরও পাঁচ বৎসর কাল ৮ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠাতেই ন্যায়রত্ন মহাশয় অতিবাহিত করিলেন। বিবাহের পূর্বে ব্যাকরণ মাত্র শেষ হইয়াছিল। তৎপরে যে পাঁচ-বৎসর কাল ঐ চতুষ্পাঠাতে থাকিলেন, সেই সময়ের মধ্যে পূর্ব-কথিত অমরকোষ, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র বিশেষ রূপে চর্চা করিয়া লইলেন। তাহার ফলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কিরূপ অসামান্য শাস্ত্রিকতা ও অলোকসামান্য কবিত্ব-শক্তির সঞ্চার হইল, তাহা এই গ্রন্থের শেষাংশে ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে।





## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন । শাস্ত্রে তন্ময়তা । যশোলাভ  
আরম্ভ । স্মৃতির ব্যবস্থা-সংগ্রহ । অধ্যয়ন  
সমাপ্তি । বিদ্যাবিস্তারে ও তেজস্বিতা  
রক্ষায় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-  
সাগর মহাশয়ের পৃষ্ঠ-  
পোষকতা ।

১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৬ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট পাঠ-  
সমাপ্তি হইলে পর, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয়ের  
একান্ত ইচ্ছা জন্মিল। সে সময় ন্যায়শাস্ত্রের প্রলোভন, নিতান্ত  
গুরুতর প্রলোভন ছিল। রথী মহারথীর ন্যায় নৈয়ায়িকে দেশ  
পরিব্যাপ্ত। সভাগুলো অসীম উৎসাহে দুই তিন দিবস কাল ব্যাপিয়া  
নৈয়ায়িকের বিচার চলিত। সভাক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য।  
স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত অন্তরাল হইতে দেখিত, কোন্ পক্ষ পরাভূত হয়।  
কি দর্শন শাস্ত্র, কি ব্যবস্থাদি শাস্ত্র, সকলের মধ্যেই নৈয়ায়িকতা।  
সকল শাস্ত্রের বিচারে নৈয়ায়িক মধ্যস্থ। নৈয়ায়িক সকল শাস্ত্রেরই  
বিচার শুনিতেছেন, বিচার করিতেছেন ও মীমাংসা করিয়া দিতেছেন।  
নৈয়ায়িক, স্মার্ত্ত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের দ্বারাই সমাজ গঠিত, এবং

সেই সকলের স্বাক্ষরের দ্বারা সামাজিক শাস্ত্রীয় মতামত প্রকাশিত হইলেও, সভা-যুদ্ধে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হইলে নৈয়ায়িক খড়া ধরিতেছেন, নৈয়ায়িক বাদি-নিরাশ করিতেছেন, সমাজের প্রাধান্য পদ নৈয়ায়িকের । সেই পদে দেশ বিদেশ হইতে সমাজের নানারূপ আবেদন, অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে । স্মার্ত্ত, জ্যোতির্বিদ, বৈয়াকরণ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় নৈয়ায়িকের অমুগত হইয়া কার্য্য করিতেছেন । এখনও বঙ্গদেশে নৈয়ায়িকেরই প্রাধান্য থাকিলেও, তখনকার কালে ন্যায়শাস্ত্রের প্রলোভন, বড় গুরুতর প্রলোভন ছিল । দেশীয় শাস্ত্র সমূহের চর্চ্চা, যদি সেইরূপ প্রলোভনের সামগ্রী থাকে, তবে তাহার ক্রমিক অবনতি ঘটে না । ভাটপাড়ার তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ৬ যদু্যাম সাকর্ভোম মহাশয়ের নিকট, ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ন্যায়রত্নমহাশয় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

অতি অল্প দিনের মধ্যেই ন্যায়-শাস্ত্রে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতিভার বিকাশ হইল । তৎকালে বৃহস্পতি তুল্য ৬ হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ভাটপাড়া সমাজের প্রাধান্ত-সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন । ন্যায়রত্ন মহাশয় তিন বৎসর মাত্র ন্যায়-শাস্ত্র পাঠারম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় তর্কচূড়ামণি মহাশয় একদা আমন্ত্রিত হইয়া বাথলা সমাজে কোনও সভায় গমন করেন । তথায় নানা সম্ভাষণের মধ্যে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন “মহাশয় আপনার দ্বারা ভট্টপল্লী-সমাজের যে প্রাধান্ত সাধিত হইতেছে, সে প্রাধান্ত আপনার অবিদ্যমানের কাহারও দ্বারা রক্ষিত হইবার আশা আছে কি ?” তর্কচূড়ামণি মহাশয় উত্তর করিলেন “রাখাল দাস নামে এক বালক ‘বিশেষব্যাপ্তি’ মাত্র পড়িতেছে । সে যদি ন্যায়শাস্ত্র শেষ করিতে পারে, ভট্টপল্লীর প্রাধান্ত তাহার দ্বারা রক্ষিত হইবে ।” তখন ভট্টপল্লীর প্রত্যেক

চতুষ্পাঠীতে অনেক কৃতবিদ্যা ছাত্র ছিলেন। উৎকৃষ্ট অধ্যাপক ও বহুতর ছিলেন। কিন্তু বালক-ছাত্র রাখাল দাসের প্রতিভায় ও মাজিত-বুদ্ধিতে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কতদূর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল তাহা উপরোক্ত উত্তরে, পাঠক, অনুমান করিবেন।

অধ্যয়ন-সময়ে ত্রায়-শাস্ত্রে ত্রায়রত্ন মহাশয়ের একাগ্রতা ও তন্ময়তা আজকাল একটি শুনিবার সামগ্রী। ভাটপাড়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যত সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল বা আছে, তাহাতে দশটা হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত, বা কোনও বিশেষ সময় হইতে বিশেষ সময় পর্য্যন্ত ছাত্রগণের অধ্যয়ন করিবার নিয়ম নহে। ঐ সকল স্থানে দিবারাতি সকল সময়ে ছাত্রেরা শাস্ত্রচর্চা করিয়া থাকেন। দেশীয় ছাত্রেরা কেবল আহার নিদ্রার জন্ত বাটী গিয়া থাকেন। বিদেশীয় ছাত্রেরা চতুষ্পাঠীতেই তাহা সম্পন্ন করেন। ত্রায়রত্ন মহাশয় রাত্রি-কালে ১১।১২টা পর্য্যন্ত বিদ্যা-চর্চা করিয়া প্রায় গৃহে আসিতেন। বিদ্যার্থি-ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ত্রায়শাস্ত্রে তন্ময়তা এত অধিক ছিল যে, ঐ কার্যে সময়ে সময়ে বিশেষ কোতূহলোদ্দীপক ব্যাপার সংঘটিত হইত। বালক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জন্য গৃহে ফল-মূল-দ্রব্যাদি প্রস্তুত রাখিয়াছে, বাটী গিয়া ভোজন করিবেন; বাহিরের দরজা খোলা রাখিয়াছে; হয়তো ত্রায়শাস্ত্রের জটিল সমস্তা উথিত হওয়ায় যথাকালে সে দিন সারং সন্ধ্যা বন্দনা হয় নাই, একেবারে ১০ টা ১১ টা রাত্রির সময় গৃহে গিয়াই তাহা সম্পন্ন করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া শাস্ত্র-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন; এই অবস্থায় কাক-কোকিল ডাকিয়া উঠিল, প্রাতঃস্নানী ব্রাহ্মণগণ গঙ্গায় বাইতে লাগিলেন, বাহিরে আলো হইল। কিন্তু ত্রায়শাস্ত্রের চিন্তায় ত্রায়রত্ন মহাশয় এতই তন্ময় যে, তখনও প্রদীপ জলিতেছে, পুঁথি হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। ছাত্রা-

বহাশ, অধ্যয়নই ব্রাহ্মণ-সন্তানের তপস্তা, ইহা শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে ।  
ভারতীয় মহাশয় সে তপস্তাচরণের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল । কলতঃ, তুমি  
যে বিষয়েই প্রাধান্তলাভ করিতে বাসনা কর, সাধনা-কালে পরিশ্রম ও  
একাগ্ৰতার এইরূপ কোন' না কোন' বিশেষত্ব তোমাকে দেখাইতে  
হইবে ।

বশোলিপ্সায় এখন যেমন সংবাদ-পত্রাদির সাহায্য লওয়া, প্রতি-  
ষ্ঠিত ব্যক্তিগণের সুখ্যাতি-পত্র সংগ্রহ করা, বিজ্ঞাপন-প্রকাশ প্রভৃতির  
আবশ্যকতা হইয়াছে, পূর্বে সেরূপ ছিল না । ধনবানেরা নানা স্থান  
হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া সময়ে সময়ে সভা-  
করিতেন । এখন বঙ্গদেশে এ নিয়ম কমিয়া আসিলেও একেবারে  
তিরোহিত হয় নাই । পূর্বে ঐ সকল সভায় শাস্ত্রার্থে যিনি উৎকর্ষ  
দেখাইতে পারিতেন, তিনিই প্রাধান্ত লাভ করিতেন । কেবল মাত্র  
অধ্যাপক হইরা নহে, ছাত্রাবস্থা হইতেই, এমন কি ছাত্রাবস্থায় যখন  
অধ্যয়ন অতি অল্পই হইয়াছিল, তখন হইতে ভারতীয় মহাশয় প্রগাঢ়  
বিদ্যানু অধ্যাপকগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন । সেই ছাত্রাবস্থা  
হইতেই প্রত্যেক বিচারে প্রভূত বশোলভ করিতে থাকেন । 'পক্ষতা'  
পাঠাবস্থায়ই, ভারতীয় মহাশয় তটুপন্নী হইতে ছয় ক্রোশ পূর্বে, সুবর্ণ-  
পুর নামক স্থানে, নবমীপের ৬গোলক নাথ ভারতীয় মহাশয়ের সহিত  
পক্ষতার বিচার করেন ও বিচারান্তে গভাঙ্গ যাবতীয় অধ্যাপকের নিকট  
অশেষ ধন্যবাদ লাভ করেন । এইরূপ উদাহরণ অনেক আছে । তন্মধ্যে  
ছই চারিটি অগ্রে প্রকাশ করা হইবে ।

ভারতীয় অধ্যয়ন কালেই সময়ে সময়ে পিতা ৬সীতানাথ  
বিদ্যাবূষণ মহাশয়ের নিকট ভারতীয় মহাশয় প্রয়োজনীয় স্থিতি-শাস্ত্র  
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।

২৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ত্রায়শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ত্রায়রত্ন মহাশয় অধ্যাপনা-কার্যে ব্রতী হন। তাঁহার অধ্যাপক ৬যুহরাম সার্কভোম মহাশয়ের ছাত্রগণ ত্রায়রত্ন মহাশয়ের প্রতি এতই অধুরক্ত হইয়াছিলেন যে, ত্রায়রত্ন মহাশয় চতুষ্পাঠী করিলে সার্কভোম মহাশয়ের প্রায় সমুদয় ছাত্র, ত্রায়রত্ন মহাশয়ের নিকট চলিয়া আসেন। সার্কভোম মহাশয়ও ত্রায়রত্ন মহাশয়কে এতই স্নেহ করিতেন যে, তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, এবং ত্রায়রত্ন মহাশয়ের অধ্যাপনা দেখিবার জন্ত ঐ স্বর্গীয় মহাত্মা প্রায়ই তাঁহার চতুষ্পাঠীতে আসিয়া বসিতেন। ত্রায়রত্ন মহাশয় তাঁহাকে মূর্তিমান্ ঈশ্বরের তুল্য ভক্তি করিতেন।

বিখ্যাতানের সহিত বিদেশীয় ছাত্রগণকে অন্ন-দান করিবার প্রথা ভট্টপন্নাসমাজে চিরকাল প্রচলিত। ত্রায়রত্ন মহাশয় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেই, অনেকগুলি বিদেশীয় ছাত্র তাঁহার আশ্রয়ে উপস্থিত হইলেন। এদিকে, ত্রায়রত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান এবং তখন নবীন অধ্যাপক। ধনবান্গণের গৃহে ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে যে নিমন্ত্রণ পত্রাদি পাইতে লাগিলেন, তখন তদ্বারা বহু ছাত্র রাখা চলিতে পারে না। বাবদাবাগিজ্য বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বিগর্হিত অত্র কোনও রূপ অর্থোপার্জনের উপায়ও তাঁহার ছিল না। যে বংশে তাঁহার জন্ম সে বংশেরও তেজস্বিতা তখন এমনই ছিল যে, গভর্ণমেন্ট কিম্বা দেশীয় কোনও নরপতির বেতন ভুক্ হইয়া, তাঁহাদের অধীনে অধ্যাপনা করাও তেজস্বী ত্রায়রত্ন মহাশয়ের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তেজস্বিতার পক্ষপাতী একটা পরম তেজস্বী পুরুষ ত্রায়রত্ন মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষক থাকায়, তিনি সেই নব্যাবস্থারও বহুতর বিদেশীয় ছাত্রকে আশ্রয় দিতে সাহসী হইয়াছিলেন। সংস্কৃত

কলেজের তাৎকালিক অধ্বিতীয় নৈয়ায়িক ৬জয়নারায়ণ তর্ক  
পঞ্চাননের প্রমুখাৎ বিদ্যোৎসাহী, পর-শুণ-প্রমোদী ৬ ঈশ্বর চন্দ্র  
বিদ্যাসাগর মহাশয় জ্ঞায়রত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য-প্রশংসা নিরন্তর  
শ্রবণ করিয়া, এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, জ্ঞায়রত্ন মহাশয়ের  
বিদেশীয় ছাত্রগণের ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করিয়া, বিদ্যা-বিস্তার-  
কল্পে জ্ঞায়রত্ন মহাশয়ের তিনি একজন প্রধান সহায় হইলেন।  
জ্ঞায়রত্ন মহাশয় পাঁচ বৎসর কাল মাত্র তাঁহার কৃত ঐরূপ সাহায্য  
গ্রহণ করিয়া, নিজ ছাত্রবৃন্দের প্রতিপালনে নিজেই সমর্থ হইলেন,  
এবং তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য  
লইতে বিরত হইলেন। এই ঘটনায় জ্ঞায়রত্ন মহাশয়ের অপ্রতারণতা,  
সত্যবাদিতা ও অস্বার্থপরতা অনুভব করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি,  
জ্ঞায়রত্ন মহাশয়ের উপর আরও এত দৃঢ়তর হইল যে, সকল স্থানের  
সকল অধ্যাপকের অপেক্ষা জ্ঞায়রত্ন মহাশয়ের তিনি আজীবন পক্ষপাতী  
হইয়াছিলেন। তদবধি নিজের বা পরিজনের পীড়াপি নিবন্ধন, যে  
কোনও সময় জ্ঞায়রত্ন মহাশয়কে কলিকাতায় দীর্ঘকাল থাকিতে  
হইয়াছে, চিকিৎসার ব্যয়, বাটীভাড়া, ঐস্থানের সংসার-খরচ, সকলই  
বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরীহ করিতেন।





## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।



শাস্ত্র-জ্ঞান । দর্শন শাস্ত্র সমূহের উদ্দেশ্য । চার্কাক মতের  
বিশেষত্ব । ‘শক্তি’ ও ‘লক্ষণা’ । দর্শন সমূহের মতভেদের  
হেতু । ‘অনুমান’ খণ্ডের প্রয়োজন ও সকল  
দর্শনের সহিত সঙ্গত নিরূপণ । দার্শনিক  
হেতু সমূহের বলাবল পরীক্ষা করিবার  
উপায় । ‘ব্যাপ্তি’ ‘তর্ক’ ‘পক্ষধর্মতা-  
জ্ঞান’ এবং ‘কার্যাকারণতাব’ ।  
নব্যনৈয়ায়িকমত ।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিদ্যাজীবনের সর্বোৎকৃষ্ট আলোচ্য সামগ্রী  
তাঁহার বিচার-পাণ্ডিত্য ও মীমাংসা-জ্ঞান । তাঁহার জীবন-চরিত  
অনুশীলন করিলে জানা যাইবে, অতি নব্যাবস্থা হইতে শাস্ত্রীয় সভার  
যে কোনও শাস্ত্রের যে কোনও বিচারে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার অন্তঃ-  
প্রবিষ্ট হইয়া অসাধারণ মধ্যস্থতা করিয়াছেন, সকল শাস্ত্রের  
সকল অধ্যাপক ভায়রত্ন মহাশয়ের শাস্ত্রীয় মীমাংসা-প্রণালী দর্শনে  
চিরকাল সমানভাবে বৃদ্ধ । ন্যায়শাস্ত্রের ‘অনুমান-খণ্ডে’ গভীর  
পাণ্ডিত্যই সর্ব-শাস্ত্রার্থে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই তীক্ষ্ণদর্শিতার মূল হেতু ।  
‘অনুমান-খণ্ডে’ গভীর পাণ্ডিত্য একরূপ হেতু হইবার কারণ কি, ইহা  
অবগত হইতে হইলে, শাস্ত্র সমূহে বিশেষতঃ সমগ্র দর্শনশাস্ত্রে ঐ

অনুমান-খণ্ডের কি পরিমাণ সম্বন্ধ, তাহাই সৰ্ব্বাগ্রে পাঠকগণকে কিঞ্চিৎ বুঝিতে হইবে।

সদস্য পদার্থ নির্ণয়ই সকল দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । আৰ্যদর্শন-কারেরা নানাবিধ হেতুতর্কাদির দ্বারা সেই সদস্য পদার্থের নির্ণয় করিয়াছেন, এবং পোষকশ্রুতি সাধক দেখাইয়াছেন। শ্রুতি নানাবিধ। এক শ্রুতি দ্বারা বাহ্য সিদ্ধ হয়, অল্প শ্রুতি দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। হেতুতর্কের দ্বারাও নৈরাসিক যে পদার্থ সংস্থাপন করিলেন, বৈদান্তিক সেই পদার্থেরই হয়তো অল্প প্রকার হেতু দেখাইয়া খণ্ডন করিলেন। এ কারণ, চার্বাকেরা অনুমান, শ্রুতি প্রভৃতির প্রামাণ্যই স্বীকার করেন নাই। চাক্ষুষ, শ্রাবণ, রাসন, স্পর্শ, প্রাণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ উপায় ব্যতীত প্রকৃত পদার্থ সিদ্ধ হইতেই পারে না, ইহা তাহাদের মত। আৰ্যদর্শনকারেরা অনন্ত যুক্তি দ্বারা সে মতের খণ্ডন করিয়াছেন। যে সকল বিষয়ের চাক্ষুসাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাতেও অনুমানের আবশ্যকতা আছে। যে বস্তুকে নিকটে দীর্ঘাকার দেখা যায়, সেই বস্তুই দূরে গেলে ক্ষুদ্রভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই বস্তু সম্বন্ধে, এমন কি, যাহাদের বৃহদাকার কখনও দর্শন করি নাই, সেই গ্রহতারাди সম্বন্ধে, বৃহৎ বলিয়া অগতের যে স্থির সিদ্ধান্ত রহিয়াছে, তাহার একমাত্র সহায় তর্ক ও অনুমান। তর্ক ও অনুমানে দ্বারা পদার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে, নানা উপায়ে আৰ্যদর্শনকারেরা ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, সেই তর্কানুমানের দ্বারা শ্রুতির উপর কেহ কেহ ‘নিত্যনির্দোষত্ব’ কেহ কেহ ‘সর্বজ্ঞোচ্চরিতত্ব’ ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়াছেন, এবং তদনুসারে শ্রুতির প্রামাণ্য উপপন্ন করিয়া লইয়া আবশ্যক-স্থলে পোষক শ্রুতি সাধক দিয়াছেন। তবে, পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিও দৃষ্ট হয় একথা সত্য বটে। একারণ ‘শক্তি’ ও ‘লক্ষণা’



তই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া শ্রুতির মীমাংসা করিতে হয়। ‘শক্তি’ দ্বারা যে বিষয় সিদ্ধ হয়, ‘লক্ষণা’ দ্বারা বিরুদ্ধ শ্রুতিকে তাহাই অনুকূল করিয়া লইতে হয়।

‘শক্তি’ ও ‘লক্ষণা’ কিরূপ? “রাম গঙ্গাতীরে বাস করিলেন” “রাম গঙ্গাবাস করিলেন” এই দুই বাক্যের দ্বারাই রামের ‘গঙ্গাতীরে’ বাসই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। পূর্ব বাক্যটিতে “গঙ্গাতীর” উল্লেখ থাকায় প্রকৃত “শক্তি” দ্বারাই ‘গঙ্গাতীরে বাস’ এই অর্থের বোধ হইতেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে মাত্র ‘গঙ্গাবাস’ উল্লেখ আছে। জলময়ী গঙ্গায় রামের বাস অসম্ভব হওয়ায়, ‘লক্ষণার’ দ্বারা এই শব্দের ‘গঙ্গাতীর’ অর্থ করিতে হইবে। “কুষ্ঠীর গঙ্গাবাস করিতেছে” বলিলে, ঐরূপ ‘লক্ষণা’ করিতে হইত না। জীবের ‘প্রাণ’ বায়ু-বিশেষ ইহা আয়ুর্বেদাদির দ্বারা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু শ্রুতি রহিয়াছে ‘আয়ুর্ভূতঃ’ ইত্যাদি। ঘৃত বায়ু বিশেষ নহে। সুতরাং ঘৃতকে ‘আয়ুঃ’ বলা যাইতে পারে না। অতএব ঐরূপ শ্রুতি থাকিলে ‘লক্ষণার’ দ্বারা ‘ঘৃত আয়ুর্ভূতক’ এইরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন হয়।

পূর্বোক্ত সরল স্থল সমূহে কোন্টীর শক্যার্থ, কোন্টীর লক্ষ্যার্থ করিতে হইবে, তাহা সহজেই সাধারণে বুঝিতে পারেন। কিন্তু নানা-বিষয়িণী অতীন্দ্রিয় শ্রুতির মীমাংসার সময় কোন্টীর শক্যার্থ হইবে, কোন্টীর লক্ষ্যার্থ হইবে, কিরূপ বা সেই লক্ষণা করিতে হইবে, এসকল বিষয়ে হেতু দেখাইয়া প্রকৃত অনুমান বড়ই দূরূহ বস্তু।

শ্রুতির কেবল মাত্র ঐরূপ শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের অবধারণে গৌলযোগ নিবন্ধন দশন সমূহের মত-ভেদ নহে। ‘প্রকরণ জ্ঞানের’ দ্বারা শ্রুতির যথাযথ তাৎপর্য্যাবধারণও অনেক সময় কঠিন হইয়া

পড়ে। 'সৈন্ধব' শব্দে লবণ-বিশেষ ও ঘোটক-বিশেষ বুঝাইয়া থাকে। কোনও সেনাপতি যুদ্ধযাত্রা কালে 'সৈন্ধবমানয়' বলিলে ঘোটক আনিতে হইবে। কিন্তু ভোজন-কালে ঐ শব্দ উচ্চারণ করিলে, লবণ আনিতে হইবে। অতএব শব্দের তাৎপর্যাবধারণেও অনুমানের আবশ্যকতা। সেই অনুমানের নামই 'প্রকরণ জ্ঞান।' ঋষিবাক্য আছে 'মশূরমুদরে যস্য তস্ত দূরতরো হরিঃ।' বিষ্ণু, সর্প প্রভৃতি নানা বিষয় 'হরি' শব্দে বোধ হইয়া থাকে। এই হেতু, ঐ ঋষি-বাক্যের কেহ কেহ অর্থ করেন "মশূর ডাউল ভক্ষণ করিলে বিষ্ণু দূরে যান, অর্থাৎ তাঁহার রূপা লাভ করা যায় না।" অপর কেহ কেহ অর্থ করেন "মশূর ডাউল ভক্ষণ করিলে সর্পে দংশন করে না।" অতএব, একটা সামান্য ঋষি-বাক্য লইয়া যখন প্রকৃত তাৎপর্য-গ্রহে গোলযোগ দাঁড়াইল, তখন ঘোর জটিল অতীন্দ্রিয়-বোধক শ্রুতির তাৎপর্যাবধারণ পূর্বক 'ঈশ্বর' 'মুক্তি' প্রভৃতি দ্রুহ বিষয় সমূহের অনুমানে যে মতভেদ হইয়া নানা দর্শনের সৃষ্টি হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

এইরূপ নানা কারণে, শ্রুতি ও অনুমানাদির দ্বারা এক দর্শনে যে বিষয় খণ্ডন করিয়াছেন, অত্র দর্শনে শ্রুতি ও অনুমানাদির দ্বারাই তাহার সংস্থাপন করিতে পারিয়াছেন। তন্মধ্যে যিনি 'তর্ক' সহিত 'ব্যাপ্যাহেতু' প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্তই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর নামই 'ব্যাপ্যাহেতু'। হেতুর সেই ব্যাপ্তি 'তর্কের' দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়।

এই 'ব্যাপ্তি' ও 'তর্ক' কিরূপ ? ধূমে বহ্নির 'ব্যাপ্তি' থাকে, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেট সেই খানেই বহ্নি থাকে ! এইরূপ ব্যাপ্তির নাম 'অদ্বয়ব্যাপ্তি'। ধূমে বহ্নির 'ব্যাপ্তি'

অন্তরূপেও স্থির করা যায়। যথা, যেখানে যেখানে বহি থাকে না; সেখানে সেখানে ধূম থাকেনা। এইরূপ ‘ব্যাপ্তির’ নাম ‘ব্যতিরেক ব্যাপ্তি’। ধূমে বহির ব্যাপ্তি আছে বলিয়াই ধূম দেখিয়া বহির অনুমান হয়। সেই ব্যাপ্তি নিশ্চয় করিবে কিরূপে? সকল ধূমেরই বহি উৎপাদক। বহিহীন প্রদেশে যদি ধূমোৎপত্তি হওয়া সম্ভব পায়, তবে বহি সকল ধূমের উৎপাদক হইতে পারেনা। এই ‘তর্কের’ দ্বারা ই ধূমে বহির ‘ব্যাপ্তি’ নিশ্চয় হয়। একারণ, ধূম দেখিয়া বহির যে অনুমান, তাহা সদানুমান। কিন্তু বহি দেখিয়া যদি ধূমের অনুমান করা যায়, তাহা সদানুমান নহে। কারণ, অয়োগোলকাদিতে বহি-সব্ধেও ধূমোৎপত্তি হয় না। একারণ, এই সকল হেতুকে ‘ব্যতিচারি-হেতু’ বলে। ‘ব্যতিচারী হেতুর’ দ্বারা অর্থাৎ যে হেতুতে ব্যাপ্তি না থাকে সেই হেতু দ্বারা স্থল-বিশেষে পদার্থ-সিদ্ধি হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সকল স্থানে হয় না। একারণ তর্ক ও ব্যাপ্তি-বিরহিত হেতু নির্দেশ করিয়া যে বস্তুর সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহার প্রামাণ্য নাই। ‘বহি’ বা ‘ধূম’ দৃষ্টান্ত-স্বরূপে দেখান হইল মাত্র। দর্শন-শাস্ত্রের অতি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে প্রতির প্রামাণ্য-সিদ্ধি, তাৎপর্য্যাবধারণ, তাহার লক্ষ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের বিচার, ঈশ্বর-নিরূপণ, মুক্তি-নির্ণয়, মতবৈধ স্থলে ‘সদস্য’ নিরূপণ প্রভৃতি বাবতীয় অতীন্দ্রিয় বিষয় ‘ব্যাপ্যাহেতু’ ‘তর্কাদির’ দ্বারা নির্ণয়। আবশ্যকীয় তর্কানুসন্ধান করতঃ কিরূপে ‘ব্যাপ্যাহেতু’ নির্ণয় করিয়া অনুমান-বলে পদার্থ সিদ্ধ করিতে হয়, নৈয়ামিকগণের ‘অনুমান খণ্ডে’ তাহারই সূক্ষ্মসূক্ষ্ম আলোচনা।

আবার, কেবলমাত্র ঐরূপ ব্যাপ্যাহেতু প্রভৃতির দ্বারাও তুমি সকল স্থানে সকল অনুমান করিতে পার না। যে স্থানে ব্যাপ্য হেতুর সম্বন্ধ থাকে, সেই স্থানেই পদার্থ সিদ্ধ হইবে। পরন্তু, চন্দ্র, রত্ন-শালা

প্রভৃতি যে সকল স্থানে ধূমের বিশেষ সম্বন্ধ তুমি দেখিবে, সেই স্থানেই তোমাকে বহির অনুমান করিতে হইবে। ধূম বহির ব্যাপ্য বলিয়া জলাশয়ে তুমি বহির অনুমান করিতে পার না। হেতু ও সাধনীর সামগ্রীর এইরূপ বিশেষ স্থলের নৈয়ায়িকেরা ‘পক্ষ’ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন এবং সেই পক্ষে হেতুর সম্বন্ধ জ্ঞানের নাম ‘পক্ষধর্মতা-জ্ঞান।’ ‘ধূমের বিশেষ সম্বন্ধ পক্ষতে রহিয়াছে’ এই ‘হেতু’ দৃষ্টে যে অনুমান হইবে তাহার আকার ‘পক্ষতে বহি আছে।’

পূর্বোক্ত ‘জলাশয়’ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখান হইল মাত্র। জলাশয়-দিতে বহি বা ধূমের সম্বন্ধ নাই, তাহা সকলেরই স্থির আছে। কিন্তু বাহার বিষয় কিছুমাত্র জানা নাই, বাহা সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয়, সেরূপ ‘পক্ষে’ সেইরূপ কোনও অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় বিষয় স্থির করিবার জন্ত, যখন সেইরূপ কোনও অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় হেতু প্রদর্শন করান হয়, তৎকালে পক্ষধর্মতা-জ্ঞান নিতান্ত সহজ নহে। তুমি যে বিষয় সিদ্ধ করিবার জন্য যে হেতু দেখাইলে, সেই হেতুর দ্বারা হয়তো সে বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু যে স্থলে সিদ্ধ করিয়াছ, সে স্থলে সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। মনে কর, বেদ-রূপ পক্ষের উপর তোমার সাধনীর সামগ্রী ‘প্রামাণ্য’। হেতু দেখাইতেছ “সর্বজ্ঞ-মহাপুরুষোচ্চরিতঃ” “নিত্য নিদোষঃ” প্রভৃতি। হইতে পারে, তুমি যে হেতু দেখাইলে, তদ্বারা “প্রামাণ্য” সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই হেতু পক্ষবৃত্তি না হইলে বেদের উপর তুমি প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে পার না। বেদের উপর তোমার ‘ব্যাপ্য হেতু’ বিজ্ঞমান, ইহাও তোমাকে সপ্রমাণ করিতে হইবে। একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেখান হইল। বস্তুতঃ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের পক্ষধর্মতা-জ্ঞানও বড় সহজ ব্যাপার নহে। সদভ্যুমানের উপায় এই ‘পক্ষধর্মতা-জ্ঞানেরও’ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান সকল, নৈয়ায়িকগণের

‘অনুমানখণ্ডে’ প্রদর্শিত হইয়াছে। তুমি নানা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতে পার, নানা দর্শনের বিভিন্ন মতামত অবগত থাকিতে পার, দর্শনকারেরা কৌদৃশ হেতুর দ্বারা সে সকল স্থির করিয়াছেন তাহাও সূত্ররূপে জ্ঞাত থাকিতে পার, কিন্তু সেই সকল হেতু দর্শনকার-গণের সিদ্ধান্তের কি পরিমাণ উপযোগী, কতদূর পর্য্যন্ত তাহাদের বলাবল, যে স্থানে যাহা সিদ্ধ করিয়াছেন সে স্থানে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে কি না, বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকারিগণের হেতু ও সিদ্ধান্ত কোন্ অংশে দৃষ্ট, হেতুর ‘ব্যাপ্তি’ ‘তর্ক’ ‘পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান’ প্রভৃতি ব্যতীত সূক্ষ্মসূক্ষ্ম রূপে তাহার বিচার করিতে পারিবে না। দর্শনশাস্ত্র-রূপ কাবোর ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ছন্দঃ অনুমান খণ্ডে। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দঃ না জানিয়া কাব্য আলোচনা করিলে, কাবোর অনেক কবিতা উৎকৃষ্ট বলিয়া তোমার বোধ হইতে পারে। কিন্তু যদি ঐসকল বিষয়ের অনুশীলন করিয়া সেই কবিতা গুলি পুনরায় কখনও দৃষ্টি কর, তখন বুঝিবে সুন্দর কবিতার কোন কোন’টিতে হয়তো ব্যাকরণ-ভুল, অলঙ্কার-দোষ ও ছন্দঃপাত হইয়াছে। অতি অসার বস্তুর উপর চাক্চিক্য ভাসিতেছে। তোমার বোধগম্য লৌকিক-যুক্তির দ্বারা তোমার নিকট অনেক সিদ্ধান্তই মধুর লাগিতে পারে। যে শব্দকে আমরা সকলে খেত দেখিতেছি, বিকারাবস্থায় তাহা হরিদ্রাত দেখায়। শব্দ প্রকৃতই খেত কি হরিদ্রাত ? বিকৃতাবস্থায় যে জ্ঞান হয় তাহা বিকৃত, প্রকৃতাবস্থায় যে জ্ঞান হয় তাহা প্রকৃত, এই স্থূল লৌকিক হেতুর দ্বারা তুমি শব্দকে খেত বলিয়া স্থির করিতে পার। কিন্তু সূক্ষ্ম তর্কে এই হেতু অব্যভিচারী বা ব্যাপ্য হেতু নহে। কারণ পীড়াদি উপস্থিত হইলে অনেক সময় বিবেক উপস্থিত হয়। ‘বিবেক’ কি জীবের বিকৃত গুণ? যদি তোমার পূর্বোক্ত হেতু অব্যভিচারী

হেতু হয়, তবে বিবেককেও জীবের বিকৃত গুণ বলিয়া ঐ হেতুর দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া যায়। অতএব তোমার হেতুকে আরও তর্কের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, অথবা হেতুস্বরূপ দেখাইয়া শব্দের যেতবর্ণ সিদ্ধ করিতে হইবে। বিকৃতাবস্থায় যে জ্ঞান হয় তাহা বিকৃত, প্রকৃতাবস্থায় যে জ্ঞান হয় তাহা প্রকৃত, এ বিষয়ের তুমি দুই চারি সহস্র দৃষ্টান্ত বা সহচার দেখাইতে পার সত্য। কিন্তু বহু সহচার দর্শন করাইলেই যে পদার্থ সিদ্ধ হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। হয়তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আর আর সকল বস্তুতে তোমার নিয়ম খাটিয়া যাইবে, কেবল মাত্র তুমি যেটা সিদ্ধ করিতেছ, সেইটাই তোমার নিয়ম খাটিবে না। শাস্ত্রে যাহাকে যাহাকে ‘ক্ষিতি’ বলা হইয়াছে, সে সকলের উপরই লৌহ-অস্ত্রের দাগ পড়িতে পারে, কেবল হীরকাদির উপরই পারে না। হীরকাদিকেও ‘ক্ষিতি’ পদার্থের মধ্যে পরিগণনা করা হইয়াছে। হীরকাদির উপর লৌহ অস্ত্রের দাগ পড়িতে পারে, ক্ষিতিত্বের সম্বন্ধ দেখাইয়া তুমি ইহা স্থির করাইতে পার না। যতই অন্বেষণ করিবে এ বিষয়ের সহচার মিলিবে সত্য, কিন্তু তোমার অভিলষিত স্থলেই কেবল ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিয়া যাইবে। সহচারা দি দেখাইয়া তোমার চক্ষে অনেকে অনেক সিদ্ধান্ত মধুর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু বিশেষ তর্কানুসন্ধান-প্রক্রিয়া না জানিয়া কোনও সিদ্ধান্তে বিশেষতঃ ধর্মসিদ্ধান্তে, নির্ভর করিতে নাই। কারণ শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে “যন্তর্কেণাতি সন্ধতে স ধর্মঃ বেদ নেতরঃ।”

এইরূপ অনুমানোপায় এবং তদ্ব্যতিরিক্ত আবশ্যকীয় ব্যাপ্তি, তর্ক, পক্ষধর্মতা-জ্ঞান প্রভৃতি ব্যতীত অনুমানধর্মের ‘কার্য্যাকারণভাব’

সকল দর্শনের আর একটা সাধারণ-সামগ্রী। যত দর্শন আছে, সকল দর্শনেই ‘জন্য’ ও ‘নিত্য’ ভেদে দুই প্রকার পদার্থ কল্পিত হইয়াছে। ‘জ্ঞাত’ ও ‘নিত্য’ পদার্থের নির্বাচনে সকল দর্শনেরই মত-ভেদ আছে। জ্ঞাত পদার্থকে নৈয়ায়িকেরা ‘কার্য্য’ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞাত পদার্থ বা কার্য্য নাম্বেরই ‘জনক’ বা ‘কারণ’ দেখাইতে হয়। কোন্ সময়ে কিরূপ ‘কারণ’ কোন্ স্থলে থাকিলে কোন্ ‘কার্য্য’ বা জ্ঞাত পদার্থ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয়, নৈয়ায়িকগণের ‘কার্য্য কারণ ভাবে’ তাহারই বিচার। ইহাও অবশ্য অনুমানেরই অঙ্গ। কোন্ দর্শনকার কোন্ ‘জ্ঞাত পদার্থ’ কি ভাবের ‘কারণ’ নির্দেশ করিয়া নির্ণয় করিলেন, সে ‘কারণ’ সম্বন্ধে সেরূপ কার্য্যোৎপত্তি হওয়া সম্ভব অথবা তাহাকে ‘নিত্য’ পদার্থের মধ্যে পরিগণনা করিতে হইবে, যাহাকে ‘নিত্য’ বলা হইয়াছে তাহার উৎপাদক কারণ প্রকৃতই নাই অথবা সে পদার্থকে জ্ঞাতের মধ্যে পরিগণনা করাই কর্ত্তব্য, কার্য্যকারণ-ভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ব্যতীত ইহা নিরূপণের উপায় নাই। এই হেতু নৈয়ায়িকগণের ‘অনুমান খণ্ড’ শাস্ত্র সমূহে, বিশেষতঃ সমগ্র দর্শন-শাস্ত্রে, অদ্বিতীয় উপযোগী। মিথিলা বঙ্গদেশ প্রভৃতি নৈয়ায়িক-সমাজে অত্যাধি যত তীক্ষ্ণবী বিখ্যাত নৈয়ায়িক জন্মিয়াছেন, সকলেই ‘অনুমান খণ্ডে’ আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের সুবিধা এই হয় যে, যে শাস্ত্রের যে বিষয় লইয়াই বাদ-প্রতিবাদ উখিত হয়, অনুমান-ঘটিত নানা রূপ পথ জানা থাকায় তাঁহারা বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের অনুমান সহজেই ব্যর্থ করিতে সমর্থ হন। এইরূপে শুধু বিরুদ্ধবাদিগণকে নিরস্ত করিবার জ্ঞাত তর্কানুসন্ধান জ্ঞানশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বিরুদ্ধ চেষ্টা হইতে আর্য্যশাস্ত্র সমূহকে চিরকাল তর্ক-শাস্ত্রই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

ভাষ্য-দর্শন বেদান্ত সামগ্রী। এই বেদান্ত সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গৌতম, কণাদ ইহার প্রথম পরিপাটী পৃথকরূপে করিয়া যান। পরে সেই সকল গ্রন্থ হইতে ‘প্রত্যক্ষ’ ‘অনুমান’ ‘উপমান’ ‘শব্দ’ এই চতুর্বিধ তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া মিথিলার গঙ্গেশোপাধ্যায় নিজকৃত ‘চিন্তামণি’ গ্রন্থে অনেক স্থল সন্ধান লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তাহা নিজ সম্প্রদায় বাতীত, অপরের নিকট প্রকাশ করিতেন না। নবদ্বীপের বাসুদেবসার্বভৌম মিথিলায় গিয়া গঙ্গেশোপাধ্যায়ের সম্প্রদায়ের নিকট দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করতঃ নানা কোশলে ঐ ‘চিন্তামণি-গ্রন্থ’ এবং অত্যাণ্ড অনেক গুড় শাস্ত্রীয় সন্ধান বঙ্গদেশে লইয়া আসেন। পরে রঘুনাথশিরোমণি বাসুদেবসার্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন করতঃ সেই সকল সন্ধান জ্ঞাত হইয়া, এবং অধ্যয়নের শেষাবস্থায় মিথিলাদেশে গিয়া পঞ্চধর মিশ্রের নিকট কিছুকাল থাকিয়া, ‘চিন্তামণি’ গ্রন্থের ‘দীধিতি’ নামে একখানি টীকা করেন। তাহাতেও অনুমান-ঘটিত নানা গুড় উপদেশ সাধারণে প্রকাশ পায়। তৎপরে মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি আচার্য্যগণ ‘দীধিতির’ সামগ্রী সমূহ পৃথক পৃথক ভাবে অবলম্বন করতঃ প্রত্যেক সামগ্রীর অতি বিস্তৃত বিস্তৃত টীকা করিয়া অনুমান-ঘটিত বিপুল উপদেশ লিপিবদ্ধ করতঃ রাশি রাশি পুস্তক প্রণয়ন করেন। মথুরানাথ ‘দীধিতি’ বাতীত ‘চিন্তামণিরও’ টীকা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত চিন্তামণির টীকাই প্রচলিত ; দীধিতির টীকা প্রচলিত নাই। এইরূপে ক্রমশঃ বঙ্গদেশই অনুমানখণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ রূপে পরিগণিত হইল। যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক এক্ষণে আলোচিত হইয়া থাকে, তাঁহাদেরই পরিচয় প্রদান করা হইল। ইহাদের পরে অনুমানখণ্ডের আর যে সকল আচার্য্য জন্মিয়াছেন,



এই সকল গ্রন্থের টীকাটীপনী প্রকাশ্যভাবে তাঁহার করেন নাই। আপনাদের চিন্তালব্ধ সামগ্রী সাধারণকে জানিতেও দেন নাই। অপরাপর সম্প্রদায় অপেক্ষা নিজ সম্প্রদায়কে গৌরবান্বিত করিবার জন্য আপনাদের চিন্তালব্ধ ও গুরুপরম্পরায় উপদেশ-লব্ধ পদার্থ সকল আত্মছাত্র পরম্পরায়ই অমূল্যলীন করাইয়াছেন, এবং সভাক্ষেত্রে নানা সমাজের নৈয়ায়িকগণ সমবেত হইলে, সেই সকল নূতন নূতন কথা উত্থাপন করতঃ পরম্পরে বিচারাদি করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। এইরূপে সভার বিচারে বিচারেও নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে অমূল্যলিত অমুমানখণ্ডের বহু স্বল্প-সন্ধান, নানা আশঙ্কা, বিবিধ মীমাংসা, নৈয়ায়িক-সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

এইরূপে অমুমানখণ্ডের সাহায্যে সকল শাস্ত্রের উপরই আবশ্যকীয় বিতর্ক-বুদ্ধি উদ্ভূত হওয়ার, ভারতীয় বিজ্ঞানসমাজে নৈয়ায়িকগণেরই প্রাধান্য বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, এবং সকল শাস্ত্রের বিচারেই প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকগণ চিরদিন মধ্যস্থতা করিয়া অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত অমুমান-ঘটিত পথ সকল লইয়া বিতর্ক উত্থাপন করতঃ নৈয়ায়িক-গণের মধ্যে আপনাদের পরম্পরে যে সকল বিচার হয়, তাহা একান্ত চূর্ণোদ্যম। 'ভীক্ষুধী নৈয়ায়িক ব্যতীত কোন' শাস্ত্রের কোন' অধ্যাপকেরই তাহার ক্ষুদ্রাংশেরও মর্ম্মগ্রহ হইবার উপায় থাকে না। সুতরাং সর্বসাধারণের সে বিচারে রসানুভব করিবার উপায় নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান নৈয়ায়িকগণকে সেই রস সকল শাস্ত্রের সকল রস অপেক্ষা মুগ্ধ করিয়া থাকে, এবং তাহা কত অমূল্য ন্যাশ্রয়ত্ব মহাশয় নিয়মিত কবিতা দ্বারা সর্বসাধারণকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কাব্যাদাবপি কৌমলে সতি মহাকাঠিন্য দীপ্যন্তি  
 কিং স্বাদ্ যুগদনাদরঃ সঙ্ঘদয়াস্কর্কোঽপ্যদৌদিতৈ ।  
 সর্বস্বাসঙ্ঘদয়ঙ্কমেঽপি হৃদয়ে লিপি নৃপসন্দনে  
 হারি মারকতং শিলাময়মপি প্রীত্যা ন কিং ধারয়েত্ ॥

ভাবার্থ। অতি কৌমল অর্থাৎ সূখবোধ্য কাব্যাদি নানা বিষয়  
 আছে। তর্ক-শাস্ত্র সেরূপ নহে সত্য। ইহা মহাকাঠিন্য-দোষে ছুটে,  
 এবং সর্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাই বলিয়া কি, হে বুদ্ধিমন-  
 গণ, তোমরা ইহাকে অনাদর করিতে পার? হৃদয়ে ধারণ করা  
 অন্তের পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাই বলিয়া নৃপতি কি সুপ্রাপ্য-  
 চন্দনামূলিগুণ বক্ষঃস্থলে সূকঠিন মরকত শিলার হার ধারণ করেন না ?

ন্যায়রত্ন মহাশয় কোন' বিষয়েরই নিন্দা করিলেন না। কারণ  
 চন্দন সকলেরই অতি আদরের সামগ্রী। কেবল মূল্য বিবেচনায়  
 চন্দনে ও মরকত হারে বৈরূপ পার্থক্য, অন্যান্য শাস্ত্র সহ তুলনায়,  
 ন্যায়শাস্ত্রে সেইরূপ পার্থক্য করিলেন। চন্দন সকলেরই হৃদয়ঙ্গম  
 হইয়া প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হয়, কিন্তু মরকত হার সকলের হৃদয়ঙ্গম  
 হইতে পার না; কেবল নৃপতিগণেরই হৃদগত হইয়া তাঁহাদেরই  
 মাত্র প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকে।

ভায়রত্ন মহাশয়ের জীবন-চরিত অন্বেষণ করিলে জানা যাইবে,  
 তিনি সকল শাস্ত্রের রসাস্বাদনে সমর্থ। কাব্য-রসে অসামান্য রসিক।  
 কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের তুল্য কিছুই তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই।  
 শুধু ন্যায়রত্ন মহাশয় নহেন। ন্যায়শাস্ত্রের অগ্রমানখণ্ডের পূর্ণ  
 রসানুভব করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অপেক্ষা কেহ কস্মিন্ কালে শাস্ত্রান্তরের  
 পক্ষপাতী হইয়াছেন, ইহা আমরা এ পর্য্যন্ত শুনি নাই। তবে পূর্বেই

বলিয়াছি, ন্যায়শাস্ত্রের অনুমান-থও এতই দুর্বোধ্য যে, ইহার রক্ষা-  
স্বাদে অসমর্থ হইয়া কাহারও কাহারও পক্ষে ইহাকে নীরস বলিয়া  
অনুভব করা অসম্ভব নহে । তাঁহাদের সম্বন্ধে বলি, সকল শাস্ত্রের  
রস আন্বাদন করিয়া তাঁহারা যদি এই অনুমান-থওেরও অন্ততঃ  
কিয়দংশ বুঝিবার শক্তি লাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও  
শ্রায়রত্ন মহাশয়ের তুল্য অনুমান-থওেরই সমধিক পক্ষপাতী হইতেন ।  
এ সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্তি এই—

মীল্য-মাধুর্য্য-বৈধুর্য্য-দোষশ্চেদবধার্য্যতে ।

নাবগাহ্য নচাস্বাদ্য তরঙ্গিণ্যস্তু তেন কি ॥

অর্থাৎ, তুমি অবগাহন না করিয়া যদি নদীর জল শৈত্যহীন  
বিবেচনা কর, আন্বাদন না করিয়া যদি কটু বিবেচনা কর, তাহাতে  
তরঙ্গিণীর কিছু আসে যায় না ।

ন্যায়শাস্ত্রে কি প্রগাঢ় অমুরাগ ও রসানুভবেরই ব্যঞ্জক এই সকল  
কবিতা !!

অনুমান-থওের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কবিতা দুইটি কোনও বিশেষ  
ঘটনা উপলক্ষে রচিত হয় । পরে ঐ ভাবই রক্ষা করিয়া স্বরচিত  
'তত্ত্বসার' নামক গ্রন্থে দুইটি কবিতা ন্যায়রত্ন মহাশয় সন্নিবেশিত  
করেন । নৈয়ায়িকগণ 'জীবাশ্মা' ও 'মনঃ' পৃথক্ বলেন । কিন্তু  
অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে 'অন্তঃকরণকেই'  
স্বত্বহুঃখাদির আশ্রয় বলিয়াছেন । শ্রায়রত্ন মহাশয়ও অতিরিক্ত  
'জীবাশ্মা' স্বীকার না করিয়া 'মনেহ' ঐ সকল প্রতিপন্ন করতঃ  
'মনেই' 'জীব' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন । প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের  
অনুমানে দোষোদ্ভাৱন পূৰ্ব্বক স্বীয় অনুমানের সামগ্রী সমূহ উক্ত

‘ভাষ্যসারঃ’ গ্রন্থে ম্যায়রত্ন মহাশয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং জ্ঞতি ও অজ্ঞানা দর্শন সাধক দেখাইয়া তাহাকে ‘নবাতৈয়্যায়িকমত’ এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল অনুমানের সামগ্রী ও আবুদগিক আপত্তি, উপপত্তি প্রভৃতি এখানে উদ্ধার করিয়া দেখান অসম্ভব। কারণ, সেই সমুদয়ের দ্বারা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ গঠিত হইয়াছে। তবে, নবাতৈয়্যায়িকমতে কোন্ কোন্ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, নৈয়্যায়িকগণের প্রচলিত প্রাচীন মত হইতে তাহা কোন্ কোন্ অংশে বিভিন্ন, ইহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে কতিপয় সিদ্ধান্ত-কারিকা মাত্র প্রদর্শিত হইল। ‘জীবাত্মা’ ও ‘মনে’ ঐক্য সংস্থাপনে নৈয়্যায়িকের এই সর্ব-প্রথম উত্তর। ‘পরমাণু’ ‘বিশেষ’ প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং অন্য প্রকার নবীন পদার্থ বাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে, পূর্ব পূর্ব নৈয়্যায়িক আচার্য-গণের মধ্যেও কেহ কেহ তাহা করিয়া গিয়াছেন।

মনসামিব চেতন্যং তত্ত্বৈবৈচ্ছাদিকাগুণাঃ ।

অহং প্রতীতি স্তত্রৈব ন তু জীবান্তরস্থিতিঃ ॥

অনন্তজীব সংযোগ বিয়োগাদেবপেচয়া ।

মহত্বজন্যে যুক্তৈব বাছ্যাদ্যচ্চৈ বিজাতিতা ॥

যোগিবিচ্ছবিদধরচ্চৈ মহত্বাজন্যতাময়ে ।

গুরুধর্মেণ তদজত্ব স্লোকতপচ্চৈতি গৌরবং ॥

সুটৌ দ্রব্যস্য বিষ্যামাদ্ দ্বাণুকাদেবলীকতা ।

প্রত্যক্ষৈ বড়বিধৈ তস্মাত্ পরিমাণং ন কারণং ॥

দ্রব্যত্বচ্চ গুণত্বচ্চ ক্রিয়াত্বং সমবায়তা ।

অসংখ্যোপাধিজাতিত্বং ধর্ম্মা ভাববিভাজকাঃ ॥

दृष्टा प्रकारतात्वाद्यमखण्डोपाधिराहतः ।  
 विशेषा निद्रिताः सन्तु सार्धं व्योमाज्ज सौरभैः ॥  
 भूर्वार्जितेजः पवनः परमात्मा तथा मनः ।  
 द्रव्यानि षड्विधान्येव जीवादिर्नेतरस्ततः ॥  
 उपमाबोधकं मानं श्रुत्यादिषु न दृश्यते ।  
 अतोप्यस्यास्तु करणे मन्यतामनुमानता ॥





## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।



সভাস্থলে নানা সমাজের বিদ্বৎবাচকগণ সহ  
শাস্ত্রীয় আমোদ প্রমোদ । স্বীয় সম্পদ-  
দায় সৃজন । ‘মহামহোপাধ্যায়’  
উপাধি লাভ । সম্রাজতীয়  
সম্প্রদায়ের উপর  
আবালা প্রাধান্ত  
নিদর্শন ।

ক্রীড়াচতুরে ক্রীড়াচতুরে সম্মিলন ঘটলে, ক্রীড়া-কৌতুকের দ্বারা  
পরস্পরে অপার আনন্দ উপভোগ করেন । প্রকৃত বীর, সমকক্ষ  
বীরের সহিত উল্লাস সহকারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন । যিনি যে  
বিষয়েরই বাসনে মত্ত, তিনি সেই বিষয়ের উপযুক্ত বাসনী পাইলে  
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্ব স্ব বাসন-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন । শাস্ত্রচর্চাই  
যাহাদের বাসন, তাঁহাদের পরস্পরে একটি আনন্দ-ক্রীড়া আছে ।  
সভাস্থলে নানা সমাজ হইতে যখন সুহৃৎগণ উপস্থিত হন, তখন  
তাঁহারা এই ক্রীড়ায় মত্ত হন । সেই সময় চতুরে চতুরে শাস্ত্রীয়  
চাতুরি-পরীক্ষার আদান-প্রদানে অপার আনন্দোৎসব হইয়া থাকে ।  
পূর্বে, ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগের একটি দল ছিল । তাঁহারা সভা-  
স্থলে পরস্পর সমবেত হইলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আত্মবাসনে মত্ত

হইতেন। দলের মধ্যে কেহ পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিতেন, কাহাকে কাহাকেও মধ্যস্থ রাখা হইত, কেহ উত্তরবাদী হইতেন। এখনও ঐ প্রকারে সভাহলে অধ্যাপকগণের আনন্দ উপভোগ করিবার নিয়ম থাকিলেও, পূর্বে এই আনন্দ অনেক অধিক পরিমাণে ছিল। এই ক্রীড়ায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নৈপুণ্য এতই ছিল যে, তাঁহার প্রধান প্রধান বন্ধুগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে কখন' পশ্চাৎপদ করিতে পারেন নাই। বিচার কালে অশেষ প্রকারে তিনি বন্ধুগণ সহ কৌতুক করিতেন। কখনও বা পূর্বপক্ষ জুনিবামাত্র উত্তর করিতেন। কখনও বা পূর্বপক্ষ সাজাইবার কালেই এমন বিচার-পথ অবলম্বন করিতেন যে, তাহা পূর্বপক্ষ বলিয়া মধ্যস্থগণ কর্তৃক স্বীকৃতই হইত না। এইরূপ শাস্ত্রীয় ক্রীড়া-কৌতুকের সময় বয়স্বে বয়স্বে অনেক রহস্যও চলিত। একদা, যশোহর জেলায় লক্ষ্মীপাশা নামক স্থানে কোনও সভায়, শিরোমণিকৃত 'পদার্থধ্বজ' নামক গ্রন্থের বিচারে, ন্যায়রত্ন মহাশয়, পূর্বপক্ষ সাজাইবার কালেই একটা প্রধান বন্ধুকে এইভাবে নিরাস করিলে পর, বিক্রমপুর-নিবাসী মধ্যস্থ ৮সারদা চরণ তর্কপঞ্চানন রহস্য পূর্বক বলিলেন “বিচক্ষণ অধ্যাপকের নিকট পূর্বপক্ষ করিতে গিয়া, পূর্বপক্ষ না সাজাইতে সাজাইতে অল্পপাঠী ছাত্র যেমন নিরস্ত হয়, আপনার ন্যায় প্রবল অধ্যাপকও সেইরূপই হইল?”

একবার পুটীয়ার রাণী মনোমোহিনী দেবীর বাটীতে, পুরদেশীয় কোনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতসম্প্রদায় সভা উপলক্ষে গমন করিয়া, ‘সামান্য লক্ষণা’ গ্রন্থের তত্ত্বপট-কার্য্যাকারণ-ভাব বিচার প্রকরণে দুরূহ সমস্যা উত্থাপন করতঃ চারি দিবস কাল তাহার আলোচনা করিয়া রাখেন। সভাদিনে স্তায়রত্নমহাশয় ক্লান্ত হইয়া, ঘর্ম্মাক্ত শরীরে সভা-প্রবেশ

করিবা মাত্র, সেই অবস্থায় তাঁহার নিকট ঐ পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হইল। ন্যায়রত্ন মহাশয় এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মীমাংসা করিলেন যে, মুর্শিদাবাদ-নিবাসী মধ্যস্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি সভাক্ষেত্রে বলিলেন “চারি দিবস স্থগ্নাশ্রুত রূপে আলোচনা করিয়া রাখিয়া এই ফল হইল?”

একবার কলিকাতা কাশীপুরে জমীদার ও প্রাণনাথ চৌধুরির শ্রাদ্ধ-কালে কোনও সম্প্রদায় কর্তৃক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ‘সংপ্রতিপক্ষ’ গ্রন্থের এক জটিল পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হয়। সেই পূর্বপক্ষের সত্ত্বত্তর হইবেনা, ইহা বিবেচনা করিয়া বহুতর পণ্ডিত ন্যায়রত্ন মহাশয়কে অপ্রতিভ করিবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চতুরতা কাহারও অপেক্ষা কম নহে। তিনি বন্ধুগণের মধ্যে এক নূতন রহস্য করিলেন। সভা-ক্ষেত্রে বলিলেন “আমার নিকট যে জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার সত্ত্বত্তর আমি নিশ্চয়ই করিব। কিন্তু অগ্রে সভা মধ্যে, মধ্যস্থগণের নিকট আমি প্রমাণ করিতে চাই যে, আমি ভিন্ন অন্য কোনও পণ্ডিতই ইহার সত্ত্বত্তর করিতে সমর্থ নহেন।” এই বলিয়া ঐ পূর্বপক্ষটীর আলোচনা দ্বারা, সকল সম্প্রদায়কে নিরস্তর করিয়া, শেষে নিজে উহার সত্ত্বত্তর করেন ও মধ্যস্থগণ কর্তৃক সেই উত্তর পরিগৃহীত হয়।

একবার ঘলবলিয়া নামক স্থানে কোনও ক্ষুদ্র-সভায় নিকটবর্তী স্থানের অরসংখ্যকমাত্র অধ্যাপক আহূত হইয়া জায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ‘প্রথমাব্যুৎপত্তিবাদের’ ‘সাধুপাকঃ’ ইহার বিচার-ঘটিত এক পূর্বপক্ষ উত্থাপন করেন। জায়রত্ন মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহার সত্ত্বত্তর করিলেন। কিন্তু অল্প কোনও সময়, কলিকাতা ফিদিরপুরে একটী



স্বয়ং সভায় নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান অধ্যাপক যখন সমবেত হইলেন, ভট্টপল্লীনবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্কভোম সেই পূর্বপক্ষ সেখানে উত্থাপন করাইয়া দেখিলেন তাঁহাদের কেহই কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। গুপ্তিপাড়ার ৬ গঙ্গাধর বিজ্ঞানরত্ন সে বিচারে মধ্যস্থ ছিলেন।

একবার পূর্ববঙ্গে ‘স্থল’ নামক গ্রামে তত্রত্য ভূম্যধিকারীর গৃহে এক সভায় মিথিলা-দেশের বিচক্ষণ নৈয়ামিক মহামহোপাধ্যায় ৬ বিশ্বনাথ ওঝা মহাশয়ের নিকট বঙ্গদেশীয় কোন’ প্রসিদ্ধ বিদ্বৎ-সম্প্রদায় এক পূর্বপক্ষ উত্থাপন করেন। বঙ্গদেশীয় বহুতর প্রধান প্রধান নৈয়ামিকের প্রতিকূল-তর্ক সত্ত্বেও ওঝা মহাশয় শাস্ত্রার্থের সহজতর করেন। ত্রায়রত্ন মহাশয় সেই অবস্থায় রহন্ত দেখিবার জন্য গ্রন্থের চিরপ্রচলিত অর্থে দোষারোপ করতঃ একটা নবীন-ব্যাখ্যা সহসা এমনই সঙ্গত-ভাবে বিদ্বন্মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সেরূপ ব্যাখ্যায় পূর্বপক্ষের আর উদ্ধার হইল না। সভা-ক্ষেত্রে সকল নৈয়ামিক স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। উত্তরবাদী ওঝা মহাশয়ও সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্বক মানসিক উত্তেজনায় বলিয়া উঠিলেন “আপ্ বৃহস্পতি হায়্।”

এইরূপে সর্বদা অলৌকিক শাস্ত্রীয়-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া, ত্রায়-রত্ন মহাশয় বয়স্যগণের একান্ত অমুরাগ-ভাজন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ কেহ তাঁহাকে কখনও পশ্চাৎপদ করিতে পারিলেন না। হয় পূর্ববাদী, নাহয় উত্তরবাদী, নাহয় মধ্যস্থ, এই তিন পক্ষের কোনও পক্ষে অবস্থান করতঃ, ছাত্রাবস্থা হইতে প্রাচীনাবস্থা পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শত শত বিচার-সভায়, যিনি তार्কিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইয়া বিদ্বন্মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছেন তাঁহার বিচার-বল

হই চারিটি উদাহরণ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ভায়রশাস্ত্রের বাক্যাবলী ভাষায় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কাষেই ভায়রর মহাশয়দিগের এই সকল বিচার-কাহিনী জ্ঞাত হওয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। ইহাদের এই সকল বিচারের বৃত্তান্ত নানাস্থানের নৈয়ামিকেরা জ্ঞাত আছেন। যে সকল পূর্বপক্ষের উত্তর প্রচলিত নাই, টীকাকার, পত্রিকাকার যে সকল বিষয়ের মীমাংসা করেন নাই, সেই সকল নূতন নূতন বিষয় বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত করিয়া তাহার সুমীমাংসা করিতে এবং বহু প্রচলিত মীমাংসার দোষোদ্ভাবন করতঃ স্মৃতির রূপে তাহার সমাধান করিতে, ভায়রর মহাশয়ের অসীম ক্ষমতা। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভায়রশাস্ত্রের কথা ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। এই সকল লৌকিক বর্ণনার দ্বারা ভায়রর মহাশয়ের বিচার-পাণ্ডিত্যের কিয়দংশও কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না। ভায়রর মহাশয়ের বন্ধুবান্ধবেরা এক এক সময় প্রচলিত গ্রন্থ পরিত্যাগ পূর্বক, অপ্রচলিত গ্রন্থের হুকুম স্থল সকল অন্বেষণ করিয়া রাখিতেন, এবং সভাশূলে ভায়রর মহাশয়ের নিকট তাহা উত্থাপন করিতেন। নব্যাবস্থায় এক প্রবল সভায় মথুরানাথ-কৃত ‘গুণ-গ্রন্থের’ ‘বিশেষগুণের’ লক্ষণে স্তঃসমাধের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, কতিপয় বয়স্য এক প্রান্ত হইতে স্নেহ-বাক্যে বলিয়া উঠিলেন “ইহার উত্তর করা রাখালের কার্য্য নহে।” ভায়রর মহাশয়ের উত্তর মধ্যস্থগণ কর্তৃক সত্ত্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলে, ভায়রর মহাশয়ও বলিলেন “আজ হইতে মনে রাখিবেন, আপনাদের মাথা নাড়া নিবৃত্তি করা, রাখালের যষ্টিরই কার্য্য।” ক্রীড়া-কৌতুকের স্বাভাৱ্য প্রতিঘাতে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একগরহস্ত শুধু আনন্দেরই স্বাদ অঙ্গ নহে, উত্তরোত্তর উত্তেজনারও উদ্দীপক। নববীরের ৬ ভুবনমোহন বিজয়ারত্ন, কুড়ুকদিহির ৬ রামধন তর্কপঞ্চানন, বিদ্যপুষ্করিণীর ৬ প্রসন্ন চন্দ্র

ভায়রত্ন, বর্দ্ধমানের ৮ ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন, কোল্লগরের ৮দীনবন্ধু ভায়রত্ন, গুপ্তিপাড়ার ৮ গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন, বিক্রমপুরের ৮সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, দারবঙ্গের ৮ বিশ্বনাথ ওঝা, মুর্শিদাবাদের জীবন্ত জীরাম শিরোমণি প্রভৃতি নানা সমাজস্থ প্রধান প্রধান নৈয়য়িকগণ মিলিত হইয়া বৃহৎ সভা হইলে প্রায়ই ভায়রত্ন মহাশয়দিগের এইরূপ আনন্দ-ক্রীড়া চলিত ।

পূর্বে, বিদ্যৎসঙ্কুল সভা-ক্ষেত্রেই পাণ্ডিত্য প্রচারের একমাত্র স্থল ছিল । সুতরাং ক্ষুদ্র ছাত্র হইতে সম্মানী অধ্যাপক পর্য্যন্ত সকলেরই জীবন-মরণ সভাক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিত । এখন সভার বিচারে পণ্ডিতগণেরও তাদৃশ আগ্রহ নাই, বিষয়লোকের মধ্যেও কোন' কোন' অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রীয় তর্ককে অসার কোলাহল বলিয়া স্থির করিয়াছেন । পূর্বে, প্রত্যেক পণ্ডিতের চিত্তে বিচার সময়ে কি ঘোর উৎসাহ ও উত্তেজনার সঞ্চার হইত, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা সহজে অনুভব করা যায় ।

কোনও একটা সমাজের জনৈক অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন অধ্যাপক ন্যায়শাস্ত্রের হেত্বাভাস বিভাগে এতই অগ্রম করিয়াছিলেন যে, তিনি সর্বদাই গর্ব রাখিতেন হেত্বাভাসের কোনও পদার্থ তাঁহার চিন্তার আবিস্ময়ীভূত হইতে পারে না । ন্যায়রত্ন মহাশয় পঠদশায় যখন সভায় পূর্বপক্ষ করিতেন, তখন তাঁহার সর্বদা মনে হইত, ঐ মনীষীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি হেত্বাভাসেরই বিচার করিবেন । পরে উল্লোর অসামান্য-বিদ্যোৎসাহী ৮ বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটতে মান-যাত্রার পরোপলক্ষে উক্ত সুধী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয় হেত্বাভাসের 'সব্যভিচার' গ্রন্থের পূর্বপক্ষ করেন । তখন সব্যভিচার গ্রন্থ পর্য্যন্তই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাঠ হইয়াছিল । প্রথম

দিন বিচারে ঐ পূর্বপক্ষের কোনও উত্তর না হওয়ার, উক্ত অধ্যাপক চিন্তা করিবার জন্য একদিন সময় গ্রহণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন বিচারেও কোনরূপ সহুত্তর না হওয়ার, উক্ত গুণগ্রাহী মহোদয় সর্ব-সমক্ষে বলিলেন “আমি ঠেকিলাম।” পরে দেশে গিয়া বলিতে লাগিলেন “আমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। আমি ভাটপাড়ার একটি অন্নপাঠি-ছাত্রের নিকট হেঁস্বাভাসে ঠেকিয়া আসিয়াছি।” তাঁহার এই বাক্যে একদিকে যেমন বিদ্বৎ-হৃদয়ের লোকোত্তর গুণগ্রাহিতা প্রকাশ পাইতেছে, অতি ক্ষুদ্র ঘটনাও সম্মানী ব্যক্তির জীবনান্ত করিয়া থাকে, অন্যদিকে অক্ষরে অক্ষরে মর্ম্মভেদি ভাষার ইহা বাক্য হইতেছে। সভাক্ষেত্রে একটি পূর্বপক্ষের সহুত্তর করিতে না পারিয়া, পরাতব-বাণী নিজ মুখে সর্ব-সমক্ষে ঘোষণা করেন, এরূপ মহাত্মা যদি কেহ জন্মিয়া থাকেন, তবে উক্ত মহাপুরুষই ঘুঝি জন্মিয়াছিলেন। কোনও দেবতা বোধ হয় পূর্বেই তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন ‘জীবনে তুমি যখন প্রথম লজ্জা পাইবে, তখনই তোমার আয়ুঃশেষ বুঝিবে।’ ঐ শিষ্ট-ব্যক্তির বাক্য এতই সত্য হইল যে, সম্বৎসর না যাইতে যাইতে, পূর্ববন্ধের একটি প্রধান বিদ্বৎ-সমাজ শূন্য করিয়া তিনি স্বর্গ গমন করিলেন। প্রকৃতই, আয়ুঃশেষ হওয়ার ঐ সজ্জন স্বর্গ গমন করেন ইহার সহিত লৌকিক কোনও ঘটনারই যোগ নাই। তথাপি উক্ত অধ্যাপকের কথার ও কার্যে এমনই ঐক্য হইয়া গেল যে, শুনিবামাত্র শরীর শিহরিয়া উঠে। স্বংকালে শাস্ত্রীয় সভা সমূহ জৈদৃশ স্বধীগণের এতাদৃশ উত্তেজনা-ভূমি ছিল, প্রাধান্য লাভার্থ তৎকালে বাহাদিগকে, সর্বদা বিচার করিতে হইয়াছে, তাঁহাদের প্রাধান্য, প্রকৃতই প্রাধান্য।

একদিকে, এইরূপে প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে, ছাত্রোপছাত্রগণের অনার্যন অধ্যাপনাদির দ্বারা, বঙ্গদেশের নানা স্থান ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সম্প্রদায়ে পূর্ণ হইতে লাগিল। ভাটপাড়ার এক্ষণে যত নৈয়ায়িক আছেন অবচ্ছেদ্যবচ্ছেদে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সম্প্রদায়, অর্থাৎ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র অথবা ছাত্রের ছাত্র। এইরূপে শুধু ন্যায়রত্ন মহাশয় নহে, তাঁহার সম্প্রদায়ও নানা স্থানে বিদ্যা বিস্তার করিয়া নানারূপ কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিলেন।

প্রথম অধ্যাপনাবস্থায় দান্তিক বলিয়া তৎকালের বিদ্বৎসমাজে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কিঞ্চিৎ দুর্নাম প্রকাশ হয়। কিন্তু প্রাধাত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই সে দুর্নাম তিরোহিত হইয়াছিল, এবং যে সকল বিদ্বান্ অধ্যাপক গুরুদায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রাপ্তিপক্ষতাচরণ করিতেন, সকলের সহিতই তদবধি একান্ত সম্ভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৫০বৎসর রাজত্ব হইলে, যে সময় জুবিলি নামে রাজ্যোৎসব হয়, তৎকালে দেশীয় উচ্চ কল্পের অধ্যাপকগণের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্ত গভর্নমেন্ট 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি সৃষ্টি করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ বঙ্গদেশের ৮ জন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপককে, ঐ উপাধি দ্বারা সর্বপ্রথমে ভূষিত করেন। তদবধি অন্ত্যাত্ম অধ্যাপকাদিগকেও ঐ উপাধি যোগ্যতানুসারে মধ্যো মধ্যো প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। প্রথম মহামহোপাধ্যায়গণের মধ্যে সকলে এক্ষণে জীবিত নাই।

সজাতীয় সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিবেন, বাল্যকাল হইতে শ্রায়রত্ন মহাশয়ের ইহা যেন বিধি-নির্ধারিত ছিল। তৎকালের চতুষ্পাঠিতে পাঠের আনন্দের স্থায় অত্যাশ্রয় নানা রকমেও ছাত্রেরা আনন্দ করিতেন। পরস্পর চাঁদা তুলিয়া তাঁহার প্রায়ই আনন্দ-

ভোজন করিতেন। সেই সকল আনন্দ-ভোজনাদির সুবন্দোবস্ত হইতে সহপাঠিগণের শাসন-প্রণালী পর্য্যন্ত, সকল ভারই ত্রায়রত্ন মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। ক্রীড়া-কৌতুকে বল, বৃষ্টি-পরামর্শে বল, কাহারও সহিত আলাপ-পরিচয়ে বল, কোনও গোলযোগ-দমনে বল, সর্ববিষয়ে তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকেই অধ্যক্ষ করিতেন। এইরূপ বাল্যকাল হইতে যে বিষয়েই দৃষ্টিপাত করা যায়, ত্রায়রত্ন মহাশয়ের কর্তৃত্ব যেন অদৃষ্ট-লব্ধ ছিল। শেষে তাঁহার অধ্যাপক-জীবনের আধিপত্য, মানব-জীবনের একটি প্রার্থনীয় সামগ্রী। ব্যবস্থাগ্রহণে, ধর্ম্মাধর্ম্মের শাস্ত্রীয়তা অশাস্ত্রীয়তা নিরূপণে, সামাজিক বিধি-বন্ধনে, সমগ্র হিন্দুসমাজ অধ্যাপক-মণ্ডলীরই চিরকাল অধীন। এই সকল বিষয়ে হিন্দু-সমাজে আভূপ-সাধারণের উপর অধ্যাপক-সম্প্রদায়েরই পূর্ণ রাজত্ব। সেই অধ্যাপককূলে যাহার প্রতাপ পরিব্যাপ্ত, নানা সময়ে হিন্দুরাজ্য এবং ভূমাদিকারিগণকেও নানা বিষয়ের জন্ত তাঁহার মুখাপেক্ষা করিতে হয়। তাহার উপর ভট্টপন্নী নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজের সাম্প্রদায়িকতা বদ্ধমূল। একারণ এই সকল সমাজের প্রাধান্ত-পদ, দেশবাসি-হিন্দুগণের অনন্ত আবেদন-অভিযোগে অহর্নিশ আচ্ছন্ন থাকে। এই জন্তই বলিয়াছি, সেই ভট্টপন্নী-সমাজে প্রাধান্ত-পদে সমাসীন হইয়া ত্রায়রত্নমহাশয় যে আধিপত্য করিয়াছেন, তাহা মানব-জীবনের একটি প্রার্থনীয় সামগ্রী। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সন্তানগণের কি ছুর্ভাগ্যেরই সময় পড়িয়াছে বলা যায় না। যেহেতু, এই দুর্লভ মাত্রতা ব্রাহ্মণপণ্ডিত-জীবনের আরস্তাধীন হইলেও, শিখাবিলম্বিত মুণ্ডিত-মস্তকের পরিবর্ত্তে শ্রেণীবদ্ধ চিকণ কেশ কলাপে মমতা, চন্দন-রেখাঙ্কিত ভালদেশে ঘৃণা, শুষ্ক-ঋশ্মমুণ্ডনে অপমান বোধ, অতি অল্প মূল্যের কোট বামিজের গোরব

জ্ঞান, চটীজুতার পরিবর্তে বুটজুতার স্বর্ণবোধ প্রভৃতি, সাংক্রান্তিকতা দোষে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সন্তানগণের মধ্যেও ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে। আমার বোধ হয়, এই সকল ভুল বিষয়ে গৌরব-বুদ্ধি এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, অন্য কোনও গুরুতর লাভ না থাকিলেও, ঐ সকল নগণ্য পদার্থ ব্যবহার শুরুর হইবে, এই অভিলাষেও অনেকে চিরমাত্র আর্য্যশাস্ত্র-চর্চা ও তাহার অবশুভাবি-রাজমাত্রতা উপেক্ষা করতঃ বাবুদলে প্রবিষ্ট হইতে স্পৃহাবান্ হইবেন। বেঙ্গালয়ে, শালি-সমাজে ও ইয়ারের দলে কিছু উপেক্ষা আসিলে, ঐ সকল বেশভূষায়ও সহজেই উপেক্ষা আনা যায়। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকৃত শিক্ষিত ও প্রকৃত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আড়ম্বরহীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পরিচ্ছদকে চিরকালই শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করিয়া আসিয়াছেন। কতকগুলি অশিক্ষিত অসার ফোতোবাবুই কেবল চটীজুতা, শিখা ও চন্দন-রেখায় উপহাস করিয়া মনের সন্তোষলাভ করেন।





## সঞ্চয় পরিচ্ছেদ ।

কবিতা ও সঙ্গীতে অনুরাগ । বাঙ্গালা  
রচনার নমুনা । সুহৃৎ প্রিয়তা ।  
গুরুভক্তি । জাতিবাৎসল্য ।

শ্রীযুক্ত মহাশয় একজন অদ্বিতীয় দার্শনিক হইলেও, শুধু দার্শনিক নহেন । কবিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি বাগ্‌দেবীর সুকোমল সামগ্রী সকলেরও তিনি অনেক সেবা করিয়াছেন । ছাত্র-জীবনে, দর্শন-শাস্ত্রের কঠোর সমস্তা-সমূহের মর্শ্বোদ্ঘাটন পূর্বক, রাত্রিকালে চতুর্পাঠী হইতে যখন তিনি গৃহে ফিরিতেন, মানসিক-ক্লান্তি অপনোদনের জন্ত পথে উচ্চ-কণ্ঠে ভগবদ্‌গুণগান করিতে করিতে যাইতেন । তিনি এমনই সুকণ্ঠ যে, তাঁহার সেই গান শুনিবো বলিয়া পথি-পার্শ্বস্থ গৃহস্থেরা বহু পূর্বক জাগিয়া থাকিত ।

শ্রীযুক্ত মহাশয়ের কবিজীবনের সাধনা অব্বেষণ করিলে, হৃদয়-বান্ ভাবুকগণের কৌতূহলোদ্দীপক অনেক সামগ্রী পাওয়া যায় । কেবলমাত্র সংস্কৃত কবিতা নহে, নব্যাবস্থায় তৎকালোপযোগী বাঙ্গালা রচনাও অবসর মতে শ্রীযুক্ত মহাশয় অনেক করিয়াছিলেন । পূর্বেই বলিয়াছি, কোনওরূপ সম্প্রদায়-স্বজনে অথবা প্রতিষ্ঠা-অর্জনে শ্রীযুক্ত মহাশয় নিজের কবি-জীবনকে নিয়োগ করেন নাই । এ বিষয়ে



তিনি এতই উদাস ছিলেন যে, সকল রচনা যত্ন সহ রক্ষিতও হয় নাই ।  
তাহার সেই নব্যাবস্থার বাঙ্গালা রচনার লিপি, একখানিও আর  
পাওয়া যায় না । সংস্কৃত রচনা-শক্তির সমালোচনার পূর্বে, জ্ঞানরত্ন  
মহাশয়ের বাঙ্গালা রচনার ভঙ্গি কিরূপ ছিল, তাহার আদর্শ,  
'আগমনী' নামক তাহার রচিত একখানি পাঁচালী হইতে নিম্নে প্রদত্ত  
হইল । প্রথমেই কৈলাস-বর্ণনা পূর্বক উমাকে হিমালয়ে যাত্রা করান  
হইতেছে । যথা,

কৈলাস সর্ব-প্রধান                      যথায় বিরাজমান

সহাসনে শঙ্কর শঙ্করী ;

স্বর্গ তো অতি সামান্য,              ব্রহ্মলোক নহে মান্ত,  
গণ্য নহে গোলোক-নগরী ।

যে স্থানের বিল্ববনে                      বিজনে একাগ্রমনে

যোগ-বাক্য বিরূপাক্ষ-মুখে,

শুনিয়া কাল-বারিণী                      মহাকাল কুটুম্বিনী

নিমগন অগণন স্তূথে ।

সে বনে করিয়া বাস                      শুক পক্ষী যোগাভ্যাস

করে', ব্যাসালয়ে জন্ম ল'য়ে,—

শুকদেব নাম ধরি'                      হর্ষে হরি-ভক্তি-বারি

বর্ষিলেন মহর্ষি হইয়ে ।

যে স্থানে শাশানক্ষেত্র                      জানিয়া অতি পবিত্র

যোগাভ্যাসে যোগী করে বাস,

স্বয়ং ব্রহ্ম গগনপতি                      যে স্থান রক্ষায় ত্রুতী  
 দ্বারি-ভাব ধরি' বার মাস ,  
 কৈলাসের কত ব্যাখ্যা                      ইহাতে কর পরীক্ষা  
 যে স্থানের পিণ্ডাচ প্রভৃতি,  
 অতি পূজ্য সর্ব স্থলে                      যাহাদের না পূজিলে  
 পূজা নাহি লন ভগবতী ।  
 পুরের চৌদিক ঘেরি'                      কল্প-বৃক্ষ সারি সারি  
 অমান্য সামান্য তরু-মত,  
 যে স্থানে করেন দান                      ভগবতী, ভগবান্,  
 চতুর্দর্শ-ফল অবিরত ।  
 যে স্থানের অণুমাাত্র                      ছায়া বারাণসী-ক্ষেত্র  
 যা হ'তে পবিত্র স্থান নাই,  
 যে বারাণসী নগরে                      বাসেতে বাসনা করে  
 সুর-নর-কিন্মর সবাই ।  
 এ হেন কৈলাস পুরী                      তাহে বাস পরিহারি'  
 কৃষ্ণবাস সহ বাস ত্যজে'  
 নাশিতে জননী-ক্লেশ                      যাইতে জনক-দেশ  
 ব্রহ্মময়ী সাজিলেন নিজে ।  
 আশুতোষে সন্তোষিয়ে                      শিবের অনুজ্ঞা ল'য়ে  
 শুভ-যাত্রা করে শিব-জায়া,

জয়া ও নন্দীরে যেতে      নন্দনেও সঙ্গে ল'তে  
আদেশ করেন মহামায়া ।

\* \* \* \* \*

পিত্রালায়ে যাইবার জন্ত সতীর বেশ-বিন্যাস এইরূপ ।

\* \* \* \* \*

সাজায় সঙ্গিনী আসি      ত্রিলোকেশী-কেশরাশি  
মল্লিকা, বকুলে, টাঁপা ফুলে,  
যতনে কোন' যোগিনী      বিনায় ভবানী-বেণী  
হেরে' লজ্জা ধরে ফণিকুলে ।  
সাঁ'থাতে সিন্দূর ধরে      স্মিতমুখী সমাদরে,  
মণি-মুক্তা-স্বর্ণ-অলঙ্কারে——

মায়ের সজ্জিত গাত্র      কজ্জলে উজ্জ্বল নেত্র  
বিল্বপত্র ধরে শিরোপরে ।

নলক নাসাগ্র 'পরে      ত্রিলোক-জননী পরে,  
তিলক পরিল নাসা-মূলে ;  
ত্রিপুরসুন্দরী-পা'য়      চূপুর কেহ পরায়  
শুভযাত্রা-কালে কুতূহলে ।

যিনি মৃত্যুঞ্জয়-জামা      স্বয়ং যিনি যোগমায়া  
দয়া হেতু সর্বজীবোপরে

তিনি লোক-শিক্ষা জন্ম      সধবা-সৌভাগ্য-চিহ্ন  
ধরিলেন নৌহ বামকরে ।

রক্তপদ্ম-মাল্য গলে      অলক্ত পদযুগলে  
রক্তাঘর পরি' শুভঙ্করী,  
হরিষে হরিবাহন      পৃষ্ঠোপরি আরোহণ  
করে, করি-মুখে ক্রোড়ে করি' ।



মনী একে পাগল, তাহাতে আবার ভাঙ্ খায় । তাহার গমন  
বর্ণনা ভায়রত্ন মহাশয় এইরূপে করিয়াছিলেন ।



অচলনন্দিনী-সঙ্গে      যায় নন্দী রঙ্গে ভঙ্গে  
আনন্দ-তরঙ্গে মগ্ন হ'য়ে ;  
খেয়ে ভাঙ্ আঁখি ভঙ্গি,      বাক্ ভঙ্গি, গতি ভঙ্গি  
করে', চলে ত্রিশূল ধরিয়ে ॥  
পার্বতীর প্রিয়-ভৃত্য      কখন' বা করে নৃত্য  
কখনো বা দক্ষি লক্ষ্য দেয়,  
কছু ধারে ধীরে গতি      কখনো বা পার্বতী(র)  
পদ ধরি' প্রগতি জানায় ॥

নন্দীর সৌভাগ্য চিন্তা করতঃ তক্ত-কবির মনে হইয়াছিল,  
 কাল কি ইহার তুল্যকক্ষ,  
 কাল কে কি কেউ করে লক্ষ্য,  
 কাল-বারিণী আছেন যার পক্ষে,  
 নন্দীর অগণ্য পুণ্য  
 নন্দন-সমান গণ্য  
 চির দিন দীনতারা-সমক্ষে ।

\* \* \* \* \*  
 পথে যাইতে যাইতে নন্দী, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বড় আকুল হইয়া উঠিল ।  
 কবি বর্ণনা করিলেন ।

\* \* \* \* \*  
 হেন কালে নন্দী এসে আনন্দময়ীর পাশে  
 নিরানন্দে কহে মৃদুভাবে,  
 “মরি মা, তৃষ্ণায় মরি, ক্ষুধাতুর ও শঙ্করি,  
 কৃপা করি তৃপ্ত কর দাসে ।”

\* \* \* \* \*  
 ভগবতী তক্তাধীনা । তিনি তখন কি করিলেন ?

\* \* \* \* \*  
 পূরাতে নন্দীর ইচ্ছা, পরিহরি’ সিংহ-পৃষ্ঠ  
 ভূমিষ্ঠ হ’লেন শুভঙ্করী,  
 হ’লে যাঁর অভিপ্রায় হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,  
 মৃত্যুঞ্জয় যাঁর আজ্ঞাকারী ।

সেই ভগবতীর অভিপ্রায় হইরাছে, আর অতাব কিসের ?

সুভক্ষ্য ফলের বৃক্ষ,                      তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ

লক্ষিত হইল ইচ্ছা-মতে,

তারার আদেশ পেয়ে                      অতি দুরাশ্রিত হ'য়ে

জাল্লবী এলেন জল দিতে ।

ত্রিলোক ভোজন তরে,                      মা বলে' যদি কাতরে

ডাকে মাকে দুর্গমে পড়িয়ে,

দুর্গতি নাশিতে তার                      তথনি জগন্মাতার

অধিষ্ঠান হয় তদালায়ে ।

নন্দী তো নিজের ভৃত্য                      হয়েছে অতি ক্ষুধার্ত

শুনে তার কাতরতা-বাণী

আর কি মার সহ্য হয়                      লেহ-ভোজ্য সমুদয়

সে স্থানেই প্রস্তুত তথনি ।

হস্ত অক্ষরের ভায় যে অক্ষরের উচ্চারণ, পাঁচালীর রচনার সকল সময়ে সে অক্ষরকে, পৃথক্ অক্ষর ধরা হয় না । এ কারণ অতীত রচনার সহিত তুলনায় এই সকল রচনার কোথায়ও কোথায়ও এক আধটি অক্ষরের নুনাধিক্য পরিদৃষ্ট হইতে পারে ।

কয়েকটা গানের নমুনাও নিম্নে প্রদর্শিত হইল । প্রথমটা উমার প্রতি জননী বেনকার উক্তি । দ্বাদশখি রায় কৃত 'গোপিকা'র বহুহরণ' পালার "ছি ছি লাজে মরে' বাই, প্রেম করলি কার সনে । কি বোধ আছে, অবোধ নন্দের গোপাল, বনে চরায় গোপাল, সে কি শিরীতি জানে ।" এই অসিদ্ধ গানের সুরে গানটি গাহিতে হয় ।

ঝিঝিট—একতালা ।

( আমার ) শুনে প্রাণ জলে, জল আঁধি-যুগলে ।  
 ত্যজি' মণিময় হার,  
 নর-শিরোহার নাকি পর' মা গলে ॥  
 সবার মুখে আবার একি শুন্তে পাই,  
 শবালয় ভিন্ন বাসস্থান শিখের নাই,  
 মাথে ছাই ;

( আবার ) পাগল পাগলিনী, ভব আর ভবানী,  
 সত্য বল কেন বলে সকলে ॥  
 শুনি ত্রিশূলপাণির পরণে বাস নাই,  
 ভূতসনে বৃষাসনে বাসে বাসনাই—  
 শুন্তে পাই ;

( তাই ) ভাবি মা তোমার, তবে কবে আর,  
 শিব হ'তে শুভ হবে কপালে ॥

নিম্ন-লিখিত গানটি শিব-নিন্দায় উমার উক্তি ।

স্বর বিভাস—তাল ঠেকা ।

শুন গো মা, কি মহিমা, ধরেন তোমার ত্রিশূল-পাণি,  
 অহিতে বেষ্টিত অঙ্গ, অহিত কভু দেখিনি ॥  
 নাহি মা অহিত হিত, সম গরল অমৃত,  
 অশেষ গৌরবাসিত, পদাশ্রিত ঋষি-মুনি ॥  
 আগুণ কপালে জলে, অগুণ নাই কোন' কালে,  
 ত্রিশূল তাঁর বশীভূত, গুণ্যভীত তিনি ;

তুত মাত্র নয় আশ্রিত, বশীভূত সর্বভূত,  
অভূত চরিত মাতঃ, হরিত-বাত-অশনি ॥  
কত গুণ ধরেন ত্রিনেত্র, নাহি দেখেন পাত্রাপাত্র,  
পেলে বিশ্বপত্র মাত্র, সন্তোষ অমনি ;  
অমর কিম্বদন্তে, যে ফল বাসনা করে  
জানায় মা সে যোগিবরে, সেই ফল ফলে তখনি ॥

নিম্নে একটি শ্রীমা-বিষয়ক গান প্রদত্ত হইল। দাঁণরথি কৃত  
“রামচন্দ্রের দেশে আগমন” নামক পালার “কা’র প্রাণ-নাশন,  
কর’বি রে ভাই শোন, মিতার আমার কোন’ অপরাধ নাই” এই  
গানের সুরে নিম্ন-লিখিত গানটি গাহিতে হয় ।

ললিত ঝিকিট— একতালা ।

বিচারিয়ে মন, লও রে শরণ,  
কল্যাণ-কারিণী কালী-চরণে ।  
বুধা গেল কাল, কালী কালী বল,  
কালের বন্ধন নইলে কাট’বি কেমনে ॥  
অন্ত সুরের কৃপা শুদ্ধাচারী পান,  
সুরাপান শুদ্ধাচার দুই সমান,  
বাৎসকরতরু কালী-সন্নিধান  
ভেদ নাই রে ;  
কৃপাদানে কৃপণতা নাই কোন’ জনে ॥  
গুচি-স্থানে অন্তের পূজার অধিকার,  
শোচা শোচ কালী-পূজার নাই বিচার,



যথায় টিচ্ছা হয়, পূজলে কালিকায়

কৃপা পায় রে ;

বসে' বিষতরু-মূলে কিম্বা শ্মশানে ॥

ভ্রায়রত্ন মহাশয় যেরূপ হৃদয়বান্ ভাবুক, ভট্টশরীর উর্কর ভূমিতে তাঁহার সেইরূপ সরলর সঙ্গি সমূহেরও অভাব হয় নাই। এই সকল রচনা লইয়া সেই সুরসিক বন্ধুগণের ভিতর অনধার-দিনে আনন্দের সান্না থাকিত না।

ভ্রায়রত্ন মহাশয় একজন প্রকৃত কবিস্বামোদী। ব্যাস-বাস্মিকির বিভূ-বর্ণনা হইতে ভারতচন্দ্রের বিভাসুন্দরের প্রণয়-সম্মিলন পর্যন্ত, যেখানেই তিনি কবিতা-সুন্দরীর সুকুমার অঙ্গ-সৌষ্ঠব দর্শন করিয়াছেন, সেইখানেই তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। গুণবানের গুণের অবমাননা তিনি কখনই করেন নাই। দাশরথির তিনকড়ি রায়ের ভ্রায়, গোপাল উড়ের ভুলোও, নিজ কণ্ঠের পরিচয় দিয়া, তাঁহার নিকট সর্বদা সমাদর পাইরাছে। তিনি সঙ্গীত ও কবিত্বের এতই উৎসাহদাতা যে, যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পাঁচালীকার, যত প্রধান প্রধান যাত্রাকর, দেশে সকলেই তাঁহার একান্ত অমুগত ছিলেন। ভ্রায়রত্ন মহাশয় শুনিতে ইচ্ছা করিলে বিনা পারিশ্রমিকে আসিয়া সকলেই গাহিয়া যাইতেন। এইরূপে উত্তম উত্তম পাঁচালী, যাত্রা প্রভৃতি লইয়া ভাটপাড়ায় তিনি সর্বদাই আনন্দ করিতেন। এই সকল আনন্দ উপভোগের সময় প্রাচীনাবস্থাতেও বালাকালের সেই সুরসিক সঙ্গীগুলি পার্শ্বে না থাকিলে, ভ্রায়রত্ন মহাশয় আন্তরিক কষ্ট অনুভব করিতেন। তিনি বাহাদিগকে ভালবাসেন, সকল কার্যেই তাঁহাদিগকে চাই। তাঁহার ভালবাসা এমনই নিঃস্বার্থ।

শ্রায়রত্ন মহাশয়ের জ্ঞাতি-প্রিয়তাও অসাধারণ। তিনি ভট্টপল্লীতে বিপুল জ্ঞাতিমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া পূজনীয় ব্যক্তিগণের চিরকাল অনুগত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। গুরুতর সম্পর্কীয়গণের নিকট চাপলাপ্রকাশ জন্মাবধি করেন নাই। পূজা-ব্যক্তিগণ কোনও আজ্ঞা করিলে, চিরকাল কৃতার্থ হইয়া তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূজাহরণকে প্রণাম করিবার জন্ত প্রতি বৎসর বিজয়া-দশমী দিনে তাঁহাদের গৃহে গৃহে একান্ত ভক্তি সহকারে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারাও শ্রায়রত্ন মহাশয়কে চিরদিন অকপট-চিত্তে আশীর্বাদ করিতেন। তবে, দোষই হোক অথবা গুণই হোক, একটা বিষয়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের লঘু গুরু জ্ঞান থাকিত না। তিনি একান্ত পিতৃ ভক্ত। কেহ বিদেব বশতঃ সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের কোনও নিন্দা করিলে, তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীতে সমসম্পর্কীয়গণকে স্নমধুর ভ্রাতৃ-সম্বোধনে সর্বদা সম্বোধিত করিতেন। তাঁহাদের সহিত একত্র অবস্থান কালে আনন্দের সীমা থাকিত না। গ্রামের কোনও শিব-মন্দিরে পূর্বে বহুতর জ্ঞাতি অপরাহ্ন কালে সমবেত হইতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ও নিয়মিত রূপে প্রভাহ সন্ধ্যার পূর্বে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া অশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। এই সকল আত্মজনের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, তিনি তাঁহার পার্শ্বে গিয়া পীড়াদির উপশম করে বন্ধুবাচক সহ সংপরামর্শ করিতেন। কোনও রূপ বিবাদ-বিসম্বাদে বাহাতে আত্ম-বিরোধ না হয়, সে কারণ অনেক সময় মধ্যস্থতার দ্বারা তাহা নিবারণ করিতেন। বালকগণের মধ্যে কেহ চাপলা বশতঃ কোনও অকার্য্য করিয়া ফেলিলে, রাজঘাটে বাহাতে বংশের কলঙ্ক প্রকাশ না পায়, তদ্বিবরে

চেঁটা করিতেন। এইরূপ যথাসাধ্য হিতকাৰ্য্য করা ব্যতীত, ন্যায়রত্ন মহাশয় জীবনে একদিনও কাহারও অমিষ্ট-চেঁটা করেন নাই। কাহারও অনিষ্ট-চিন্তা, মনেও কখন' স্থান দেন নাই। বহুসংখ্যক জ্ঞাতিমণ্ডলীর মধ্যে, কাহারও সহিত ঘটনাচক্রে ক্ষণিক বিরোধ মাত্র যদি দৈবাৎ সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা ধৰ্ম্মব্যৱস্থার মধ্যে নহে। কারণ, কোন' ঘটনায়ই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপর কাহারও কিছুমাত্র অসুস্থরূপের ক্রটি হয় নাই। জ্ঞাতি-মণ্ডলীর নিকটেও এইরূপ আদর-লাভ জীবনের একটা অল্প আনন্দের সামগ্রী নহে।





## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।



কাশীবাসের প্ররোচনা । হাতুয়া-মহারাজের  
বৃত্তি । ভট্টপল্লীত্যাগ । বঙ্গভূমির নিকট  
বিদায়-প্রার্থনা । পণ্ডিতগণের  
নিকট ক্ষমাভিক্ষা ।

এই সকল আনন্দে প্রাচীনাবস্থায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চিত্ত আর  
আবদ্ধ রহিল না । বিশ্বনাথের আরতির বেদধ্বনির সহিত প্রাচীন  
কালে সকল আনন্দকে তিনি বিলীন করিবেন, দিগন্তব্যাপিনী সহস্র-  
মুখী নদীর স্রোত' মহাসাগরে মিলাইবেন, বহুদিন হইতেই তাঁহার  
চিত্তে এই বাসনা ছিল । এক্ষণে ক্রমশঃ সেই প্রাচীনাবস্থা উপস্থিত  
হইতে লাগিল । কঠিন মহাকালও এই সময় তাঁহার চোখের  
সম্মুখে পার্থিব আনন্দের নশ্বরতা দেখাইয়া অভিনয় আরম্ভ করিলেন ।  
তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতাগুলি, সকলেই একে একে কালগ্রাসে  
পতিত হইলেন । প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যেও কোরগরে মহামহো-  
পাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন । আর  
সকলেই গতাস্থ হইলেন । কুড়ুকুদিহির ৬ রামধন তর্কপঞ্চানন,  
বিষপুষ্করিণীর ৬ প্রসন্ন ন্যায়রত্ন, নবদীপের ৬ ভুবন মোহন বিদ্যা-  
রত্ন প্রভৃতি পরম প্রীতিভাজন বয়স্য অধ্যাপকগণ একে একে

লোকান্তরিত হওয়ার, সভার আমোদ তিরোহিত হইল। এই সময় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চিত্ত অত্যন্ত উদাস ভাব ধারণ করে। একদা জয়পুরের মহারাজের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন কালে, শ্রীশ্রী-কাশীধামে নামিয়া বিশ্বনাথের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলেন, “বাবা কতদিনে তোমার নিকট আশ্রয় দিবে ? পিতামাতার ক্রোড়ে বালাকালে যাহাদের সহিত লালিত হইয়াছিলাম, প্রাণসম সেই সকল কনিষ্ঠ ভ্রাতারা লোকান্তরিত হইল। বিদ্যাচর্চা করিয়া যশোলিপ্সার কোমর-অবস্থা হইতে, এই প্রাচীনাবস্থা পর্য্যন্ত শাহারা প্রতিসভায় সর্ববিষয়ে সঙ্গী ছিলেন, সেই সকল পণ্ডিতেরা একে একে কাল-কবলে পতিত হইতে লাগিলেন। বাবা আর কি লইয়া আমি বঙ্গদেশে থাকিব ?”

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রার্থনা বিশ্বনাথের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি ভাটপাড়ায় উপস্থিত হইতে না হইতে, হিন্দু-চুড়ামণি বিদ্যোৎসাহী হাতুয়ার মহারাজ ৬কৃষ্ণপ্রতাপ সাহী আহ্বান করিবার জন্ত উপযুপরি তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলেন। জায়রত্ন মহাশয় তৎসম্মিধানে উপস্থিত হইলে, নানা সম্ভাষণের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার কি কাশীবাস করিতে ইচ্ছা হয় ? জায়রত্ন মহাশয় উত্তর করিলেন “আমার কাশীবাস করিতে একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না।”

রাজা। ঘটবার পক্ষে প্রতিবন্ধক কি ?

জায়রত্ন মহাশয়। মহারাজ ! প্রাচীনাবস্থায় কাশীবাস করিয়া যদি উদরারোগের জন্ত কাশীতে প্রতিগ্রহ করিতে হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা।

রাজা। জায়রত্ন মহাশয় ! পূর্বকৃত কোনরূপ বন্দোবস্তের দ্বারা আপনি তপায় প্রতিগ্রহ অনায়াসেই তো নিবারণ করিতে পারেন।

শ্রায়রত্ন মহাশয়। মহারাজ! সেরূপ বন্দোবস্ত আমার কিছুই নাই। কারণ মহিষাদল-রাজবাটী অথবা অন্যান্য স্থানে পূর্ব-স্থিরীকৃত সেরূপ বৃত্তি যাহা আমার আছে, তাহা যৎসামান্য। তদ্বারা কাশী-বাস চলে না। শিষ্যগণ যাহা কিছু সাহায্য করেন, তাহাও গ্রহণ করিব। কিন্তু তথাপি আমার কাশীবাসের ব্যয় সঙ্কলন হইবে না।

রাজা। শিষ্য-শাখা, বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি দ্বারা আপনার বার্ষিক যে আয় আছে, তদতিরিক্ত আর কত টাকা সালিয়ানা হইলে, আপনার কাশীবাস চলিতে পারে?

শ্রায়রত্ন মহাশয়। আর ৫০ পঞ্চাশ টাকা মাত্র মাসিক সংস্থান হইলে, আমার কাশীবাস-বাসনা পূর্ণ হয়।

রাজা। শ্রায়রত্ন মহাশয়! কাশীতে যাহাতে আপনাকে প্রতিগ্রহ না করিতে হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ৬০০ ছয় শত টাকা সালিয়ানার নির্বন্ধ আমিই আপনার জন্ত করিলাম।

বিশ্বনাথের দয়া বিচিত্র। তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইবার জন্ত শ্রায়রত্ন মহাশয় অব্যবহিত পূর্বে কাশী হইতে জানাইয়া আসিয়াছিলেন। ভাটপাড়ায় উপস্থিত হইবা মাত্র, একজন ব্রাহ্মণ নরপতি, অযাচিত-ভাবে আহ্বান করিয়া, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এইরূপ বহুতর ক্ষেত্রেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উপর দেবদয়ার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত সকল দৃষ্ট হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় এই সময় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন। মহারাজের উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং আশ্রমোচনে তীব্র ইচ্ছা উভয়ই কবিতাটির অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে।

আশ্রুপ্লেঃ শমনস্য দৃষ্টিদহনেদংঘস্য দাহোদ্ভবা  
 শিখ ল্লেশহরং বদন্তি বিবুধা যং বেদ্যনাথং বিভুম্ ।  
 তদ্বিশ্বেশ্বর সন্নিধিং নযসি মাং যত্বং দয়াবত্তয়া  
 ভূজানি জনকস্তু পূৰ্ণজননে জানি ভবানিব তত্ ॥

মৰ্ম্মার্থ ।

স্নত দগ্ধ হ'লে দাহে                      পিতা ক্লেশ পেয়ে তাহে  
 ল'য়ে যান বৈদ্যের সকাশে,  
 সৃষ্টি হ'তে সূত্রঃসহ                      শমনের দৃষ্টি-দাহ  
 সহ্য করে' থাকি আমি ক্লেশে ।  
 সে ক্লেশে পতিত সবে                      বুধ জনা গাহে ভবে  
 “ক্লেশহর বৈদ্যনাথ” যারে,  
 পাঠাইয়া কাশীবাসে                      সেই বৈদ্যনাথ পাশে  
 নরনাথ ! রাখিছ আমারে ।  
 বুকে মোর ক্লেশ-কথা                      বুঝি বা তুমিও ব্যথা  
 পাইয়াছ কোমল অন্তরে,  
 হে ভূপাল মনে ধরে                      পিতা ছিলে জন্মান্তরে,  
 এত দয়া সে পূৰ্ব সংসারে ।

এইরূপে, একটী আদর্শ বিদ্যোৎসাহী ভূপতি বঙ্গদেশ হইতে  
 ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংসার উঠাইয়া বিনা প্রতিগ্রহে কাশীবাস করি-  
 বার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । যাহার কৃপায় ন্যায়রত্ন মহাশয় পবিত্র  
 বংশে জন্ম গ্রহণ করতঃ, অনন্ত বিদ্যা, অসীম প্রতিষ্ঠা ও অসামান্য  
 সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া ইহকাল অতিবাহিত করিলেন, তিনিই  
 যে আবার তাঁহার পারলৌকিক সৌভাগ্যের পূর্ণতার বিষয় চিন্তা

করিতেছেন, ইহাই এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।  
ইহারই অব্যবহিত পরে পুত্রের বিবাহ দিয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করতঃ  
ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীবাসে যাত্রা করেন।

জন্মভূমির মমতা বড়ই দুশ্ছেদ্য সামগ্রী। যেখানে ভূমিষ্ট হইয়া মাতৃ-সুত্ত পান করিতে হইয়াছে, বালা, যৌবন, প্রৌঢ় যে ভূমিতে বাপিত হইয়াছে, জ্ঞাতি-বন্ধু-পরিবেষ্টিত সেই ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’ ভূমি পরিত্যাগের সময় ত্রাসরহ্ন মহাশয়েরও চিত্র আবেগ-পূর্ণ হইয়াছিল। সেই আবেগ-মিশ্রিত বহুতর মন্থভেদি সংস্কৃত-কবিতা সেই সময় রচনা করেন। তাহার অনেকগুলি এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদায়-কালে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটির দ্বারা ত্রাসরহ্ন মহাশয় বঙ্গভূমির নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করেন।

आबाल्यं जननीव जीवयसि मामारोप्य हृत्पञ्जरं  
सच्छन्दं वशवर्त्तनीव मधुर मूलेः पयोभिः फलेः ।  
विष्मूत्रादि परिग्रहेण च कदा वाधापि जाता न ते  
क्रोडे क्रीडनमद्य वङ्गवसुधे मुञ्चाम्यनुज्ञायताम् ॥

मन्त्रार्थ ।

বালা হ'তে দাসে তুমি                      পালিতেছ বঙ্গভূমি  
 স্নেহময়ী জননীর প্রায়,  
 হৃদয়-পিঞ্জরে রাখ,                      সদা যেন বশে থাক,  
 তব ধ্বজ শোধা কি মা যায় ।  
 দিয়াছ মা অনিবার                      ফল-মূল-পয়োদার  
 হ'লে আমি ক্ষুধায় কাতর,



মাগো ওই কোলে কত মল-মূত্র অবিরত

চালিয়াছি, বাধা নাই তোরা ।

আজি হ'তে তোরা ছেলে স্নেহময়ি, তোরা কোলে

ধুলা-খেলা করে সমাপন,

সন্তানেরে ওমা তুমি আজ্ঞা দাও বঙ্গভূমি

কাশীবাসে চলেছি এখন ॥

শাস্ত্রীয় কথা লইয়া সভা-ক্ষেত্রে অনেক সময়ে পণ্ডিতগণের সহিত  
ভাষ্যরত্ন মহাশয়কে তর্ক-বিতর্ক করিতে হইয়াছে। কোনরূপ অপরাধ  
পাইয়া তাঁহাদের মধ্যে কাহারও অসন্তুষ্ট থাকা বিচিত্র নহে। স্বদেশ  
পরিভ্রমণ কালে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়া, তিনি কাতর-  
ভাবে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গাবাসমপাশ্ব বাসজ্ঞাতয়ে যাस्याমি কাশ্যামহং

মহীষাদিহ কেপি সন্তি বিদুষাং মধ্যে চ মদুদ্বেষিণঃ ।

অদ্বেষিণ ভজন্তু তোষমধুনা সাধুশ্চিমাং প্রার্থনাং

কুর্ষ্যেহং বিহিতাশ্চলিঃ সবিনয়ং রাখাল দাসঃ স্বয়ম্ ॥

মর্ম্মার্থ ।

কাশীবাস করিবারে দীন-হীন যাত্রা করে,

উঠিবে গো বঙ্গের বসতি,

যদি এই বঙ্গস্থলে, থাকেন পণ্ডিতকূলে,

মোর দোষে কেহ রুষ্টমতি,

আজি সব সাধুকূলে সমুদয় ঘেঁষ ভুলে

তুষ্ট হোন অধীনের প্রতি,

গল-লম্বী কৃত-বাস করিছে রাখাল দাস

করযোড়ে সবারে মিনতি ॥

এহলে একটা কথা বলিয়া রাখি। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংস্কৃত কবিতাগুলির অনুবাদ প্রকাশ না করিয়া আমরা মন্যার্থ প্রকাশ করিতেছি। তাহার হেতু এই যে, এক ভাষার রস ভাষান্তরে প্রকাশ করা অতি দুঃস্থ। তত্বপরি মাত্র প্রতিশব্দ ব্যবহার করতঃ অনুবাদ করিয়া গেলে বঙ্গভাষার পাঠকেরা মূল কবিতার রস কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না। হেতুগর্ভ একটা ক্ষুদ্র বিশেষণে সংস্কৃত ভাষায় যে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে, ক্রিয়াকর্তৃকর্ম্ম-সম্বন্ধিত হেতুগর্ভ বাক্য রচনা না করিলে বঙ্গভাষায় অনেক স্থলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বহু বিশেষণের শ্রেণী, বহু সমাসের শ্রেণী সংস্কৃত ভাষায় যে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করে, সমাস ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, বিশেষণ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অন্য প্রকারে ভাব প্রকাশ না করিলে বঙ্গ ভাষায় সে সৌন্দর্য্য অনেক স্থলে প্রকাশিত হইতে পারে না। যে আভাস, যে আশয়, সংস্কৃত কবিতায় খুলিয়া দিবার নিয়ম নাই, বঙ্গ ভাষায় অনেক স্থলে সেগুলি খুলিয়া দেওয়াই রসোদ্দীপক। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কবিতা সমূহ পাঠকের চিত্তে যে ভাবোদ্বেক করিয়া থাকে, তাহাই বঙ্গভাষায় পাঠকগণকে বুঝান আমাদের উদ্দেশ্য। শব্দাস্তর ব্যবহার করতঃ যথাবধ অনুবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।





## সপ্তম পরিচ্ছেদ।



কাশীবাস। প্রিয়বস্তুর পরিত্যাগকালে আত্মসম্মতি।

দেব দেবীর তব রচনা। মোক্ষ কামনা।

গঙ্গাভক্তি। কাশীভক্তি। শাস্ত্রানুরাগ।

পরিচ্ছদ। আকৃতি।

এইরূপে ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যাস্ত বঙ্গদেশে অবস্থান করিয়া  
সন ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে ত্রায়রত্ন মহাশয় কাশীবাসার্থ  
যাত্রা করেন।

ত্রায়রত্ন মহাশয় যে অবস্থায় কাশীবাস করিলেন, সে অবস্থায়  
সকল লোকে সহজে কাশীবাস করিতে পারে না। তিনি বঙ্গ-  
দেশে একপত্নী। দেশ-দেশান্তর হইতে পরম শ্রদ্ধা সহকারে  
আহ্বান করিয়া, সকল অধ্যাপকের অগ্রে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজার দ্বারা  
দেশবাসীরা তাঁহার অর্চনা করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী  
অধ্যাপক একজনও জীবিত ছিলেন না। সর্বসাধারণেরই তাঁহার  
উপর একান্ত ভক্তি। যেখানে দেশবাসীর ধর্ম-সংশয় নিরাকৃত  
হইল না, সেইখানেই নায়রত্ন মহাশয়; যে কোনও শাস্ত্রের  
যে কোনও বিচারে মধ্যস্থ নায়রত্ন মহাশয়; শাস্ত্রীয় ব্যাপারে  
কুতর্ক ও কুকল লইয়া কোনও অধ্যাপক স্বেচ্ছাচারিতা করিলে

শাস্ত্রবিদগণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট পরিচয় দিতেছেন ; কেহ অথবা শাস্ত্রীয় তর্ক করিয়া সভায় দাঙ্কিতা করিলে, ন্যায়রত্ন মহাশয় চোখ রাঙাইতেছেন ; ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আধিপত্যে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ । এই সকল সমুদয় উপেক্ষা করিয়া সকল অধ্যাপকে কাশীবাস করেন না। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য প্রলোভনের সামগ্রীও ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর যে বংশের শোভাস্বরূপ, সেই বংশের গুরুতা দেশ-প্রসিদ্ধ। নানাস্থান হইতে পবিত্র ব্রাহ্মণগণ দীক্ষা-ভিলাষী হইয়া ব্যাকুলান্তরে এই বংশ হইতে সুযোগ্য গুরুর আশ্রয় করিয়া থাকেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সময় কাশীবাস করেন, তিনি এই বংশে সর্বাধিক খ্যাতিমান পুরুষ, এবং তাঁহার উপর নানা দেশস্থ লোকের একান্ত ভক্তি। তিনি এই সময় ভট্টপল্লীতে থাকিলে তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা আরও বহুতর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ছিল। তদ্বারা তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদির বিশেষ উপকার হইতে পারিত। কিন্তু মুমুকু ব্যক্তি স্বীয় মোচনোপায় উদ্ভাবনকেই চরম-পুরুষকার জ্ঞান করিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনে, আমরা তিনটি বিষয় দেখিতে পাই। কবি-জীবনে স্থূললিত-কবিতাচ্ছলে নানাবিধ উপদেশ-প্রকাশ ; অধ্যাপক-জীবনে, বঙ্গীয়-বিদ্বৎসমাজে প্রবল আধিপত্য ; ঋষি-জীবনে সকল আধিপত্যে উপেক্ষা ; ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বদেশ-ত্যাগকালীন রচিত কবিতা সকল অমুসন্ধান করিলে জানা যায়, দেশে তাঁহার যে সকল প্রিয়-সামগ্রী ও মমতার বস্তু আছে, জন্মভূমি ত্যাগের সময় সকলগুলি চিত্তে যুগপৎ উদিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহ-পরকালের বন্ধুর আশ্রয় লইতে চলিয়াছেন, কি ঐহিক, কি পারত্রিক সকল অবস্থার স্তব্ধচিত্তা তিনিই করিবেন, এই বিবেক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সকল মাহা-ডোর

বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল । ঐ সময়ের রচিত দুই একটি কবিতা  
নিম্নে প্রদর্শিত হইল ।

বদ্ধস্থলস্থৈঃ সমমৈহিকানি  
বন্ধুত্ব-পাশৈঃ সখ-বন্ধনানি ।  
ছিত্বাণ্ড বিশ্বেশ্বরমাশ্রয়ে ত্বাং  
যস্মাত্ত্বমেবান্ন পরত্র বন্ধুঃ ॥

মর্ম্মার্থ ।

বদ্ধ-বন্ধনে আছি বঙ্গবাসী সনে  
আশৈশব বন্ধ আমি ঐহিক-জীবনে ।  
ছিন্ন করি' বিশ্বনাথ সে সখ-বন্ধন,  
সকল মমতা মায়া দিয়া বিসর্জন,  
তোমার আশ্রয়ে এই দীন-শীন চলে,  
যেহেতু তুমি হে বন্ধু ইহ পরকালে ।

তৃণায় মত্বা বহুবদ্ধকৌন্তিঁ  
বিদ্যার্জিতাং বিন্ধচয়াখ্যবৃত্তিঁ ॥  
বিসৃজ্য বিশ্বেশ্বর মাশ্রয়ে ত্বাং  
যস্মাত্ত্বমেবান্ন পরত্র বন্ধুঃ ॥

মর্ম্মার্থ ।

চলিতেছি বিশ্বনাথ তব সন্নিধান  
বন্ধের বিপুল কৌন্তি করি' তৃণ-জ্ঞান,  
সযতনে বিদ্যা-চর্চা করেছি শৈশবে,  
বিনা ক্লেশে অর্থাগম হয় কত ভাবে,

ওহে বিশ্বনাথ আজি সব পরিহরি'  
সকল মমতা-মায়া চিরতরে ছাড়ি'  
তোমার আশ্রয়ে এই দীন-হীন চলে  
যেহেতু তুমি হে বন্ধু ইহ-পরকালে ॥

সপিण्ड-वर्गे च विहाय मायां  
सुतात्मजादौ च निजात्मजायाम् ।  
चिराय विश्वेश्वरमाश्रये त्वां  
यस्मात्त्वमेवान्न परत्र बन्धुः ॥

মর্ম্মার্থ ।

চারিধারে স্নেহশীল জাতি-পরিজন,  
কন্যা দোহিত্রাদি কত মমতার ধন,  
ওহে বিশ্বনাথ, আজি সব পরিহরি'  
সকল মমতা মায়া চিরতরে ছাড়ি'  
তোমার আশ্রয়ে এই দীন-হীন চলে  
যেহেতু তুমি হে বন্ধু ইহ-পরকালে ॥

प्रायो धनायन्तु विना प्रयासं  
प्रशस्तवासे च नवे निवासम् ।  
उपेक्ष्य मोक्षप्रद माश्रये त्वां  
यस्मात्त्व मेवान्न परत्र बन्धुः ॥

মর্ম্মার্থ ।

স্বজন-পোষণ তরে যত অর্থ চাই  
বিদ্যা এনে দেয় তাহা কোন' চেষ্টা নাই ।  
অতি যত্নে করিয়াছি নবীন ভবন,  
কি আনন্দে বাস তাহে করি অনুক্ষণ ।

ওহে বিশ্বনাথ! আজি সমুদয় ছেড়ে  
তোমার আশ্রয়ে চলি, স্মরিয়া তোমারে ।  
তুমি নাথ মোক্ষদাতা জীবনান্ত হ'লে,  
জীবের তুমি হে বন্ধু ইহ-পরকালে ॥

ভায়রত্ন মহাশয় আপন শিষ্যগণকে একান্ত ভালবাসিয়া থাকেন ।  
কাশীধাম গমনকালে তাঁহাদের স্মৃতিও ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ব্যথিত  
করিয়াছিল, ইহা নিম্নলিখিত কবিতা দৃষ্টে অনুভব করা যায় ।

সুতীপমং মামক-শিষ্য-জাতং  
সদাস্তজন্মোন্মেরমোম্ময়াতম্ ।  
বিমোক্ষ্য তস্মাচ্চদমাশ্রয়ে ত্বাং  
যস্মাস্ত্বমেবাত পরত বন্ধুঃ ॥

মর্মার্থ ।

বঙ্গদেশে শিষ্যগণ র'ল পড়ে' হায়,  
স্নেহ করিয়াছি কত সন্তানের প্রায় ।  
আমারে সকলে তা'রা দেবতা ভাবিত,  
মঠো দেবভোগ্য স্থখে নররের রাখিত ।  
চলিলাম আজি আমি এ সকলি কেলে,  
মোক্ষপ্রদ তব পাশে মোক্ষ ল'ব ব'লে ।  
ঐহিকের তরে হ'ব কেন স্নিয়মাণ,  
ইহ পরকালে বন্ধু তুমি বিদ্যমান ॥

ভায়রত্ন মহাশয় কাশীবাস করিয়া দেবদ্বান দর্শন করতঃ চুষ্টি-  
গণেশ, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর নানাবিধ স্তব রচনা

করিতে লাগিলেন । সেই সকল স্তব রচনা কালে সৰ্ব্ব প্রথমে  
লিখিলেন,

স্থিতা অর্থ্যালাপৈঃ পরম-রসহীনৈব রসনা  
যদা শক্তি জাঁতা বচন-রচনায়াং তদবধি ।  
পিতঃ শম্বো মাতর্নগপতিসুতী ভী গণপতী  
কুরুধ্ব' মত্পদ্যৈঃ স্তুতিনতিপরেস্তাং রসযুতাম্ ॥

মর্থ্যার্থ ।

যে দিন জননি' হেথা                      শৈশবে ফুটিল কথা  
তদবধি এ সুদীর্ঘকাল,  
নিত্য ব্যর্থ-আলপনে                      সার-শূন্য সম্ভাষণে  
নিয়োজিত ছিল বাক্য-জাল ।  
নিদারুণ মোহবশে                      মজেনি পরম-রসে  
এক দিন(ও) রসনা আমার,  
হে গিরিশ ! গিরিসুতে !              হে কপালো গণপতে !  
রাখ ভিক্ষা আজি একবার,  
স্তুতি-নতি-গুণ-গানে                      পারি বাহে এত দিনে  
রসনায়ে করিতে সরস,  
সেই শক্তি বিতরণ                      ভগবতি ! ভগবন্ !  
কর' দাসে হ'য়ে কৃপাবশ ॥

কাশীবাস করিয়া নায়রত্ন মহাশয় যে সকল স্তব-কবিতা রচনা  
করেন, তাহার মধ্যে সৰ্ব্বত্রই নিজের ভবমোচন-কামনা পরিলক্ষিত  
হয় । বিশ্বনাথের স্তবে কোথাও লিখিয়াছেন,



ମଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ସଂସାର-ବାରାଂନିଧିମାୟୁ ତର୍ତ୍ତୁ  
ବାର୍ହସ୍ପତି-କାଳସ୍ତ୍ର ସୁଖେନ ହର୍ତ୍ତୁମ୍ ।  
ତ୍ବଦହିୟୁଷ୍ମେନ ଜଗଦ୍‌ବିଧାତ୍ରୀ  
ସମାନ୍ତରେ ମାତରମନ୍ନଦାତ୍ରିମ୍ ॥

ମର୍ମାର୍ଥ ।

ଭବ-ସିନ୍ଧୁ ତରିବାରେ                      ଆର ସ୍ତ୍ରୋତେ ହରିବାରେ  
ଅସ୍ତିତ୍ବେ ଏ ବାର୍ହସ୍ପତି-ମୟ  
ଶରଣ କରେଛି ମାର                      ତବ ପଦ-ତରୀ ଆର  
ତାରିଣୀର ଚରଣ ଅଭୟ ।

ଅଗ୍ର ସ୍ତବେଓ ଏହିରୂପେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଚାହିଁଆଛେନ,  
ସ୍ଥାନଂ ଦେହି ବିଧେହି ଦେହବିରତିଂ ଗୋ ବିଶ୍ବନାଥ ପ୍ରଗୋ ॥

ମର୍ମାର୍ଥ ।

ବିଶ୍ବନାଥ ! ସ୍ଥାନ ଦିଓ ଚରଣେ ତୋମାର,  
ନାହିଁ ହୟ ଯେନ ଦେହ ଧରିତେ ଆବାର ।

ନିଜେର ମେହି ଅଭିଳାଷ-ପୂରଣେର ଜନ୍ୟ କୋଥାୟଓ ବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର  
ସ୍ତବେ ବଳିଆଛେନ,

କୃତ୍ବା କୃପାମୟି କୃପାଂ ଜଗତାଂ ଶରଣ୍ୟେ  
ପୂର୍ଣ୍ଣଂ କୁରୁଷ୍ଠ ମମ ବୋଞ୍ଛିତମନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେ ॥

ମର୍ମାର୍ଥ ।

କୃପାମୟି ! ଦ୍ବିଜଗତେ ତୁମି ମା ଶରଣ  
ବାଞ୍ଛା ମମ କୃପା କରି' କରିଓ ପୂରଣ ।

আবার এই ভাবে কামনা করিয়া কখনও বা মনে মনে কুণ্ঠিত  
হইয়াছেন । সেকালে লিখিয়াছেন,

বাধা-বেদনমেব কৰ্ত্তুম্ভিতং মৃত্যস্য মৰ্ত্তুঃ পদে  
স্তোকস্বাপিচ কস্যচিচ্ছমফলস্যানৌচিতী প্রার্থনা ।  
লুপ্তত্বাদিক-দোষ-দূষিততয়া যত্ প্রার্থিতং ভো প্রভো  
স্মাস্মৈতৎ পরমাপরাধমধমে কৃৎবা কৃপালোকনম্ ॥

মৰ্ম্মার্থ ।

আছে বাহা ব্যথা সে হুথের কথা

প্রভুর চরণ তলে

দাসের উচিত করিতে বিদিত

শুধু নিবেদন-হলে ।

“প্রভো দাও” বলে’ মনোমত ফলে

কামনা উচিত নয়,

বাধা নিবেদিব পেতে হয় পাব

দাস র’ব তাঁরি পা’য় ।

আমি লোভ-ভরে “দাও দাও” করে’

কতগো কামনা করি,

সে ভীষণ দোষ ক্ষম’ আশুতোষ

করুণা-নয়নে হেরি’ ॥

কাশী গিয়া দেব-স্থান দর্শন করতঃ এইরূপ নানাবিধ স্তব রচনা  
করিতে লাগিলেন । ন্যায়রত্ন মহাশয় আজীবন গঙ্গাভীর-বাসী ।  
তিনি কাশীবাস করিলে পর কাহাকে কাহাকেও বলিতে শুনা  
গিয়াছিল, গঙ্গামাহাত্ম্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিশ্বাস বৃদ্ধি কম ।

ন্যায়রত্ন মহাশয় গঙ্গামাহাত্ম্যে কিরূপ বিশ্বাসী, তাহা তাঁহার জ্ঞাত নহেন। সকল দেব দেবীর দয়া অপেক্ষা গঙ্গার দয়ার আয়রত্ন মহাশয় চিরকাল অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত গঙ্গাস্তব সমূহেও সেই বিশ্বাস পূর্ণ ভাবে প্রকটিত। স্তুতি-মালায় একস্থানে পার্শ্বতীর সহিত তুলনা করিয়া গঙ্গার দয়া এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,

সগৰ্ব্বা সৰ্ব্বাণী ভব-হৃদয়বাসান্ন বসুধাং  
 যিহা নো পশ্যেৎ পতিতমিতি মাত স্তব পদে ।  
 প্রপদ্যেহং যত্নং হরশিরসি বাসেঽপি বরদে  
 জগন্নিস্তারার্থং ভূমসি বসুমত্যাং দিশি দিশি ॥

মৰ্ম্মার্থ ।

ওমা গঙ্গে বল সতি পার্শ্বতীর একি রীতি  
 নিজ গর্বে সদা গরবিণী,  
 সম্মান পতিত হয় তারে না উঠাতে চায়  
 মৃত্তিকার নামে না ভবানী ।  
 আছে সে, শিবের বুকে এত গর্বে তাই থাকে  
 ধরাতলে পড়ে না নয়ন.  
 যবে তোমা পানে চাই মহিমার সীমা নাই  
 ওমা গঙ্গে করি বিলোকন ।  
 মস্তকে রাখেন ভব গর্ব তবু নাই তব,  
 নিস্তারিতে পতিত-সম্মানে—  
 ধরণীর চারিদিক ঘুরিতেছে অনিবার  
 আশ্রিত মা এ দাস চরণে ॥

যে সুরধুনীর জলে “মৌসল-মানও” মহাপাতক নাশ করে, তাহার তুল্য তীর্থ অন্য কুজাপি সম্ভবে না, এ বিশ্বাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বদ্ধমূল। তাই ভক্ত মায়ের নিকট বলিতেছেন,

भवत्सेवां गङ्गे त्रिजगद घमङ्क ८ति सुकरां  
विमुञ्चन् यो लब्धुं फलमपरतीर्थान्धनुसरत् ।  
ध्रुवं किं नो तस्याखिल सुफलदातुः सुरतरी  
स्तूलं त्यक्त्वा सति विटपिनिचये कण्टकमये ॥

মর্মার্থ।

মান কর' ক্লান্ত হ'লে                      সুরীতল গঙ্গা-জলে  
পিপাসায় পান কর' বারি  
এ হ'তে সূতের কিবা                      বিনা ক্রেশে তোর সেবা  
হ'তে পারে হে জহু-কুমারি।  
হেন সেবা যদি নরে                      চতুর্দর্শ দিতে পারে  
অন্ত তীর্থে ক্রেশ যা'রা চায়  
তার কল্লতরু ছেড়ে                      ঘোরে না কি ফল-তরে  
কণ্টকিত তরুর তলায় ?

আয়রত্ন মহাশয় গঙ্গার একান্ত অনুরাগী। কাশীতে যে স্থানেই মৃত্যু হোক, শাস্ত্রমতে মোক্ষ-ফল অবশ্যম্ভাবী। তথাপি সেখানেও অনুরাগ-ভরে আয়রত্ন মহাশয় মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গাতীরস্থ করাইবার জন্য সকলকে উপদেশ করেন। কাশীবাসের পর তাহার কতিপয় আশ্রিত-জনের কাশী-লাভ হয়। তিনি তাঁহাদিগকে তীরস্থ করিয়াছিলেন। নিজের বিষয়েও লিখিয়াছেন,

কদাवासं कुर्व्यं जननि तव गर्भे त्रिपथगी  
 यतो गर्भे वासो न भवति पुनः शम्भु-सुभगी ।  
 यतो जीवन् भोक्ष्येऽमृतमपि मृती प्राप्यममृतं  
 मयित्वा क्षीराब्धिं न यदमरवर्गे रधिष्ठितम् ॥

মর্থ্যার্থ ।

ত্রিপথ-গামিনি গঙ্গে হ'বে বাস ভবে বন্ধে  
 তো'র গর্ভে কবে নিস্তারিণি,  
 ক'রে তো'র গর্ভে বাস ঘুচে যাবে গর্ভে বাস  
 কত দিনে শঙ্কু-সোহাগিনি ।  
 বভেক চৈতন্ত রয় সলিল অমৃতময়  
 অধরেতে দিবে বজ্রজন,  
 চৈতন্ত হইলে গত পা'ব মোক্ষ কি অমৃত,  
 ভবে আসা হ'বে বিসর্জন ।  
 অমৃত লাভের তরে অমর যতন করে'  
 ক্ষীর-সিদ্ধ করিল মহন,  
 দাসে যে অমৃত পাবে কভু মা দেবতা সবে  
 অমৃত না পেয়েছে ভেমন ।

গঙ্গাতীরবাসীদের অল্প শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে “গঙ্গাতীরং পরি-  
 ত্যজ্য যেহুতীর্থাভিলাষিণঃ । ব্রহ্মহত্যা ফলং তন্ত্ৰ সততং সংশয়াত্ম-  
 নাম্ ॥” অর্থাৎ গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া যে সকল সন্নিধ্য ব্যক্তি অহু  
 তীর্থ বাস অভিলাষ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মহত্যার ফলভাগী হন ।  
 গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিতে হয় না বলিয়াই গঙ্গাতীর-বাসীরা কানী-  
 বাস করিয়া থাকেন । জায়ন্ত মহাশয়ও সেই হেতুই কানীবাস

করিয়াছেন, মাঝের নিকট কুণ্ঠিতভাবে পুনঃপুনঃই ইহা নিবেদন  
করিয়াছেন দেখা যাক। স্তবের মধ্যে একস্থানে লিখিয়াছেন,

চিরং ধৃত্যো ভূত্বা জননি তব সেবামনুদিনং .  
সুদাকার্ষ্যে বাধ্যাবধি বিবুধসেব্যে তব যদি।  
স্থিতির্নাশীদস্থ্যামবসমিহ কাশ্যাং নহি তদা  
পরাধঃ স্তাম্যস্তস্যস্ময়ি সবিনয়ে জঙ্ঘতময়ে ॥

মর্ম্মার্থ।

জনমিত্রা এই ভবে . চিরকাল ভূতা-ভাবে  
তব সেবা করেছি জননি,  
বাধ্যাবধি সেবা করে' ছিলাম কি আনন্দ-ভরে  
ওমা গঙ্গে পতিত-পাবনি।  
কভু মা তোমার দাস করিত না কাশীবাস  
তব স্থিতি না হ'লে হেথায়  
অতএব সুরধুনি শুন মা বিনয়-বাণী  
অপরাধে ক্রমিও আমার।

ভায়রর মহাশয় মাঝের নিকট কুণ্ঠিত ভাবে নিজের কাশীবাসের  
হেতু আরো এক স্থানে এইরূপে জানাইয়াছেন,

জ্ঞাতং কাশীক্ষেত্রং ত্রিপুরারিপুণা ত্বত্প্রণয়িনা  
বিতর্জুঃ কীটায়াদ্যমৃতময়মিষ্টং মৃতবতে।  
তদস্মিন্ ই মাतः पतिञ्जततया स्वत्वमपि ते  
परप्रोतिष्ठानं तदिदमिति मत्वा समगमम् ॥

মর্থ্যার্থ ।

• আসি মা কাশীতে আমি      বেহেতু তোমারি স্বামী  
কীটেরেও নোক্ষফল দিতে  
করেছেন এই পুরী      তুমি সীমন্তিনী তাঁরি,  
স্বত্ব তব আছে মা কাশীতে ।  
হেন বারানসী পরে      ওমা গঙ্গে হ'তে পারে  
কখন' কি অপ্রীতি তোমার,  
আগে সব চিন্তা করে'      পরে কাশীবাস তরে  
নিস্তারিণি এসেছে কিস্কর ।

“অসারে থলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ঃ । কাশ্যাং বাসঃ সত্যং সঙ্গো  
গঙ্গাস্তুঃ শম্ভুসেবনং ॥” অর্থাৎ এই অসার সংসার, ইহাতে কাশীবাস,  
সংসঙ্গ, গঙ্গাজল ও শম্ভুর সেবা এই চারিটা হিন্দুধর্মাবলম্বী মহাত্মাদিগের  
সার পদার্থ । জ্ঞানরত্ন মহাশয়ের শেষ জীবনে চারিটাই সংঘটন হইয়াছে ।  
কাশীতে তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা । কাশীর মৃত্তিকাতে তিনি অনন্য-সাধারণ  
ভক্তি করিয়া থাকেন । পথ চলিয়া আসিয়া আহার কিম্বা পূজা  
করিতে হইলে, তিনি কাশীতে পদধৌত করেন না । পূজা সন্ধ্যা  
করিবার সময় মুক্তিক্ষেত্রের ভূমি জল দ্বারা ধৌত করিয়া লন না ।  
পাছে কাশীতে কোনও অপরাধ হয়, সেই ভয় তাঁহার চিন্তে সর্বদা  
জাগরুক । দেবস্থানে শিবদর্শন করিতে গেলেই বিহ্বল হইয়া চক্ষুঃ  
মুদ্রিত করতঃ পাঠ করেন,

বৈকুণ্ঠাদপি বেধসৌঃপি নগরাত্ পুতা মঘোনঃ পুরাত্  
কাশীযং তব দেবদেব বিবুধৈ র্যত্র স্থিতিঃ প্রার্থ্যতে ।  
বৈধাবৈধ মজানতোঃত্র বসতো দাসস্য দোষঃ প্রমো  
জন্তব্যঃ ক্রপয়া নিবেদনমিদং শম্বো পদাশ্বোরুহি ॥

মৰ্মার্থ ।

বিষ্ণুপুরী ব্রহ্মপুরী ইন্দ্রপুরী কিবা  
পবিত্র কাশীর মত ত্রিভুবনে কেবা !  
হেন মোক্ষভূমি পা'বে অন্যত্র কোথায়  
মুক্তি তরে কাশী তাই দেবতাও চায় ।  
তুমি গো দেবের দেব, তব এই পুরে  
তোমার এ দাস-দাস, এসে বাস করে ।  
কিবা বৈধ কি অবৈধ নাহি তার জ্ঞান,  
দাস বলে' ক্ষমা কর' করুণা-নিধান ॥

যে রূপ কাশীভক্তি সেইরূপ শিব-প্রেমের সহিত শ্রায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস আরম্ভ হইল । সেই শিব-প্রিয় ভূমিতে শিব-প্রীতি কামনা বাতীত অগ্র ধর্ম-কার্য্য তাঁহার নাই । পূণ্যতিথিতে গঙ্গাস্নান করিতে হইলে সংকল্পে শিব-প্রীতি কামনা, ছুর্গোৎসবের সংকল্পে শিব-প্রীতি কামনা, গ্রামাপূজার সংকল্পে শিবপ্রীতি কামনা, রাস রথে বিষ্ণুপূজা করিতে হইলে শিব-প্রীতি কামনা, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে পূর্বপুরুষগণের উপর শিব-প্রীতি কামনা, আবার পূণ্যকার্য্য সকল সমাপন করিয়া তাহার ফল মন্ত্রপাঠ পূর্বক শিবোদ্দেশে সমর্পণ । এইরূপ শিব-প্রীতির সহিত শিব-প্রিয় ভূমিতে বসিয়া শিব-প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য শ্রায়রত্ন মহাশয় সকল জীবকে শিব-মাহাত্ম্য বুঝাইতেছেন,

বালং অ্যাল-জলানলাদি-ভয়তস্তাতঃ শিবস্ত্রায়তি  
দুগ্ধম্বাপি শিশু-প্রসূ-স্তনয়ুগে সৃষ্টা শিবো রক্ষতি ।  
হৃন্তি অশিষ এব সর্ব্ব সময়ে ভক্তস্য সর্ব্বাপদং  
তদ্ ভোজীবশিবঃ শিবঃ শিব ইতি ধ্বনৈ ধ্বন্য পৃথ্যতাং ॥



মর্ম্মার্থ ।

ওহে জীব শিশুকালে                      যখন অবোধ ছেলে  
 নাহি চেনে অগ্নি-সর্প-জল,  
 কতই ভয়ের কথা,                      রূপালু জগৎপিতা  
 শিব তারে বাঁচান কেবল ।  
 শৈশবে পালন করে                      শিশু-মাতৃ-পরোধরে  
 হৃদ্য-ধারা রক্ষা করে শিব,  
 ভক্তের বিপদ যত                      সেই শিব অবিরত  
 নাশিছেন স্তন ওহে জীব !  
 রূপা কি কহিব তাঁর                      মূর্ত্তি তিনি করুণার  
 বিধে আর তুলা নাহি মেলে,  
 ওহে জীব উচ্চৈঃস্বরে                      শিব শিব ধ্বনি করে  
 ধরাধাম পূরাও সকলে ॥

স্মৃতিঃ শোধিতচিত্তসামিব সুরাপাণী সুরহেযিণী  
 নিস্তারায় পরাং পুরীং অরচয়তু কাশীং পুরারিঃ পুরা ।  
 তস্মান্মিন্ন পরত্রচাপি পরমং মিত্রং শরচ্ছয়ং শিবং  
 স্নাত্বা নিত্যশিবার্চনৈঃ শিব শিবধ্বানৈঃ দিলং যাদ্যতাং  
 মর্ম্মার্থ ।

কি অদ্ভুত রূপাশি,                      সুরাপাণী, সুরহেযী,  
 না গণিয়া অধার্ম্মিক জীব,  
 অতি ধার্ম্মিকের প্রায়                      মুক্তি দিতে সে সবার  
 বারাগসী রচিলেন শিব ।  
 অতএব স্তন মিত্র                      কিবা ইহ কি পরত্র  
 একমাত্র বন্ধু জেনে শিবে,

ନିତା ନିବ ଆରାଧିତ୍ରେ      ନିବ ନିବ ଉଚ୍ଚାରିତ୍ରେ  
 ଦିନ ସାମ୍ପ' ଅନିତା ଏ ଭବେ ॥

ଅର୍ଥ ବନ୍ଧୁଜନେନ କାଳହରଣଂ ଅର୍ଥସ୍ତ ବିଚାର୍ଜନଂ  
 ଅର୍ଥସ୍ତାପବନଂ ବିଚିତ୍ରଭବନଂ ସୀମନ୍ତିନୀସେବନମ୍ ।  
 ଗତାତଃ ଶିବଭକ୍ତସାଧୁସବିଧଂ ପୃତ୍ବା ତଦୀୟଂ ପଦଂ  
 ଶ୍ରୁତ୍ବା ତଦ୍ଦେନାତ୍ ସୁଧାସମଶିବାତ୍ମ୍ୟାନଂ ଦିନଂ ଯାପୟ ॥

ସମ୍ଭାର୍ଥ ।

ବୃଥାସ୍ତ ବାକ୍ସବ ମହ      କାଳ ସାମ୍ପ' ଅହରହ  
 ବାର୍ଥ ତବ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ,  
 ଭବନ କି ଉପବନେ      କିନ୍ତା ସୀମନ୍ତିନୀଗଣେ  
 ଚିନ୍ତା ମନା କର ଅକାରଣ ।  
 ଶୁନ ମିତ୍ର ଯୋର କଥା      ନିବଭକ୍ତ-ସାଧୁ ସଦା  
 ଶିଶୁ ତଥା, ଧରେ' ଡାର ମାୟ,  
 ସାଧୁସୁଖ-ବିଗଳିତ      ନିବେର ଚ୍ଚରିତାୟତ  
 ଶୁନେ ଦିନ ସାମ୍ପହ ଧରାୟ ॥

ପ୍ରୀତିଃ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ମିତ୍ର ନିକରେର୍ବିଚ୍ଚାଗମୈଃ କର୍ହିଚିତ୍  
 କ୍ଳେଶଃ କର୍ହି ଧନଶ୍ଚୟାସ୍ତ ନିଧନାଦ୍ ରୋଗାଦି ଭୋଗାତ୍ତଥା ।  
 ହ୍ୟଂ ଜାଗତିକୀ ଗତିର୍ବସୁମତୀଜାତେଷୁ ଜାଗତିଂ ତନ୍  
 ନିତ୍ୟଂ ସଞ୍ଚର ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତାୟ-ଭବେ ଜ୍ଞାନାର୍ଣବେ ମଞ୍ଜିତୁମ୍ ॥

ସମ୍ଭାର୍ଥ ।

ମଞ୍ଜୁ ମୁକ୍ତ ମିତ୍ର ନ'ରେ      ଆହି ଆନନ୍ଦିତ ହ'ରେ  
 ବିଚାରଣେ ମାହି ଧରେ ଶ୍ରୀତି,

পীড়া মৃত্যু সে সবার                      তুলে দিল হাহাকার

অকস্মাৎ হ'ল বিত্ত-ক্ষতি ।

এই আনন্দের শেষ                      এখনি দারুণ ক্লেশ

স্থির কিছু নহে এই ভবে,

জ্ঞানদাতা জেনে তাঁরে                      চিন্তা' রে চিন্ময় হরে

মগ্ন যদি হ'বে জ্ঞানার্ণবে ॥

ভগবানের অন্তর্মূর্তির বিদ্যেয় করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় শিবনাম  
করিতে বলিতেছেন না । তিনি বলিতেছেন,

ভূত ভাবিচ বর্জমানমপি যজ্ঞোত্পাদনং পালনং  
তত্ সৰ্ব্বস্য শিবেন জাত্বপি শিবাৎ বিশ্বস্য বিধ্বংসনম্ ।  
তন্মূর্তি ন্তিতয়ে বিরাজিত-শিবস্ত্যাখ্যাং বিমোক্ষপদাং  
বম্ বম্ বম্                      রাঁচরামুচ্চঃ সমুচ্চারয় ॥

মর্ম্মার্থ ।

সৃজন পালন লয়                      শিব হ'তে সবি হয়

বর্জমান ভূত ভবিষ্যতে,

ত্রিঙ্গা বিষ্ণু মহেশ্বর                      শিব (ই) সে ত্রিমূর্তিধর

এ বিশ্বাস সদা রেখে চিতে,

উকার অকার আর                      মকারে গঠিত তাঁর

মোক্ষকর রূপবিত্ত নাম

কতু বল বম্ বম্                      কখন' বলরে ওম্

পূর্ণ হোক্ নামে ধরাধাম ॥

ভক্ত মহাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি প্রার্থনীয়  
সামগ্রী । মুক্তি ভক্তির দাসীমাত্র । নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিরসে আপ্ত

থাকিতে পাইলে, তক্ত পুরুষের আত্মাত্মিক হৃৎ-নিবৃত্তি স্মৃতিরাত্ৰি বটিকা  
খাওক। জ্ঞানরত্ন মহাশয় মুক্তিতে উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াও কোন  
কোন সময় ভক্তিরাই কামনা করিয়াছেন দেখা যায়। যথা,

ন জ্ঞানং ন ধনং ন বা প্রিয়জনপ্ৰীত্যৈ দিনস্বপণং  
শোকাগ্নিঃ সততং গতং চিরমহ ক্লেশেন মজ্জীবনম্ ।  
তস্মাত্তারয় মাং পুদায় পরমাং ভক্তিং পরেশ পুৰী  
যত্নদ্ব্যভক্তিমূতে পিতঃ পশুপতে ত্রয়োঽপি নো মে পুত্র্যং ॥

মর্থ্যার্থ।

না হইল জ্ঞান-লাভ, না নভিল ধন,  
সন্তোষিতে না পারিলু প্রিয় পরিজন ।  
সদা শোক তাপ প্রাণে সহি' অনিবার,  
ক্লেশেতেই কেটে গেল জীবন আমার ।  
ও চরণে ওহে প্রভো, ওহে সারাংসার,  
ভক্তি দিয়া হৃৎ বত ঘূচাও আমার ।  
ভক্তি ভিন্ন অভিলাষ কিছু নাহি চিতে,  
মুক্তি নাহি চাই আমি পিতঃ পশুপতে ॥

প্রাচীন মহর্ষিগণের কবিতা সকল অবেষণ করিলেও, এমন সরল  
পবিত্র ভাষায় একান্ত ভক্তি প্রকাশ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না  
এরূপ ঋষিকল্প ব্যক্তির চিত্তে যে সাহস থাকা সম্ভব, জ্ঞানরত্ন  
মহাশয়ের তাহা পূর্ণ মাত্রারই আছে দেখা যায়। তিনি যত্নের  
সহিতই লিখিয়াছেন,

তচ্ছারযাম্মনুদিং শিবশঙ্করেতি  
 গৌরীশ্বরেতি ভবভীতিহরং হরেতি ।  
 অর্চ্যামি নৌমি চ ভবং পশ্যমামি নিত্যং  
 ভীতিশ্চামাস্তি যমনাক্রমনাগপীতি ॥

মর্মার্থ ।

শিবনাম প্রতিদিন করি উচ্চারণ,  
 শঙ্কর শঙ্কর করি করিয়া যতন,  
 ডাকি ভব-ভীতি-হরে  
 নিত্য হর হর করে’  
 গৌরীশ্বর নাম করি প্রত্যাহ গ্রহণ,  
 নিত্য পূজা করি শিবে,  
 স্তব করি ভক্তি ভাবে,  
 প্রত্যাহ প্রণাম করি অরিয়া চরণ,  
 কিবা ভয়, কি করিবে আমারে শমন ॥

যেখানে বিজ্ঞান আদর, দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা, সেইখানেই জ্ঞান-  
 রত্ন মহাশয় পণ্ডিতগণের চিতে চিতে উজ্জ্বল-মূর্তিতে বিজ্ঞমান । তাঁহার  
 কাশীবাসে কাশীবাসী সকল ভক্তলোক আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন ।  
 তৈলঙ্গীর, মহারাষ্ট্রীয়, মিথিলাদেশীয়, বঙ্গদেশীয় যত অধ্যাপক  
 কানীতে আছেন সকলেই একান্ত শ্রদ্ধা সহ সন্মান করিলেন । ‘বিগুহা-  
 নন্দ প্রমুখ বিদ্বান্ সাধুগণ, কাহারও নিকট পরিচয় দিতে হইলে  
 “গৌতম কণাদ কী মূর্তি” এই সকল মধুর বাক্যে পরিচয় দিয়া  
 এবং নানা রকমে আদর করিয়া ক্রমশঃ জ্ঞানরত্ন মহাশয়ের স্বদেশ-সমতা  
 লাঘব করাইতে লাগিলেন । যে শ্রদ্ধা বাঙ্গালীর হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানরত্ন

মহাশয় সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাঁহার উপর সেই শ্রদ্ধা যে বিশ্ব-জনীন ইহাই নিরবধি অমৃতব করাইবার জন্য যেন ত্রীতীর্থে বিশ্বনাথ তাঁহাকে কানীয়াস করাইলেন। কানী হইতে পণ্ডিতগণের কোন মতামত প্রকাশিত হইলে অগ্রে ভায়রত্ন মহাশয়ের নাম, কানীর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অগ্রে ভায়রত্ন মহাশয়ের স্বাক্ষর, কানীর হিন্দু-মাসী-বাঙ্গালী-সাধারণ শাস্ত্রীয় সভায় ভায়রত্ন মহাশয় সভাপতি, রাজা মহারাজগণের নিকট কোনও উৎসবোপহার প্রেরণ করিতে হইলে অগ্রে ভায়রত্ন মহাশয়ের কবিতা। কানী-সমাজ ভায়রত্ন মহাশয়ের সম্মুখে প্রিয়া গেল। তিনি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উপর লোকের শ্রদ্ধা বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ নহে। সূর্যাস্ত হইলে সূর্যের দ্যুতির হ্রাস হয় না। জগতের এক ভাগে অন্ধকার হইয়া, অন্য ভাগ আলোকিত হয় মাত্র। ছাত্রবৃন্দের বিজ্ঞা-চর্চায়, ক্রিয়াকর্মের সমারোহে, নানাস্থান হইতে গুরুদর্শনাভিলাষী শিষ্যসাথার গভীরতে, সংস্কৃত উপাধিপ্রার্থী সুশিক্ষিত যুবকগণের সদালাপে, ব্যবস্থা-জিজ্ঞাসু ভক্তসন্তানগণের সমাগমে, তাঁহার গৃহে কানীতেও নিত্যোৎসব। সেখানেও বলিষ্ঠ যুবকের সামর্থ্য অবলম্বন করিয়া রাজি দশটা এগারটা পর্যন্ত ছাত্র লইয়া ভায়রত্ন মহাশয়কে সমানে পরিশ্রম করিতে হয়। তিনি ঐ কার্যকে চিরদিনই ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বোধ করেন।

ভায়রত্ন মহাশয় অনেকগুলি পুত্রকন্তাবিরোগ ও পত্নী-বিরোগ নিবন্ধন অনেক সময় শোক পাইয়াছেন। নূতন শোক পাইলে মনুষ্যকে বিকল করে ও মানসিক তেজঃ তৎকালে হ্রাস হয়। অধ্যাপনা ও অন্যান্য কার্য সকল তখন লোকের ভাল লাগে না। কিন্তু ভায়রত্ন মহাশয়ের নিয়ম স্বতন্ত্র। তিনি যখনই শোক পাইয়াছেন, বলিয়াছেন “আমি আত্মীবন সরস্বতীর সেবা করিতেছি,

শোক-চিন্তা অপেক্ষা শাস্ত্র-চিন্তা করিবার যদি আমার অধিক ক্রমতা থাকে, তবে শোক-চিন্তা নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে।” এই বলিয়া সেই সকল সময়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে অধ্যাপনা করিয়াছেন ও সকল শোক পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন ।

রোগের যজ্ঞায় আকুল আছেন এমন সময়ে নিকটে ছাত্র দেখিতে আসিলে ত্রায়শাস্ত্রের কথা উত্থাপন করিয়া ত্রায়রত্নমহাশয় তর্ক করিয়াছেন বহু সময়ে দেখা গিয়াছে । ভট্টপন্নীতে থাকিতে যশোহর জেলাস্তর্গত ইতিনা নামক কোনও স্থানে আহূত হইয়া একটি সভা উপলক্ষে কোনও সময় ত্রায়রত্ন মহাশয় গমন করেন । কিন্তু সেখানে গিয়া এতই পীড়িত হন যে, সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই । সভায় তাঁহার এক ছাত্র উপস্থিত হন, এবং সেই ছাত্রের সহিত সভা-ক্ষেত্রে শক্তিবাদের ‘সর্ব’শক্তি বিচার-প্রকরণে পণ্ডিত-গণের এক বিচার হয় । সে সভায় বহুতর বিদ্বান্ অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন । কিন্তু শাস্ত্রার্থটির ভালরূপ মীমাংসা হইল না । ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্রটি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সভার সংবাদ প্রদান করিতে আসিয়া দেখিলেন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখ রক্তবর্ণ, সময়ে সময়ে প্রলাপ বকিতেছেন । তখন তাঁহার ১০৫৥ ডিগ্রী জ্বর । সেই অবস্থাতেও তিনি সভায় কথা, শাস্ত্রার্থের কথা, কোতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সভায় সহস্তর হয় নাই শুনিয়া সেই বিকারাবস্থায় চিন্তা করতঃ শাস্ত্রার্থের মীমাংসা করিলেন । ইতিনায় সমাগত পণ্ডিতেরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্রের নিকট ঐ উত্তরটি শ্রবণ করিয়া, সকলেই সহস্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইরূপ বিপদ, আপদ, আধি, ব্যাধি, সকল সময়েই ত্রায়রত্নমহাশয়ের শাস্ত্রচর্চায় উৎসাহ দেখা যায় ।

ভায়রত্ন মহাশয় যেরূপ গৌরবে গৌরবাধিত তাঁহার শরীরও তদনুযায়ী মহাপুরুষোচিত । পরিচ্ছদ-আড়ম্বর তাঁহার কিছুমাত্র নাই । সাদা ধূতি-চাদর ও কটকি-জুতা তাঁহার সর্বদা ব্যবহারের সামগ্রী । কখনও কখনও গরদের বস্ত্র ও গরদের উত্তরীয় বা নামাবলি ব্যবহার করিয়া থাকেন । এতদ্ব্যতীত, শীতকালে একখানি কাশ্মীরি-শাল অথবা আলোয়ান গাত্রে থাকে । কিন্তু এই গুলি এবং ব্যবহৃত যজ্ঞোপবীতটী সর্বদাই নিতান্ত পরিষ্কার চাই । তাঁহার পরিচ্ছদাড়ম্বর না থাকিলেও শরীরের মধ্যে এমনই প্রচ্ছন্ন জ্যোতিঃ ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার ক্ষুরণ আছে যে, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় তিনি যেন মহা আড়ম্বরে বসিয়া আছেন । তাঁহার চন্দন-রেখাঙ্কিত পবিত্র ভাল-দেশ দর্শন করিলে ব্রহ্মণ্যদেবের লীলা-ভূমি বলিয়া অনুমিত হয় । সুদীর্ঘ অবয়ব, প্রশান্ত মুখমণ্ডল, বিশাল বক্ষঃ ও আজামুলম্বিত ভূজ তাঁহাকে কলির মনুষ্য বলিয়া বোধ করিতে দেয় না । তাঁহার অবয়বে মহাপুরুষের উপাদান এরূপ বিরাজিত যে, বহুলোকের সহিত গমন করিলেও যে কোনও ব্যক্তির দৃষ্টি তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইবে, এবং কোনও সত্য উপবেশন করিলে তাঁহার সহিত অপরিচিত ব্যক্তিগণও নিঃসন্দেহে বলিবে “সত্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ঐ বসিয়া আছেন !” সমাগত কোনও ব্যক্তিকেই ন্যায়রত্ন মহাশয় অগ্রিম-বাক্যে অনাদর করেন না । তথাপি তাঁহার শরীরের মধ্যে এমন একটা গাভীয়া ও তেজস্বিতা বিদ্যমান যে, কপট, প্রতারণক, পাণ্ডিত্য ও নিরুদ্ধ্য ব্যক্তিগণ কল্পিত-কালে তাঁহার পার্শ্বে ছই দণ্ডকাল উপবেশন করিতে সাহস করেনা । তিনি ঘোর চিন্তাশীল হইলেও, চিন্তাশক্তি সর্বদাই তাঁহার অধীনে কার্য্য করে । এক বিষয়ের চিন্তাস্রোতে পড়িয়া, অন্য বিষয়ের নাশ তাঁহার হস্তে কল্পিত কালে হইতে পায় নাই । অতি ক্ষুদ্র কার্য্যও



তাঁহার অনামনস্কতা বা অনবধানতা নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষতঃ প্রবল নৈরায়িকগণের মধ্যে প্রত্যেক কার্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায় অকুণ্ঠ বা অবধান আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।





## অষ্টম পরিচ্ছেদ ।



অভেদ বুদ্ধিতে উপাসমা । দীক্ষার প্রয়ো-  
জনীয়তা । তত্ত্ববেশিগণের প্রতি উপদেশ ।  
তত্ত্বের মীমাংসা ও বীরাচারে  
দোষশ্রুতি ।

ভগবানের সকল মূর্তিকেই জ্ঞানরত্ন মহাশয় সমান শ্রদ্ধা করিয়া  
থাকেন । বিষ্ণু, শক্তি, শিব প্রভৃতিতে ভেদ-বুদ্ধি করিলে শাস্ত্রানুসারে  
ধর্মহানি হয় । শিবদেবী বৈষ্ণব, বিষ্ণুদেবী শাক্ত, শক্তিদেবী বৈষ্ণব  
প্রভৃতিকে জ্ঞানরত্ন মহাশয় উপদেশ দিতেছেন,

विष्णोरर्चनमाद्यरत्नपिचिरं विद्विष्य विष्णेश्वरं  
यो द्विष्टापिच दुष्टचेतनदुराचारो जगन्मातरम् ।  
यस्माद्यातयतं विधाय दहनेर्दन्धा पुनश्चन्दन  
रालेपादिकतुल्यमस्य किमुतन्नावैधमाराधनम् ॥

মর্মার্থ ।

শিবেরে বিদেব করে', দেব করে' কালিকার,  
অবিবেকী যে পামর বিষ্ণু আরাধিতে চার,

নরাদম সে মানব, অতিশয় ছুরাচার,  
 আরাধনা বৈধ নয়, শাস্ত্রমতে কতু তা'র।  
 হরি হর শক্তি কিবা, কিছুই বিভিন্ন নয়,  
 এক সে ব্রহ্মের মূর্তি, সবি বপুঃ ব্রহ্মময়।  
 শত শত অস্ত্রে হেনে, দহনে জালায়ে কার,  
 চন্দনের আলেপন, যতনে করিলে তার,  
 যেই প্রীতি হ'তে পারে, সেই প্রীতি ভগবান্,  
 শক্তি শিবে ঘেষ করি', বিষ্ণু আরাধিলে পান ॥

দীক্ষা হিন্দুসম্প্রদায়ের অতি আবশ্যিকীয় সামগ্রী। এ বিষয়ে  
 জ্ঞানরত্ন মহাশয়ের উপদেশ সকল বিশেষ উপকারী বিবেচনায় দীক্ষা  
 বিষয়ে এস্থলে কিছু আলোচিত হইতেছে। সাধারণতঃ দীক্ষা  
 দুই প্রকার। বৈদিক ও তান্ত্রিক। শূদ্র এবং স্ত্রীলোক হইতে  
 ব্রাহ্মণ পর্যন্ত যাবতীয় হিন্দু, শাস্ত্রানুসারে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণে বাধ্য।  
 অদীক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়কে, মৃত্যু হইলে রোরব নরকে গমন করিতে  
 হয়, ইহা শাস্ত্রের আদেশ। এজন্য অদীক্ষিত ব্যক্তির মৃত্যু-সম্ভাবনা  
 ঘটিলে, অন্ততঃ মুমূর্ষু অবস্থায়ও তাহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করা  
 হইয়া থাকে। অদীক্ষিতা স্ত্রীলোক ব্রত-নিয়ম-শ্রাদ্ধাদি কিছুতেই  
 শাস্ত্রানুসারে অধিকারিণী নহেন। অদীক্ষিতা নারী, দেবতা ব্রাহ্মণের  
 অঙ্গ রন্ধন বা স্পর্শ করিলে পাপভাগিনী হন। এতদ্ব্যতীত বৈদিক  
 দীক্ষাও স্ত্রী-শূদ্র ব্যতীত অন্তান্ত জাতিকে গ্রহণ করিতে হয়। এক্ষণে  
 কাল-মাহাত্ম্যে ধর্মভাব ক্রমশঃ লোকের চিত্ত হইতে বিদূরিত হই-  
 তেছে। সামাজিক বন্ধন বশতঃই মাত্র বৈদিক দীক্ষাটী ব্রাহ্মণ-  
 সাধারণের আজও সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিক্ষা ও কালজনিত উচ্ছৃঙ্খল  
 বৃত্তিসমূহ চিত্তে উদ্দীপ্ত হইবার পূর্বে বালাকালেই উপনয়ন সম্পন্ন

হইয়া যায় বলিয়াই, বোধ হয় বালকগণের মুখে কোনও রূপ স্বাধীনতা-পূর্ণ বিতণ্ডা ঐ কার্যে শুনা যায় না। কিন্তু যৌবনোদগমে বুদ্ধিবৃত্তি ও তর্কাত্তমস্কান যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন কাহাকে কাহাকেও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। অপর কেহ কেহ যজ্ঞোপবীতটি রাখিয়া তান্ত্রিক দীক্ষাটির উপর পরাক্রম প্রকাশ করেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তে এই দাঁড়ায়, হিন্দু-শাস্ত্রের বেদ নামক সামগ্রীটা পুরাতন, তন্ত্রটা আধুনিক। পিতা পিতামহের আচরণ, সকল সময়ের মহাজনগণের আচরণ, স্বদেশের চিরানুষ্ঠিত আচরণ পরিত্যাগে তাঁহাদের সাহসও ধন্য, আর সকল সময়ের সকল বুদ্ধিমান্ অপেক্ষা তাঁহারা অধিক বুদ্ধিমান্, এ অভিমানও ধন্য !! আমি বা একটু সংস্কারানুশীলন করিয়াছি, তুমি বা একটু ইংরাজি পড়িয়াছ : লৌকিক বিষয়ে ছ'টো যুক্তির কথা বলিবার তোমার আমার কিছু সামর্থ্য হইয়াছে, তাই বলিয়া, আগম নিগমে কোনও মতামত প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য নহে। ঋষিরক্ত মহাশয় বজুভাবে আমাদিগকে বুঝাইতেছেন,

কৃত্যে পূৰ্ণ-পরম্পরা-প্রচলিতৈ স্বহঁা পরামাশ্রয়ন্  
 শ্রীতং তন্মগতং সমাচর সমী বিজ্জায় বেদাগমৌ ।  
 তত্বাতত্বনিরূপস্বং জড়মতে শাস্ত্রে ন তে শোভতে  
 রূপং তন্ম পরম্ নেতিচ মস্মৈ নাম্মে ন সম্বীযতে ।

মর্থ্যর্থ।

আগম নিগমে উক্ত অমূল্যান যত

পিতা পিতামহ শ্রদ্ধা করিতেন কত।

পূর্ব-পুরুষের পুত পদচিহ্ন ধরি'  
 চলিও জীবন-পথে দিবস-শরীরী।  
 শ্রদ্ধা কর' তুল্যভাবে কি আগম বেদ,  
 জড়বুদ্ধি অমুদ্যমে করিও না ভেদ।  
 সুকঠিন তত্ত্বাত্ত্ব নিরূপণে তব,  
 হে মুদু! নাহি শোভে বুদ্ধি অভিনব।  
 এ জনার আছে রূপ, ও' জনার নাই,  
 অঙ্কে কি সন্ধান তার পেতে পারে ভাই?

ধর্মকার্যে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্য কি মধুর  
 উপদেশ! বেদের আদেশ, শিবের আদেশ, ঋষির আদেশ, সকলই  
 হিন্দুসন্তানের প্রতিপাল্য শাস্ত্র। কেবল পরস্পরের বিরোধি অংশ  
 দৃষ্টি করিলে সঙ্কোচাদির দ্বারা সেই বেদ পুরাণ তন্ত্রের একরূপ মীমাংসা  
 করিতে হয়, বাহাতে কোনও ধর্মগ্রন্থ অমুদ্যমে হিন্দুসন্তান পাপভাগী  
 না হন। এইরূপ মীমাংসা ও শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে পঞ্চ 'মকার'  
 সেবারূপ কএকটি অতি অকার্য্য অনেক স্থানে হিন্দু সন্তানের মধ্যে  
 গুপ্ত ভাবে প্রচলিত আছে। ইহাতে যে শুধু তাঁহাদেরই অনিষ্ট  
 হইতেছে, এমন নহে। পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করিবার অভিলাষে  
 যদি অধস্তন বংশধরেরাও ঐরূপ ক্রিয়া করিতে থাকেন, তবে দশ-পনের  
 পুরুষ নিয়ে এক এক জনের অপরাধে চুই চুইশতের অধিক সন্তান  
 সেই কার্য্যে লিপ্ত হইবেন। এখনও এমন বংশ আছে, বাহাতে  
 কুলাচার বলিয়া বংশাবচ্ছেদে ঐ কার্য্য চলিত। এক একজন  
 পূর্বপুরুষের আচার হইতে এইরূপ কত শত বিসৃত বংশে যে ঐরূপ  
 কুলাচার গুপ্তভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। কাল-  
 বাহাঙ্ক্যে মন্ত-মাংস-মৈথুনাদিতে যতঃই বাহাদের চিত্ত ধাবিত হইবার

কথা, তাঁহারা যদি কোনও রকমে শাস্ত্র সাধক দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহাদের উচ্ছ্বল ভাব দমন করা কঠিন হইয়া পড়ে, এবং শত শত স্থানের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, বীমাংসকগণের বীমাংসা অগ্রাহ্য করিয়া, আত্মকার্য্যের গোবক শাস্ত্রার্থ করিতে চিত্ত স্বতঃই ব্যগ্র হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তন্মের বিশেষ বচন সকল উপেক্ষা করিয়া, প্রতি দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, যেভাবে পঞ্চ 'মকার' সেবা হইয়া থাকে, তাহা ঘোর অবৈধ। কৃষ্ণানন্দ-ধৃত শ্রীকৃষ্ণীয় বচনে দেখা যায় "ন দত্তাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যঃ মহাদেবো কথঞ্চন। বামকামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥" কুলচূড়ামণিতে দেখা যায় "বজ্রাসবমবশস্ত ব্রাহ্মণস্ত বিশেষতঃ। শুভার্জকং তদা দদ্যাৎ তাত্রেবাপি স্বভেদমধু॥" কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে "আমূল্যধারমাত্রক্ষরকুং গজা পুনঃ পুনঃ। চিচ্ছব্রকুণ্ডলীশক্তিগামরস্ত-মহোদয়। ষোমন-পঙ্কজ-নিস্তল-সুধাপান-রতোনরঃ। মধুপানমিদং দেবি চেতরং মদ্যপানকং। পুণ্যাপুণ্যং পশুং হস্তা জ্ঞান-খড়্গান যোগবিৎ। পরে লয়ং নয়েচ্ছিত্তং পলাশীতি নিগদ্যতে। মানসাদীজির-পশুং সংযম্যাম্বনি বোজয়েৎ। মাংসালী স ভবেদেবি ইতরে প্রাণঘাতকাঃ। পরশক্ত্যাশ্মমিথুন-সংযোগানন্দ-নির্ভরাঃ। মুক্তান্তে মৈথুনং তৎ স্তাবিতরে স্ত্রীনিষেবকাঃ॥" কালীকিয়াস তন্ত্রে ষষ্ঠ পটলে উক্ত হইয়াছে "সিধ্যন্তি পশুভাবে চ উগ্রসেনাদয়শ্চ মে। কংসশ্চ বহুদেবশ্চ পশুভাবে চ তো প্রিয়ে। অর্জুনো ভীমসেনশ্চ বৃধিষ্টিরশ্চ তে প্রিয়ে। পশুভাবে সদা সিদ্ধা ন বীরদিব্যাতাবয়োঃ। কল্মষী সত্যভামাচ জ্যোপদী দেবকী তথা। জ্যোণাচার্য্যঃ কৃপাচার্য্যশ্চাখখামা তথৈব চ। পশুভাবপরাস্তেতে সিদ্ধাঃ সিদ্ধা ভবন্তি চ। মদ্যং মংসাং তথা মাংসং মূত্রাং মৈথুনম্বেব চ। প্ৰাণান সাধনং তদ্রে চিত্তসাধনম্বেব চ। এতত্তে কথিতং সর্বং দিব্যাবীর্যমতং প্রিয়ে। দিব্যাবীর্যমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে। কলৌ পশুমতং

শস্ত্রং যতঃ সিদ্ধীষরো ভবেৎ ॥” সপ্তম পটলে উক্ত হইয়াছে “ন বিদ্যোঃ  
পাতিনঃ কার্য্যং কৃত্তে চ ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥” দশম পটলে উক্ত হইয়াছে  
“ন মদ্যং প্রপিবেন্দে দেবি কলিকালে কদাচন। পীত্বা মদ্যং কলৌ দেবি  
ব্রহ্মহত্যা পদে পদে। সত্যাত্রেতাপর্য্যেক্ষু প্রশস্তং মদ্যশোধনং। ন  
কলৌ শোধনং মদ্যং নাস্তি নাস্তি বরাননে।” তন্ত্রের এই সকল বিশেষ  
বচনের মীমাংসা না করিয়া অজ্ঞানী বাজিরাই মাত্র মদ্য-মাংস-মৈথুনে  
অনুরক্ত হন। রঘুনন্দন-প্রমুখ ধর্ম্ম-মীমাংসকেরা নানা প্রমাণাদি দর্শন  
করিয়া দীক্ষা-প্রকরণে সিদ্ধান্ত করিলেন “তস্মাৎ শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধে  
বস্তু নি পদং ন স্তব্যং।” শ্রুতি রহিয়াছে “মদ্যমপেয় মদেয়মনিগ্রাহ্যং”  
স্মৃতি বলিতেছেন “কামতস্ত সুরাং জঙ্ঘা অগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।  
তয়া স্বকায়ৈ নির্দগ্ধে মূচ্যাতে কিম্বিযান্ততঃ ॥” মহাপাতকের মধ্যে উক্ত  
হইয়াছে “ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুরুত্বনাগমঃ। মহাস্তি পাতকা-  
গ্রাহ স্তংসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥” মর্হর্ষিগণ, আপনারা যে আচারে চলিতেন,  
বাহা লোকের হিতকর, বাহা শাস্ত্রের মীমাংসা, সেই সমুদয়ই সর্ব্ব-  
সাধারণের উপকারার্থ এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই ঋষি-  
গুণটি ত্রায়রত্ন মহাশয়ের জীবনেও আমরা বিশেষ পরিমাণে দেখিতে-  
পাই। কোন্ আচারে চলা উচিত, প্রচলিত কোন্ বিষয় বা দোষকর,  
ত্রায়রত্ন মহাশয়ও বিপুল পরিমাণে সে সমুদয় কারিকাবদ্ধ করিতে চেষ্টা  
করিয়াছেন। তবে ঋষি-বচন স্বতঃকার্য্যকারী। ত্রায়রত্ন মহাশয়  
নিজের বচনকে কার্য্যকারী করিবার অভিলাষে কোথাও সন্দেহাত্ত,  
কোথাও যুক্তি, কোথাও বিদ্রূপের কঠোর কশাঘাত প্রভৃতির  
অবতারণা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য উভয়েরই তুল্য। ত্রায়রত্ন মহা-  
শয়ের রচিত বীরাচার-বিরোধী কতিপয় শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত  
হইল।

ধর্ম্মং চেত্ পরদারসঙ্করণাদ্ ধর্ম্মঃ সুরাসেবনাৎ  
সংপুঙ্খ্যে পশুমাংসমতস্য নিকরাহারাচ্চ হে বীর তে ।  
হত্যা প্রাণিচয়স্য চেত্ তব ভবেত্ স্বর্গাপবর্গাময়ে  
কৌঃসত্ কর্ম্মতয়া তদা পরিচিতঃ স্যাম্মেতি জানোমহে ॥

মর্ম্মার্থ ।

ধর্ম্ম যদি সঙ্গ করে' পর-পত্নী মনে,  
ধর্ম্ম করা যায় লাভ যদি সুরাপানে,  
মৎস্ত-মাংস থেয়ে সদা দেহ-পুষ্টি করে'  
তোমার জীবাত্মা যদি ধর্ম্ম লাভ করে,  
জীব জন্তু হত্যা করে' যদি ওহে বীর  
মোক্ষ কিম্বা স্বর্গ পা'বে জান তুমি স্থির,  
না পাই খুজিয়া আর কোন্ কার্য্য তবে  
অকার্য্য নামেতে আছে পরিচিত ভবে ॥

যা যোগীন্দ্রহৃদি স্থিতা ত্রিজগতাং মাতা ক্রপেকবৃতা  
মা তুয্যেত্শ্বপচীব কিং পশুবধে মাংসাশ্ববোত্ সর্জনৈঃ ।  
তস্মাদ্বীরবরাবধারণ্য তদাচারস্য যদ্বোধকং  
রক্তোমিবির্বিচরয়্য তচ্চ বচনং তন্মৈ প্রবিষ্টীকৃতম্ ॥

মর্ম্মার্থ ।

বিশ্বমাতা নহে কতু চণ্ডালের নারী,  
পশু, পক্ষী, কীট, নর সমস্তান তাঁহারি ।  
সকল সম্বন্ধে মা'র করুণা সমান,  
পশুবধে তুষ্টে কতু নহে মাতৃ-প্রাণ ।



যোগীন্দ্র-হৃদয় ধীর প্রিয়তম স্থান,  
 হিংসা, ঘেব, তম কভু তিনি নাহি চান ।  
 সেই সম্বন্ধী মায়ে ঘোর তমোভাবে  
 জীবহত্যা মত্তে আর কেমনে ভুবিবে !  
 সর্বশাস্ত্র ঐক্য করে' বুঝ বিচক্ষণ,  
 নানা শাস্ত্রে নানা রূপ বেড়েছে বচন ।  
 রাক্ষসেরা বুঝি কভু হ'য়ে বলবান্  
 তাদের আচারে দিতে শাস্ত্রের প্রমাণ,  
 পঞ্চ মকারের সেবা তত্ত্ব গেছে লিখে  
 শিব-বাক্য ভাবিও না তত্ত্ব লেখা দেখে ॥

নো ভ্রাত স্বপসি তবাজনি তনুর্নান্দ্যোপকারায় বা  
 কিন্তু ত্বদুদ্ব্যসনায কেবলমসৌ স্বার্থং সদা বর্জ্যতে ।  
 তস্মাদ্ভৃক্ষয়পিচ্ছবন্নিজতনোঃ সম্পৃষ্টয়ে স্মাদিষত্  
 লব্ধ্বাচ্ছাম সৃগাদি মাংসনিকরং মাংসোদরং পুরয় ॥

মর্ম্মার্থ ।

না জানি কি কাজ তব দেহ পুষ্টি করে'  
 না কর সাধনা নাহি আস উপকারে ।  
 শুধুই মিটাতে তব ব্যসনের সাধ,  
 নিরন্তর করিতেছ এত অপরাধ ।  
 তব দেহ মৃৎপিণ্ড, অস্ত কিছু নয়,  
 তাহার পোষণ তরে কুকুরের প্রাণ,  
 ছাগ মৃগ আদি অস্ত ধ্বংসে নিরন্তর  
 পরিপূর্ণ করিও না বৃথা এ উদর ॥

ଭୋ ଭ୍ରାନ୍ତ ତ୍ବମନାଦିରନ୍ତରହିତଃ କ୍ଷିପ୍ତେଷ ତେ ବିପ୍ରହୋ  
ନାଂ ତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣକରସିରାୟ ଭବିତା ନକ୍ଷେଦବକ୍ଷ୍ୟଂ କଦା ।  
ହିଂସା ଧର୍ମମହିମନଂ ସୁନିଗଣାଦିଫ୍ଟଂ ବସୁଃ-ପୁଫ୍ଟୟ  
କ୍ଷାଦି କ୍ଷୀୟ ଯଦ୍ବ ପ୍ରବୋଧବିଧୁରୋ ମା କ୍ଷୋଦରଂ ପୁରୟ ॥

ସମ୍ଭାର୍ଥ ।

ଓହେ ଡାକ ! ଡାକ୍ତି-ବନ୍ଧେ କି କରିଛୁ ତାହେ,  
ତୁମି ଚିତ୍ରହାସୀ, ତବ ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ।  
ଚିତ୍ରକାଳ ଏହି ଦେହ ତୋରା ମନେ ଥେକେ,  
ଏ ହେନ ଆନନ୍ଦ ତାହେ ଦିବେ ନା ତୋରାକେ ।  
ଅତଏବ ନବର ଏ ଦେହେର କାରଣ  
କର' ନା ନିଜେର ଚିତ୍ର ଅହିତ-ମାଧନ ।  
ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦେଶ,  
ସୁନିଶ୍ଚୟ-ବାକ୍ୟୋ ତାହେ କରିବା ବିଧେଷ,  
ଦେହ-ପୁଣି ତରେ, ଯଥା ବ୍ୟାଧି କି କୁକୁର,  
କର' ନା ଉଦର-ପୂର୍ତ୍ତି ବିବେକ-ବିଧୁର ।

ଯା ଶକ୍ତିଃ ଶିବହୃଦ୍ଭାଗା ପତିରତା କ୍ଷାତା ସତୀତ୍ବାକ୍ଷୟା  
କ୍ରୌ ଋଷେଷ ଚ ସେବ ବିଶ୍ଵଜନନୀ ସୀମନ୍ତିନୀ-ପାଳିନୀ ।  
ତନ୍ମୋକ୍ତଂ ନ ପରାଞ୍ଜନାୟା ଗମନଂ ଦ୍ରାଗିବ ତକ୍ଷେବେନ  
ତନ୍ମାହୀର କଦାପି ମା କୁର ତଦାଚାରଂ ଶିବୋକ୍ତିଭ୍ରମାତ୍ ॥

ସମ୍ଭାର୍ଥ ।

ମଦାହିଁ ବସନ୍ତି ସା'ର ପତି-ବନ୍ଧୁ-ହେଲେ,  
ଜଗତ୍ ଶକ୍ତି ଓ ସା'ଙ୍କେ 'ମତୀ' 'ମତୀ' ବଳେ ;

সতীরে অসতী কর' সতীর সন্মুখে  
 এ আদেশ ওহে বীর তব্ধে নাহি লেখে।  
 লজ্জাহীনা বিবসনা ভ্রমিলে রমণী  
 কি ঘোর বিপদ সদা হেরিত ধরণী !  
 বিশ্বমাতা রক্ষিবারে সীমন্তিনীকূলে  
 লজ্জারূপে রয়ে নারী-হৃদয়-কমলে।  
 সতীকুল-শিরোমণি পতিবন্ধে রেখে,  
 তামিনী-পালিনী সেই জননী-সন্মুখে,  
 সতীরে বিলজ্জ কভু করিও না বীর,  
 শিবোক্তি ভেবেছ যাহা, ত্রাস্তি তব হির ॥

উচ্চাটন, বিবেষণ, বশীকরণ, স্তম্ভন, মারণ প্রভৃতি উপায়ে লোকের  
 অনিষ্ট সাধন করা তামসী সিদ্ধির ফল। তান্ত্রিক উপাঙ্গাদি দ্বারা ভূত,  
 প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতিতে সিদ্ধ হইলে ঐ সকল  
 তামসী ক্ষমতা লাভ করা যায়। তামসী সিদ্ধি লোকের আশু  
 মোহকরী। কিন্তু তাহা পরমার্থের উপচর করে না। তাহা দ্বারা  
 পাপরাশিই সঞ্চিত হইয়া থাকে। মদ্য-মাংস-মৈথুনাদি ক্রতিস্বতি-  
 বিরুদ্ধ উপায়ে ভগবতী-আরাধনা করিয়া যদি কোনও ক্ষমতা লাভ  
 করা যায়, তাহাও পরমার্থ-সাধিকা নহে, মোহকর তামসীসিদ্ধি মাত্র।  
 এ সম্বন্ধে কুর্ম পুরাণ হইতে হিমালয়ের প্রতি দেবী-বাক্য, ধর্ম্ম নীমাংসক  
 রঘুনন্দন যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই “যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে  
 লোকেহশ্মিন্ বিবিধানিচ। ক্রতিস্বতি-বিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেবাং হি  
 তামসী। করালভৈরবঞ্চাপি যামলং বামমাশ্রিতং। এবধিধানি  
 চাক্তানি মোহনার্থানি তানিতু।” জ্ঞানরত্ন মহাশয়ও কবিত্বযোগে ঐ  
 শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি লিখিতেছেন,

কর্তৃ বা প্রদত্ত তন্নৌমুখময় কাণ্ড কদাচিৎ।  
তন্মূর্তীং ন দৃশ্য ক্রিয়াম্ভতিভয়া মর্দনং তস্মৈব  
দৃষ্টং তামসকর্ম্মিণ্য মিষ্টমিচ্ছয়-দ্বিষ্টং সদা সম্ভবতী  
দুষ্টাচারম্বরে চ কাম্যমিচ্ছরি তন্মসকর্ম্মমুদীয়তাং ।

মর্দার্থঃ ।

কতু মতি প্রকটের করিতে প্রলম্ব,  
চরমে ধরেন কাণ্ড বোর তমোমর ।  
সে মূর্তিতে নাহি মরা, নহে ক্ষেমকরী,  
ভগবত ক্রিয়া করি' বোরে ভরকরী ।  
মদ্য পেনে সে মূর্তিতে ভরকর কল,  
শিষ্টের বিকৃষ্ট অতি, তামস কেবল ।  
সে ভাবেতে পরমার্থ কিছুমাত্র নাই,  
বীভৎস পৈশাচ কল লভিবে সদাই ।  
সে কল (ও) তত্ত্বের যদি হয় লক্ষ্যস্থল,  
বে বচন পাও কেনো তত্ত্বের ই) সকল ॥

কদাচিৎকর্ম্মবিভূতা বিকটদমনা বীতবসমাঃ  
কুদাসক্ত-মাংসাভ্যাসব কবলমে সৌম্বরসনা ।  
রসোন্মত্তা হৃৎকাস্তুরমুরসি শব্দীরমুদিতা  
বিধাতুং তস্মৈ বা প্রমত্তু পরং তামস-বরম্ ॥

মর্দার্থঃ ।

কখন বা অবিভূতা বিকট-দমনা,  
দারুণ-বীভৎস-রেশাঃ বিগতবসনা ।

রণেতে উন্মত্ত বামা অশুর নাশিরা,  
 শঙ্কু-বক্ষঃ ছেড়ে নাচে হাসিয়া হাসিরা !  
 আসব পানের তরে জিহ্বা সদা লোল,  
 অশুরের রক্তমাংসে ভরিছে কবল ॥  
 সে মূর্তিতে ঢেলে মা'য়ে রক্ত-মাংসাসব  
 ঘোর তমোময় বর পেতে পার সব ॥

এইরূপ তামসী সিদ্ধি বীরাচারের অধীন হইলেও, বাহারা বীরো-  
 চিত্ত সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ঐ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ  
 হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেই মদ্য-মাংস-মৈথুন ব্যবহার বরং শোভা  
 পায়। অস্তুর পক্ষে ঐসকল একান্তই উপহাসজনক। জ্ঞানরত্ন  
 মহাশয় বলিতেছেন,

কর্তুং যৈ প্রभवन्ति मारण-वचस्तथादिकं तामसं  
 तेषामस्तु वरं परस्य रमणी-सङ्गः सुरा-सेवनं ।  
 वीरत्वं त्वयि, किन्तु कापि विभुता नो भाति वीराश्रिता  
 हा रत्नाकरमञ्जुनैस्तव पयःपानं फलं केवलं ॥

মর্থ্যার্থ।

বচঃশব্দে মারণাদি তামসিক কাণ্ডে,  
 পটু যারা, কথঞ্চিৎ তাহাদেরি সাজে—  
 বরং মদিরা আর পর-পত্নী সেবা,  
 কিন্তু হে তোমাতে কল ফলিয়াছে কিবা ?  
 বীর ভূমি, কিছু নাহি বীরের লক্ষণ,  
 না পেলো মারণ-বিদ্যা, না জান শুভন !

আহা, রক্তাক্তে ডুবে রক্ত নাহি পেলেন,

নবশাক্ত জলে শুধু হাবুডুবু খেলে !!

বেদাঙ্গে বিহিতা সুরাদিরহিতা সেবাসুস্পীতিদা

তত্ সেবা পরমার্থসাধনমিদং তন্মৈ রপি শ্লাপিতং ।

শ্রুত্বামোহনকারি কিস্তবচনং মদ্যেন মদ্যং পিব

অর্হেৎ যঃ পরদেবতাং পুশ্যতয়স্তস্মিন্ শ্ব তত্ সাহসে ॥

মর্ম্মার্থ ।

দেবের সন্তোষ হয় আরাধিলে দেবে,

মস্ত মাংস তেয়াগিয়া সংযত স্বভাবে ।

এই উপদেশ সর্ব বেদাদিতে রহ,

ইথে পরমার্থ লাভ, তন্ত্বেও তা কর ।

তন্ত্বের সে অংশ গেল, গেল শ্রুতি স্মৃতি,

কাল-ধর্ম্ম প্রচারিতে যে অংশ বিবৃতি,

যে অংশ মোহনকর তন্ত্বে নিজে কর,

সেই অংশে যেই নর করিয়া প্রত্যর,

ক্ষুদ্র কতিপয় বাক্যে সর্বশাস্ত্র ছেড়ে,

মদ্য পিয়ে, মদ্য দিয়ে আরাধনা করে,

সহস্র প্রণাম আমি তারে করি, আর

সহস্র প্রণাম থাক্ সাহসেতে তার ॥

ভারতীয় মহাশয়ের বেক্রপ শাস্ত্রজ্ঞান, সেইরূপ উপদেশ দিতেই তিনি বাধ্য । তিনি বীরাচারকে ঘোর অবৈধ বিবেচনা করেন, এ বিষয়ে তাঁহার লিপিও তদ্রূপই হইরাছে । যাহারা বীরাচারের পক্ষপাতী, তাহারা এই সকল উক্তিতে অসন্তুষ্ট হইবেন, দোষ নাই । একত্

জাহ্নবীর মহাশয় নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা তাঁহাদের নিকট কক্ষ  
প্রার্থনা করিয়াছেন ।

বীরাচার-বিচার-বাগ-বিরচিতা নেপা ময়া স্ত্রী স্ত্রীয়া  
যদভূতং ভবদাগমিষাদস্থিলম্বোচ্ছ্বামযোচ্ছ্বাফলং ।  
সুদৃঢ়তম প্রাণিধায় শুদ্ধহৃদয়ে ভী মাশ্রিত্যস্তান্ধিকা  
রোষাবেশমযস্য পাবকসমা ! দোষো মম জামতা ॥

মর্মার্থ ।

যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান হইল,  
সকলি কেবল ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় ।  
মানসিক তাত্ত্বিক যত বাক্য শুনে মম  
হঁতে পারে হইয়াছে পাবকের সম !  
বীরাচার-বিরোধিনী বাণী যে সকল,  
তাঁহাও ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ীর কেবল ।  
বাক্যগুলি চিন্তা করে' বিগত হৃদয়ে,  
নম মোঘ কক্ষ' সবে রোষ তেজাগিরে ॥





## নবম পরিচ্ছেদ ।

ঋষি-জীবন । দেব-নির্ভর । বহু বিপদাপদ হইতে উদ্ধার ।  
হাতুয়ার মহারাণীর অভয়-বাণী । নিষ্কাম ভগবদ্-  
ভক্তি । ব্রহ্মজ্ঞানিগণের মীমাংসার সমালোচনা ।  
ব্রাহ্মণ-নিন্দায় বিদ্রোহ । সকল আশ্রম অপেক্ষা  
গৃহস্থাশ্রমে অমুরাগের হেতু ।

স্তায়রত্ন মহাশয়ের কবি-জীবনের নির্মল-উচ্ছ্বাস, অধ্যাপক-  
জীবনের বিদ্যা-বিস্তার যেমন দর্শনীয় সামগ্রী, ঋষি জীবনের ধর্ম-  
বিশ্বাস, দেব-নির্ভর প্রভৃতিও সেইরূপ লক্ষ্য করিবার বস্তু । তিনি  
যখন ভক্তিভরে পূজা করিতে বসেন, দেখিলেই বোধ হয় পূজা-স্থানে  
দেবতাগণের আবির্ভাব হইয়াছে । দুর্গাপূজা, শ্রামাপূজা প্রভৃতি  
উৎসব সকল ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রতিবর্ষেই করিয়া থাকেন । ঐ  
সকল উৎসবের সময় তিনি যখন সজল-নরনে প্রতিমার দিকে চাহিয়া  
বসিয়া থাকেন, দেখিলেই বোধহয় যেন মারের কোন' প্রিয়তম  
পুত্র কৈলাস হইতে তপোলুপ্ত হইয়া মর্ত্যে নামিয়াছেন, এবং মারের  
মুগ্ধা প্রতিমা দেখিয়া কৈলাসের মাতৃস্নেহ স্বরণ হওয়ার, ঐরূপ  
অবসর হইয়া পড়িয়াছেন । শিবপূজাস্তে এবং সারংসঙ্ক্যাস্তে ন্যায়রত্ন  
মহাশয় প্রতিদিন একদণ্ড দুইদণ্ড কাল আন্তোত্তোষের করুণা ও  
বিকৃষের ব্যঙ্গক নাম সকল উচ্চারণ করিয়া ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে



ডাকিয়া থাকেন। সে ডাক শুনিলে অতিবড় পাষাণেরও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। দেবদয়ার উপর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অসীম বিশ্বাস। পরিজনের পীড়াদির সময় ও অন্যাচ্ছ বিপৎকালে পুরুষকারের সহিত রীতিমত দৈব-কার্য্যেরও তিনি অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাহাতে বহুতর বিপদাপদ্ হইতে উদ্ধারও পাইয়াছেন। একবার অপূত্রক হইয়া প্রাচীনাবস্থার পুত্রলাভ কামনায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দেড় সহস্র শিবের আরাধনা করান। পরে বর্ত্তমান পুত্রকে ন্যায়রত্ন মহাশয় লাভ করেন।

একটি ঘটনাকে দেবদয়ার জাজ্ঞ্যামান দৃষ্টান্ত বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় চিরদিন স্মরণ করিয়া থাকেন। একবার পূর্ব্বদিকে কোনও স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছিলেন। ছোট ছোট খালের ভিতর দিয়া নৌকা করিয়া ঐ স্থানে গমন করিতে হয়। প্রায় দুই প্রহর রাত্রি-কালে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নৌকা হঠাৎ ডাঙ্গার ধাক্কা লাগিয়া ভগ্ন হইয়া গেল। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্থলে উঠিলেন। স্থলে লোকালয় নাই কেবল প্রান্তর। বর্ষায় সেই প্রান্তর কোথাও জল-পূর্ণ, কোথাও কর্দমাক্ত হইয়াছে। বৃষ্টিও অবিশ্রান্ত পড়িতেছে। মাঝীদিগের নিকট ঐ স্থানে ব্যত্ৰ-ভীতির সম্বন্ধেও-নানা কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। মাঝীরা বলিল “ঠাকুর-মহাশয় এখান হইতে স্থলপথে এককোশ মাত্র গমন করিলে আপনি কর্ণবাটীতে উপস্থিত হইতে পারিবেন। এই মাঠটা আন্দাজ তিন পোয়া হইবে। তৎপরে অতি ক্ষুদ্র একটি খাল আছে। পারাপার জন্য নারিকেল গাছের গোড়া কেলা আছে। তাহার উপর দিয়া খালটুকু অনায়াসে পার হইতে পারিবেন। তৎপরে পোয়াটাক্ গেলেই গ্রাম পাইবেন এবং কর্ণবাটীতে উপস্থিত হইবেন।”

নায়রর মহাশয় ঘোর বিপন্ন হইলেন। সেই দুর্ভোগের মধ্যে অন্ধ-  
কারে দুইপ্রহর রাত্রি সময়ে অজানা মাঠ পার হওয়া দূরদেশীর পথিকের  
পক্ষে কিরূপ আশঙ্কা-জনক, যিনি কখনও ঐরূপ অবস্থার পতিত  
হইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তত্পরি বৃক্ষমূলরূপ সেতু অব-  
লম্বনে অন্ধকারে খাল পার হইতে হইবে। ব্রাহ্মণপণ্ডিত-জীবনে  
অর্থোপায় কি ক্লেশসাধ্য, নায়রর মহাশয় সেইদিন তাহা অন্তরে  
অন্তরে অনুভব করিলেন, এবং বিপদে পড়িয়া মুহূর্হঃ মধুসূদনকে  
স্মরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দেখিলেন, দূর হইতে লণ্ঠন  
হস্তে দুইটা লোক আসিতেছে। তাহারা ক্রমশঃ নায়রর মহাশয়ের  
নিকটবর্তী হইল। নায়রর মহাশয় জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিতে পারিলেন,  
তাহাকে যে বাটীতে যাইতে হইবে, ঐ দুইটা লোক আবশ্যকমতে সেই  
বাটীতেই গমন করিতেছে। নায়রর মহাশয় তাহাদিগের  
সমভিব্যাহারে নির্ঝিগ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন। ঘোর নিশীথ-  
কালে মধ্য নিদ্রার সময়, দুর্ভোগের মধ্যে মনুষ্যের অগম্য প্রান্তরে  
সেই সঙ্গীদ্বয়কে পাইয়া নায়রর মহাশয় দেবদূত বলিয়া বিশ্বাস  
করিয়াছিলেন।

শুধু এইরূপ বিপদ বলিয়া নহে, যে কোনও সময় চিন্তে বিশেষ  
বাকুলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিবারণ কল্পে অনেক সময়  
এমন সুযোগ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যাহাকে  
নায়রর মহাশয় দেবদয়ারূপে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।  
প্রথম অধ্যাপনা কালে, কিরূপে বিপুল ছাত্র প্রতিপালন করিবেন,  
এই ভয়ে নায়রর মহাশয় যখন বাকুল হন, তখন অবাচিতভাবে  
ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কিরূপ বজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্বে  
প্রকাশ করিয়াছি। সে ঘটনাকে নায়রর মহাশয় দেবদয়া বলিয়াই

পরিচর দিয়া থাকেন। প্রাচীনারহস্য কাশীবাস করিবার জন্য ভ্রাম্য-  
রত মহাশয় যখন বিশেষ ব্যাকুল হইলেন, কিরূপ অবাচিতভাবে  
হাতুয়ার মহারাজ তাঁহাকে পরিজনবর্গসহ কাশীধামে নিশ্চিত মনে বাস  
করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তাহাও পাঠক জ্ঞাত আছেন। এ  
সকল, মহাপুরুষের উপর দেবদয়ারই নিদর্শন।

হাতুয়ার মহারাজ স্বর্গ গমন করিলে পর, ভ্রাম্যর মহা-  
শয়কে আবার কয়েক বৎসর কিছু ব্যাকুলতার সহিত কাল  
বাণন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অবর্ত্তমানে পরিজনবর্গের  
বশ্য কি হইবে? রাজসংসারের দৃষ্টি যদি সেক্ষণভাবে আর  
না থাকে, তবে ভবিষ্যতে কাশীতে ভ্রাম্যর মহাশয়ের পরি-  
জনবর্গের কি হৃদশাই না ঘটিবে! এইরূপ নানা চিন্তায়  
ভ্রাম্যর মহাশয়ের ইদানীং কিছু ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত  
হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার পুত্র কন্যারাও প্রায়ই বলিতেন  
“বাবা, মহারাজ স্বর্গে গিয়াছেন বটে, কিন্তু দেবেশ্ববাবু  
প্রমুখ প্রধান প্রধান কর্মচারী বাঁহারা মহারাজের দক্ষিণ  
হস্ত, তাঁহাদের দ্বারা আমাদের কথা একবার মহারাজকে  
জানাইলে হয় না?” ন্যায়রত মহাশয় নিজের কোনও ব্যাকুলতা  
সহসা পরিজনগণকে জানিতে দিতেন না। তিনি ঐ সকল কথার  
উত্তরে প্রায়ই বলিতেন “তোমরা ভাবিও না। তোমাদের এরূপ  
ব্যাকুল হইবার বিশেষ কিছুই হেতু নাই। যে রাজ-সংসারের অধীনে  
তোমরা কাশীবাস করিতেছ, সে সংসার ক্ষুদ্র সংসার নহে। মহারাজ  
স্বর্গগামী হইলেও সে সংসারে বিবেচনা, তিরোহিত হইবার বস্তু  
নহে। বিশেষতঃ ধন্যপরাধপা পতিব্রতা রাজ্ঞী অরপূর্ণরূপে সে  
সংসারে বিরাজ করিতেছেন। কুমার-মহারাজ বয়ঃ হইতেছেন।

যে দেবেন্দ্রবাবু প্রভৃতির নাম করিতেছ, তাঁহারা রাজকাৰ্য্যে পরামৰ্শ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের কর্তব্যবুদ্ধি আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তাঁহাদের নিকট উপযাচক হইয়া কোনও বিষয় জানান চপলতা প্রকাশ মাত্র। অতএব মহারাজ স্বৰ্গগামী হইলেও তোমাদের তরের কোনও কারণ নাই জানিবে।”

জায়রত্ন মহাশয় ব্যাকুল পরিজনবর্গকে এই ভাবে বুঝাই-  
ডেন বটে, কিন্তু সমতা নিবন্ধন প্রিয়বস্তৃগণের জন্য তাঁহার  
আশঙ্কাও মনে মনে বড় কম ছিল না। বিশ্বনাথ অচিরেই  
ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এ ব্যাকুলতাও তিরোহিত করিয়া দিলেন।  
বিক্যাচলে কুমার-মহারাজের উপনয়ন-উপলক্ষে মহারানী জায়রত্ন  
মহাশয়কে তপায় লইয়া গেলেন, এবং মহারানীকে আশীর্বাদ করিবার  
অধিকারও ন্যায়রত্ন মহাশয়কে প্রদান করা হইল। সেই সময়ে  
মহারানী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ব্যাকুলতা অবগত হইয়া তাঁহাকে অভয়-  
বাণী শ্রবণ করাইলেন। যাঁহার দ্বারা একবার জানাইবার জন্য  
জায়রত্ন মহাশয়ের ব্যাকুল পরিজনেরা সৰ্বদা জায়রত্ন মহাশয়কে  
অনুরোধ করিতেন, জায়রত্ন মহাশয়ের ব্যাকুলতা দৰ্শনে রাজ্ঞীই  
স্বয়ং সেই দেবেন্দ্রবাবুর মুখে প্রকাশ করাইলেন “আপনার সংসার  
এখন যে ভাবে কাশীধামে রহিয়াছে, আপনার অবর্তমানেও সেই  
ভাবেই কাশীধামে থাকিবে। আপনি রাজসংসার হইতে যে সাহায্য  
পাইতেছেন, আপনার পুত্রও তাহা পাইবেন। এ বিষয়ে আপনি  
নিশ্চিত হইবেন।” আমি যাহাকে দেবদত্তা বলিয়া নির্দেশ করি,  
তুমি হয়তো তাহাকে দেবদত্তা বলিতে রাজ্ঞী নও। কিন্তু ন্যায়রত্ন  
মহাশয় এই সকল ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেবদত্তা বলিয়াই পরিচয়  
দিয়া থাকেন, এবং মহিমময়ের মহিমা চিন্তা করিয়া রোমাঞ্চিত

হন। দেব-দয়ার ন্যায়রত্নমহাশয়ের এইরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অসীম শ্রদ্ধা থাকিলেও তিনি সম্পূর্ণ নিকামভাবেই দেবভক্তি করিয়া থাকেন। পার্থিব শুভাশুভ তাঁহার সেই ভক্তির তারতম্য ঘটাইতে কখনও সমর্থ হয় না।

ভায়রত্ন মহাশয় বৈরাগ্য ও ভগবদ্-বিষয়ক যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার এই জেখর-নির্ভর ও ঐকান্তিক ভক্তি কিরূপ অদ্বুত ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নে দুই চারিটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইল। ‘অপরোধ-ভঞ্জন’ নামক কবিতার মধ্যে তিনি কোনও স্থানে লিখিয়াছেন,

নৈবাকারি নতির্নুতিষ্য ন ময়া ভো বিশ্ববন্দ্যো বিভো  
সত্যং বুদ্ধ্য কদাপি মাষিতমিদং নাস্তীম্বরঃ কহিঁবা ।  
তদ্বাক্যদ্বয়মেব তাবক মহানামাঙ্কিতং সঙ্কিতং  
পাতস্তাত ভবাশ্বিপাত-বিরতে নী কিং নিদানং ভবেত্ ॥

মর্থার্থ ।

না করেছি স্তব কভু                      করিনি প্রণাম বিভু  
তুমি বহু এ বিশ্ব-জগতে,  
‘কভু বলি “ঈশ নাই”                      “ঈশ সত্য” কভু গাই  
কার্য্যাকার্য্য নাহি স্থির চিতে ।  
যাহা করি, যাহা কই,                      প্রভু তোমা ছাড়া নই,  
মহানামে হই না বিরত,  
আগে ‘ঈশ’ নাম করে’                      ‘আছে’ ‘নাই’ বলি পরে  
অগ্রে ‘ঈশ’ হয় উচ্চারিত ।

আন্তিক নান্তিক হই      ঘেবে কি সন্তোষে কই  
ভবে মুক্তি ওই নাম শুণে  
ওহে পাতঃ ! ওহে তাত !      ভবসিদ্ধ নিপতিত  
পাবে না কি এই দীনজনে ?

নাস্তীশ্যো নচ বম্বুরস্তি জগতাং নাপন্নপাতী তথা  
কোऽप्यস্তোতি কথ্যঃ কদাহমবদং যোধনং বদন্ত্যশ্লিপনং ।  
এতদ্-ভীষণ-ভাষণ-প্রজনিতং স্মাম্যাপরাধং বিম্বী  
যস্মাত্তন্ন কদাপুণ্যপাদিগমহং ক্ত্বৈশ্যবিদ্বৈষণং ॥

মর্ম্মার্থ ।

শোকে তাপে মন'-থেমে      কখন' বলেছি কৈদে  
ঈশ্বর নামেতে কেহ নাই,  
যদি বা ঈশ্বর থাকে      বন্ধু নাহি বলি তাঁ'কে,  
বন্ধু যদি কষ্ট কেন পাই ?  
যদি তিনি বন্ধু হন      কারো বন্ধু, কারো ন'ন,  
লক্ষপাতী তিনি অতিশয়,  
এ সব ভীষণ-ভাষে      হুসেছি কত না দোষে  
তোমারে গো কতই সময় !  
নিজ গুণে আজি আমি      করিতে হইবে ক্ষমা,  
করি না তো ভূলাবার ছলে  
কা'রেও এ উপদেশ      নাহিতো বিবেচ-লেশ,  
যা বলেছি, শোক তাপ পেনে ।

'বৈরাগ্য-চিন্তা' নামক কবিতায় অন্যখানে ভায়রর মহাশয়  
বলিতেছেন,

সমান্নিষ্টঃ সৃষ্টেরহমহ মহাপাতকশতৈঃ  
 পিতাত্বং পাতাত্বং ভব তব কৃপাপাত্রমশ্লিলম্ ।  
 ততঃ স্মাতৃ স্ত্রৈঃ মেঃস্মৃতমস্মৃতলামৈক সদনং  
 কদা যামি স্মামিন্ বিষয়গ-দুরাশা-প্রশমনম্ ॥

মর্থার্থ ।

যে দিন হইল সৃষ্টি সেই দিন হ'তে  
 সত্য বটে লিখি আমি মহাপাতকেতে ;  
 কিন্তু ওহে দেব-দেব ! এ বিশ্ব ভিতর,  
 পিতা তুমি, পাতা তুমি, আছি নিরঙ্কর ।  
 সবাই কৃপার পাত্র এই বিশ্বে তব,  
 পাতকী আমিও তাই মুক্তি-ধন পাব ।  
 কিন্তু কোন্ জন্মে পাব সেই মুক্তি-ধন,  
 কোন্ জন্মে হ'বে ভববন্ধন-মোচন,  
 কোন্ জন্মে বল' সেই মুক্তি দিতে মোরে  
 বিষয়-দুরাশা মোর ছেড়ে যা'বে দূরে ?

যেখানেই নারায়ণমহাশয় ভগবদ্-বিষয়ক কবিতা রচনা  
 করিয়াছেন, সেইখানেই এইরূপ অসামান্য ভক্তি পরিলক্ষিত হয় ।  
 'নিরাম-ভগবদ্ভাবঃ' নামক কবিতা সমূহের মধ্যে তিনি একস্থানে  
 লিখিতেছেন,

জীবাঃ সন্তু ন সন্তু বা স্থিরতরা জন্মান্তরাদোনি বা  
 ধর্ম্মাঃ সন্তু ন সন্তু বা সুখময়-স্বানাাদয় বিশ্বময় ।

বাল্যাস্মি তব তাবতীষু তদপি প্রীতিঃ পরা মূর্তিষু ।  
প্রেয়ঃ প্রীতি রপেষ্যতে নহি ফলং প্রীতিঃ স্তুতাদিষ্বিব ॥

মৰ্ম্মার্থ ।

‘নিভা জীব’ থাক্ আর নাহি থাক্ কিছু,  
থাক্ আর নাহি থাক্ ‘জন্মান্তর’ পিছু,  
থাক্ কি না থাক্ প্রভো বস্তু ‘ধৰ্ম্ম’ নামে,  
থাক্ কিবা নাহি থাক্ ‘স্বৰ্গ’ পরিণামে,  
বালা হ’তে ভালবাসি শ্রীমূর্তি সকল,  
কখন’ ভাবিনা কিবা তা’র ফলাফল ।  
প্রেম প্রিয়বস্তু চায়, নাহি চায় ফলে,  
পুত্রে কি বাৎসল্য যায় ফল নাহি পেলে ?

যখন কেশব-সম্প্রদায় বঙ্গীয় নবযুবকদের মধ্যে নিরাকার  
ব্রহ্মোপাসনার কর্তব্যতা সংস্থাপনের বহুল প্রয়াস পাইতেছিলেন,  
তৎকালে ন্যায়রত্ন মহাশয় সাকার-উপাসনাপক্ষে অনেক গুলি  
সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। তাহাতে ভক্তকবি বলিতেছেন যে,  
চিরপ্রচলিত সাকার উপাসনা কেন ছাড়িতে হইবে ?

ঋতং বা রিক্তং বা তব ধবল-পীতাসিত-তনু-  
পরিম্মানং নূনং তদপি মম চেতী রময়তি ।  
প্রমিত্যেব প্রীতিং ত্রিভুবনপতি কিম্বু ভজতি  
কলাপী নো ধূলীপটল-জলদভ্রাম্মিজ-মুদম্ ॥

মৰ্ম্মার্থ ।

কখন’ শ্রীমূর্তি কালা কহু মূর্তি গড়ি’ ধলা

কহু পীত করিয়া গঠন



ব্রজভাবে তা'র ধ্যানে কত শান্তি লভি প্রাণে ;

ভ্রমেতেও তা'বি না কখন—

সে মূর্তি তোমার কিনা, মিথ্যা হয় নাহি মানা,

বিশ্বাসেতে আমি প্রাণ সঁপি ;

ধূলিরাশি ওঠে যবে যদি জলধর ভাবে

আনন্দে কি নাচে না কলাপী ?

কবি মহাকবি অনেক জন্মিয়াছেন। কাব্য মহাকাব্য সকল  
অন্বেষণ করিলে অপূর্ণ অপূর্ণ অনেক কবিতাই পাওয়া যাইতে  
পারে। কিন্তু এ জাতীয় শ্লোকসকল যেন এই নূতন। পবিত্র ধ্বনি-  
জীবনে কবি-জীবনের সম্মিলন হওয়ার কবিতার অক্ষরে অক্ষরে যেন  
এইরূপ পবিত্রতা প্রতিকলিত হইয়াছে। 'ব্রাহ্মভাসানাং ভ্রমখণ্ডনং'  
নামক কবিতাবলি হইতে আরও এইরূপ কতিপয় অপূর্ণ কবিতা  
নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ গুলিও ব্রজজ্ঞানিগণের মীমাংসায় লক্ষ্য  
করিয়া রচিত হইয়াছিল। জ্ঞানরত্ন মহাশয় যে তাঁহাদের সহিত  
বিরোধ ঘটাইবার জন্ত ঐ সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা  
নহে। উপাস্ত-বস্তু সম্বন্ধে কোনও নূতন মীমাংসা গুলিলে জ্ঞানরত্ন  
মহাশয়ের চক্ষু জলে ভাসিতে থাকে। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি  
সেই সজল-নরনের স্বতি-চিহ্ন।

মূর্তি মোক্ষসমামমায় বিঘদা মোক্ষায় সঙ্খ্যে বা  
ভাবেনোদভবতী হৃদা ভগবতী যাং ভাবয়ামী বয়ম্ ।  
অগ্নে যাস্ত্ব বিলোক্য জন্ম-মনসাং মন্ব্যামহি ধন্বতা  
মম্যন্তী হতচেতনস্য কথয়া তাং বিদ্যারামঃ কথম ॥

মন্দার্থ ।

যে মূর্তি ভাবি গো কভু মোক্ষ পা'ব বলে',

যে মূর্তি পড়ে গো মনে বিপদের কালে,

কখন' বা বজ্রভাবে

অস্তর যে মূর্তি ভাবে,

পুরাতে ভক্তের বাহা যে মূর্তি সকলে —

স্বয়ং ভাবের বিভূ

যত্নে ধরেছিল কভু ;

যে মূর্তি স্বপ্নেও কভু নিরখিতে পেনে—

অনম সার্থক জ্ঞান

ধন্য হয় মন প্রাণ ;

আমাদের চেয়ে যা'রা হীনবুদ্ধি কত

সে মূর্তি তাদের বাক্যে হ'ব কি বিন্মত ?

येषामीश महाप्रसादमसृतं भोक्तुं कदा न स्पृहा

द्रष्टुं श्रीपुरुषोत्तमेन्दुवदनं श्रीमन्दिरान्तर्गतम् ।

गन्तुं तीर्थमयीञ्च तत् प्रियपुरीं तेषां परेशद्विषां

श्रीमत्तत्सद्वचसां प्रमुद्रितदृशां धिग्बिज्জনोपासनाम् ॥

মন্দার্থ ।

না অগ্নে বাসনা কভু যা'হাদের মনে

প্রভুর অমৃতময় প্রসাদ ভঞ্জে,

না রাখে যাদের হিয়া

সাধ শ্রীমন্দিরে গিয়া

পুরুষ-শ্রেষ্ঠের সেই শ্রীমুখ-দর্শনে,

কতু কণেকের তরে  
 বাঁহা বাঁহা নাহি করে  
 দেবরের প্রিয়কেন্দ্র তীর্থাদি গমনে,  
 যা' বলুক সেই জাতি  
 প্রভুর বিদেবী অতি  
 সে "ও তৎসৎ" বানৌ আধি বন্ধ করে'  
 কি নব ভজনা করে, ধিক্ ভজনারে।

প্রীতাঃ সন্তি য এব বিল্বতুলসী-পত্রেণ মন্মথেন বা  
 ধ্যানেনাপি য এব দত্তমপি চেদু ভক্তেন ভোগ্যাদিকম্  
 নো মুক্তা বিতরন্তি বাঞ্ছিতফলং ভক্তায় ভক্তিপ্রিয়ান্  
 তান্ দেবান্চ মন্যতাং ন ভজতাং হৈষঃ পরং ত্যজ্যতাম্।

মর্থার্থ।

দেবের সন্তোষ কত তুলসীর দলে  
 সন্তোষ বৃক্ষের পাতা বিদগড় দিলে,  
 তা'ও যদি হয় ভার  
 মন্ত্র মাত্র জগ' তাঁর,  
 তন্ত্র, মন্ত্র, তা'ও ভূমি কিছু না জানিলে -  
 করে' মাত্র অধিষ্ঠান  
 ত্রিমূর্তির কর ধ্যান  
 দেবতাগণের তাহে সন্তোষ উৎপলে;  
 অর্পিলে নৈবেদ্য কতু  
 লবে না, ছোবে না প্রভু,  
 ভক্তের অর্পিবে যত অতীপ সিত-কলে :

তাদের সমান ভাই  
আর ভক্তিপ্রিয় নাই,  
মানিও না, ভজিও না সে দেব-নিকরে,  
প্রাণের বিদ্রোহ মাত্র দিও ভাই ছেড়ে ।

ধ্রুবে প্রজ্জ্বলিতা ভগবদনুকম্পাঙ্কিত কথ্য  
শ্রুতা শ্রোত্রে শ্রুত্বামমৃত-রসরাশিঃ বিতরতি ।  
তবাস্মিন্ বিদ্রোহো বিঘবদমৃতাস্বাদিনি রসে  
ন জানীমঃ কৌণ্ড্যং বুধবর বিকারঃ সমজনি ॥

মর্ম্মার্থ ।

কব কি প্রজ্জ্বলিত আদি জন্মিয়া ধরায়  
শ্রীমুর্তি ভজিয়া পেল কতনা রূপায় !  
সে সব কাহিনী শুনে  
সুধা ঢেলে দেয় কাণে,  
তোমার হ'তেছে তাহে বিদ্রোহ উদয়,  
হায় রে বিবের মত  
অমৃতে বিদ্রোহ এত,  
না পারি বুঝিতে কিছু, হয়েছে তোমার  
বুধবর উপস্থিত কি ঘোর বিকার !

ভায়রর মহাশয় ব্রাহ্মণ-নিষ্ঠার পক্ষপাতী একেবারেই নহেন ।  
কেহ ব্রাহ্মণের উপর আক্রোশ প্রকাশ করিলে তাহা তিনি শ্রবণ  
করেন না । কোনও গ্রন্থে ব্রাহ্মণের উপর কটাক্ষ থাকিলে তাহা  
তিনি পাঠ করেন না । ব্রাহ্মণেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় অমুঠাশী নহেন

বটে, কিন্তু গায়ত্রীত্যাগ অনেকেই করেন নাই। যে ব্রাহ্মণ ত্রৈকালীন গায়ত্রী জপ করেন, তাঁহার নিন্দার পাপ আছে। জ্ঞানরত্ন মহাশয় বলেন, ইহকাল পরকাল উভয়েই বিশ্বাস রাখা হিন্দুর প্রয়োজনীয়।

কলিতে গৃহস্থাত্মমেরই জ্ঞানরত্ন মহাশয় অধিক পক্ষপাতী। তাঁহার শিষ্যশাখার মধ্যে বা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেহ ঐহিক-আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যদি আশ্রমাস্তর অবলম্বন করিতে চাহেন, জ্ঞানরত্ন মহাশয় তাহাতে কখনও অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন শৌক্যকালীন বৈরাগ্যকে, বৈরাগ্য সংজ্ঞা দেওয়া অপেক্ষা বিকার সংজ্ঞা প্রদান করাই অধিক প্রয়োজনীয়। ধর্মোন্নতি সাধনই যদি উদ্দেশ্য হইবে, সংসার-প্রমই সে কার্যসাধনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। সংসারপ্রমে পাপ করিলে অনেক পাপের শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত সহজ। কিন্তু আশ্রমাস্তরে পাপ করিলে অনেক পাপ বজ্জলেপবৎ কঠিন। সংসারপ্রমে দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ নিগ্রহ করিবার ব্যবস্থা নহে। অন্য আশ্রমে মুহূর্তের জন্যও ইন্দ্রিয়ার অধীন হইলে মহাপ্রত্যাবার। সংসারপ্রমই সকল আশ্রমের প্রতিপালক। সংসারপ্রমেও ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা হইতে উত্থান করার পর হইতে, রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত, অহুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। সংসারপ্রমও স্বর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সক্ষম। জনক, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জরৎকার প্রভৃতি বহু মহর্ষি সংসারপ্রমে থাকিয়াই তপস্যা করিতেন। আশ্রমাস্তর অবলম্বনের স্পৃহা বৈরাগ্য অপেক্ষা বহুক্ষেত্রে বিকারেরই অধিক পরিচায়ক, ইহা জ্ঞানরত্ন মহাশয়ের মত। বিশেষতঃ কলিকালে সকল আশ্রমের বৈধতাই তিনি স্বীকার করেন না। গৃহস্থাত্মমের প্রাংশা ব্যাসদেবও কালীধামে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা, “চতুর্দশমপাশ্রমাণং কোংতীয শ্রেয়সে সভাং। বস্তুন্ প্রাপ্নোতি

সংকুলে পরজ্বেহত বা সুখং ॥ ইদং শ্রেয়স্তি দং শ্রেয়স্তি দত্ত মুকরং  
ভবেৎ । ইখং সৰ্বং সমালোডা গার্হস্থ্যং প্রশংসতু ॥ ব্রহ্মচারী  
গৃহস্থোবা বানপ্রস্থোহথ তিষ্ককঃ । এষামাধার ভূতোহসৌ গৃহস্থো-  
নাত্তথেষ্টিচ ॥ দেবৈ ম'মুৰৈঃ পিতৃভি ত্বিৰ্য্যগ্ভি শোপজীব্যাতে ।  
গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মান্তস্মাক্শৌগৃহাশ্রমী ॥



# দশম পরিচ্ছেদ ।



সর্ববিষয়ী প্রতিভা । আদিরসের কবিতা । শ্লিষ্ট  
কবিতা । কাব্য-মোহে বিভার বাধাত সম্ভাবনা ।  
মোহভঞ্জন দশকং । রাজরাজেশ্বরী স্তোত্রং ।  
ঋষিগ্রন্থ আলোচনার্থ যুবকগণের  
প্রতি উপদেশ ।

সংস্কৃত-কবিত্যাংশে জ্ঞানরত্ন মহাশয় নৈমধীর রীতিরই অধিক  
গন্ধপাতী । তিনি শ্রীহর্ষের কবিতা যত ব্যবহার করেন, এত আর  
কাহারও কবিতা ব্যবহার করেন না । জ্ঞানরত্ন মহাশয় বলেন, যে  
কবি দার্শনিক, তিনি কবিত্ব-বিকাশের স্থলসমূহ যেমন নির্বাচন  
করিয়া লইতে পারেন, অন্য কবি তদ্রূপ পারেন না । এ কারণ,  
বহু কবির শক্তি, মাত্র কুঞ্জ-কোকিল-কামিনীর কমণীয়াতা বর্ণনেই  
পর্যাপ্ত । জ্ঞানরত্ন মহাশয় নিজ কবিত্ব-শক্তিকে ঐ কার্যে নিয়োজিত  
করিতে চাহেন না । তথাপি তিনি যে ঐ সকল বর্ণনায় শক্তি ধারণ  
করেন না, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন । যে ঘটনায় যে  
রসের কবিতা রচিত হওয়া উচিত হয়, জ্ঞানরত্ন মহাশয় সেই ঘটনা-  
স্থলে সেই রসের কবিতাতেই প্রতিভার উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন ।  
কালীবিহার্য্য বিবাহান্তে তিনি যৎকালে স্বস্তুরালয়ে গমন করিতেন,

পল্লীস্থ জীলোকগণ আসিয়া চিরপ্রচলিত নিয়মামুসারে সম্প্রদর্শিত হস্ত পরিহাস করিত। অপেক্ষাকৃত অনবয়সী কেহ কেহ বা দূরে অবস্থান করতঃ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতেই আবশ্যকমতে রহস্য করিতেন। ঐরূপ একটি রসিকা জীলোককে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবার জন্য অসুরোধ করার ছলে, ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই বাল্যকালে রহস্য পূরক নিম্নলিখিত রসিকতাপূর্ণ কবিতাটি রচনা করেন এবং ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া তথায় জীলোক-মহলে হাসি ছড়াইয়া দেন।

নৈপুণ্যে সুসাধিতে রচনাং কৃৎবা বিরিশ্চিহ্নং  
 পূৰ্ণেন্দোরবিন্দ-কুন্দ-তড়িতাশ্চান্যান্য শোভামৃতাঙ্গা ।  
 সূৰ্ত্তিঁ তে সমকল্যয়ন্ সৃদুতনো মৰ্ত্ত্যে কীৰ্ত্ত্যায়  
 তামাচ্ছাদ্য হি বাসসা বিধিযশো-হিষো ন তে শোভতে ॥

মৰ্ম্মার্থ ।

যা' কিছু সুন্দর ভবে                      সৃজন করেন তবে  
 প্রপমেই ধাতা পদ্মযোনি,  
 সৃজিলেন শশধর,                      গড়িলেন মনোহর  
 অরবিন্দ, কুন্দ, সোদামিনী ।  
 সুন্দর সামগ্রী যত                      করে' করে' অবিরত  
 সিদ্ধ হ'ল নৈপুণ্য ধাতার,  
 সৰ্ব্বশেষে ও সুন্দরি !                      পাকা হাতে চেষ্টা করি'  
 ও বরাঙ্গ গড়িয়া তোমার—  
 পাঠলেন ধরা পরে                      মৰ্ত্ত্যে কীৰ্ত্তি রাখিবারে,  
 সেই তত্ত্ব রেখে বসে চেষ্টক—



নিরন্তর এমন ধারা      বিধি-বশে ঘেব করা  
ওলো নারি ! সাজে না তোমাকে ।

ঐ সময় আরও একটি কবিতা রচিত হইয়াছিল ।

বিষ্মীষ্টি নিষ্পতক-নীরস-পাদপাদী  
সর্পেণ্যপি সর্পতি সৃগাঙ্গি তবাঙ্গি যুগ্মম্ ।  
জানাশি মাং কিমু ততোঃপ্যধমং সগৰ্ভম্  
যস্মৈ স্ময়াঙ্কি কুরুষে ময়ি দৃষ্টিরোধম্ ॥

মর্ম্মার্থ ।

বিষ-ওষ্টি ! বড়ই মিষ্টি, এইটি দেখি চোখে,  
তেতোর গুরু, নিমের তরু, মুখ ঢাক' না দেখে !  
নাই লো মিঠে, শুকনো কাঠে, দেখতে তা'ও হয়,  
সাপ খেলালে, তা'ও সেকালে, ঘোমটা খোলা রয় !  
ওলো ধনি, গরবিনি, তোর চোখে কি দীন  
সাপের চেয়ে, কাঠের চেয়ে, নিমের চেয়ে হীন ?  
একি ভঙ্গি, তোর কুশাঙ্গি, আমি প'ড়লে চোখে  
ফেল অমনি, বদন খানি, ঘোমটা দিয়ে ঢেকে !!

যে প্রতিভা কেবলবাত্র মর্ম্ম সঞ্চকীয় রচনার ক্ষুর্তি পায়, সে  
প্রতিভা প্রতিভাই নহে । যে প্রতিভা কেবল আদিরস-বিবরক  
রচনার ক্ষুর্তি পায়, সে প্রতিভাও প্রতিভা নহে । যে প্রতিভা  
লোকের মর্মান্তিক বেদনার রচনার কেবলমাত্র নিরোজিত হয়,  
তাহাকেও উৎকৃষ্ট প্রতিভা বলি না । যে প্রতিভা সকল বৃত্তির  
রচনার উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, তাহাই যথার্থ কবি-প্রতিভা ।

ভ্রামরর মহাশয় যে বিষয় লইয়াই চিন্তা করিয়াছেন, তাহাতেই নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। তাহাতেই স্বীয় অসীম ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এক বহু যৌবনাবস্থায় পত্নীর সহিত কলহ করিয়া বিদেশে চলিয়া যান। ভার্য্যা কাতরা হইয়া পড়িলেন, স্বামী কিছুতেই গৃহে ফেরেন না। নিদাঘ-শুষ্কা কোনও সরসীর হ্রদবস্থা রবিকে জানাইবার ছলে, ভ্রামরর মহাশয় নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়া, উক্ত বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

হৃদ্যে পঙ্কজ-কোরকে তব করে ভঞ্জেঃপি যা মোদতে  
নো সুস্বেত্তব সঙ্কমং দিনপতি যাবদু ভবাঁল্লক্ষ্যতে।  
কিন্মখেণা ভবতৈব সন্ততমহৌ সন্তাপ্যতে শোখ্যতে  
দুর্নীতিঃ সরসীং প্রতীতি তপনে বহ্নং ন কৈঃ শক্যতে ॥

মর্থার্থ।

দিবাकर তব প্রীতি সরসীর কিবা প্রীতি,  
শোভা করে' বন্ধের উপর  
উঠিলে পঙ্কজ-কলি করে দল' দলগুলি  
তবু তার প্রীতি নিরন্তর।  
দয়শন হলে পরে কভু না তোমারে ছাড়ে,  
অল্পরাগে সদা মুগ্ধ থাকে,  
কতই মমতা ভরে প্রতিবিষ বৃকে করে'  
সবতনে নিরবধি রাখে।  
ছি ছি রবি কোন্ পাশে তারে নিদাঘের তাপে  
দগ্ধ ভূমি কর নিরন্তর,

যুধা এত দাও আলা      কি দোষী সরসী-বালা,

এতই কি ভাল দিবা কর !

কর ইচ্ছা যা' তোমার      বত দোষ অধীনার

প্রবলারে দোষী করে কেবা,

তাই সরসীর প্রতি      তপন তোমার নীতি

ভাল, ভাল, ভাল পেলো শোভা ॥

নৈয়ামিকগণের সিদ্ধান্ত এই, জল ও ক্ষিতি উভয় দ্রব্যেই চতুর্দশ গুণ বর্ত্তমান । তন্মধ্যে পার্থক্য এই, জলে স্নেহগুণ অবস্থিত, ক্ষিতিতে তৎপরিবর্ত্তে গন্ধ বিরাজিত । প্রমাণ যথা, 'স্নেহহীন গন্ধযুক্তা ক্ষিতাবেতে চতুর্দশ' দার্শনিক কবির আদিরসের কবিতাতেও পদার্থ-তত্ত্বের অপলোপ হইবার সম্ভাবনা নাই । রমণীর মুখ বর্ণনায় ঠাণ্ডারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,

নীরাংশ-নির্ম্মিত-শশী সুস্বয়ত্বশিখা

মাং তাপয়ত্বনুদিনং বদনং ত্বদীয়ং ।

তু্যে গুণস্য গণনেঽপি সতি স্বতন্ত্র

অহী গুণোঽস্মি বিবহী ধ্রুবমর বীজম্ ॥

মর্ম্মার্থ ।

জলেতে ক্ষিতিতে, শুনে দার্শনিক কাছে,

সংখ্যায় সমান গুণ উভয়েতে আছে,

ওলো বালা, ও মুখের তুলা সুধাকরে

কবিদলে কুতূহলে দেখি সদা করে ;

কিন্তু কি আনন্দ সখি দেয় সুধাকর,

ও মুখের বাক্য মোর শুধু নাহকর ;

কবিদলে শুনেনি লো হইয়া নিপুণ,  
জলেতে ক্ষিতিতে থাকে সতত কি গুণ ;  
মেহগুণ জলে থাকে, ক্ষিতিতে না রয়,  
তোমার ক্ষিতির মুখ, শশী জলময় ॥

কবিরা চিরকাল চন্দ্রমার সহিত রমণী-মুখমণ্ডলের তুলনা করিয়া আসিতেছেন। দার্শনিক-কবি সে মীমাংসা মঞ্জুর করিলেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ পরিপকতা সর্ববিষয়েই পরিদৃষ্ট হয়। ‘সিন্দূরবিন্দুবিধবাললাটে’ (অর্থাৎ বিধবার কপালে সিন্দূর-চিহ্ন) এই চরণ লইয়া তাঁহাকে একবার সমস্তা-পূরণ করিতে দেখিয়া হয়। বাক্যটি অসঙ্গতি-দোষাক্রান্ত হওয়ার প্রাচীন কোন কবি (১) সিন্দূর-বিন্দু, (২) বিধবা, (৩) ললাটে, এই তিন অংশ পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করিয়া প্রাপ্তোত্তর ছলে কোনও রকমে সমস্তা পূরণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্তা-পূরণ সংস্কৃত সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে অনেকে পরিজ্ঞাত আছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কিন্তু সমস্তা-পূরণ কালে অসঙ্গতি-দোষ পরিহার পূর্বক, বিধবার কপালেই সিন্দূর সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। যথা,

ধবাকুলীনা ধব-সঙ্কমার্থ  
দিগম্বরত্বাদ্ বিধবা নিশীথে ।  
নিতম্বিনী ভাতি, ন ভাতি কস্মাৎ  
সিন্দূর-বিন্দুবিধবা-ললাটে ॥

মর্মার্থ।

‘ধব’ মানে ‘বসন’ টেনে, এক হেয়ালি কই  
এ’ রচনা, বৃদ্ধনা, করবে না কি সহি ? \*

নিশা কালে, নারীকূলে, ধবের কোলে যায়,  
 এক ধব তাঁর রাখে কোলে, আর ধব না রয় ।  
 সেই সধবা, হয় বিধবা, দেখ'বি গো সেই কালে  
 সীথের আঁটা, সিঁদুর কোটা, রয় বিধবা-ভালে ॥

যিনি রচনাশক্তির দ্বারা এইরূপ সকল রসের রসিককেই আনন্দ  
 প্রদান করিতে সমর্থ, তাহার শক্তি সর্ববিধাঙ্গিনী । জ্ঞানরত্ন মহাশয়  
 কোনও স্থলে লিখিয়াছেন—

নো বেদ্বি চন্দ্রবদনে নয়নদ্বয়ন্তে  
 কিং ভাস্করস্য কিয়দংশময়ং কিমিন্দোঃ ।  
 দগ্ধো হতোঽস্মি পতনে যদস্য রশ্মেঃ  
 স্নিগ্ধো ভবন্ ভজতি কোঽপি পরং প্রমোদম্ ॥

স্বার্থ ।

বুঝি না গো নেত্র তব অগ্নি চক্ৰাননে,  
 রবি কি বিধুর অংশে নিরমিলা বিধি ।  
 আমি দগ্ধ হ'য়ে মরি রশ্মির পতনে,  
 স্নিগ্ধ হ'য়ে কেহ নাশি ভুঞ্জে নিরবধি ॥

এই সময় একটা প্রাচীন ইতিবৃত্ত স্মরণ হয় । একজন সন্ন্যাসী  
 একদা একটা পরমাত্মনরী স্ত্রীলোক দেখিয়া আসিয়া, কোনও রাজার  
 নিকট অসাধারণ কবিতা দ্বারা তাহার রূপ বর্ণনা করেন । যে  
 ব্যক্তি যে রসে রসিক নহে, সে ব্যক্তি দ্বারা সে রসের সুন্দর কবিতা  
 রচিত হওয়া অসম্ভব, রাজার এইরূপ ধারণা থাকায় সন্ন্যাসীকে  
 তিনি ডাঙ বুলিয়া অশ্রদ্ধা করিলেন । দৈবক্রমে কিছুকাল পরে

সেই রাজারও নিজের উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তি জন্মিল। সেই সময় উক্ত সন্ন্যাসী রাজার সহিত দেখা করিয়া কবিতা দ্বারা দরিদ্র-ব্যক্তির কাতরোক্তি বর্ণনা করিতে রাজাকে অহুরোধ করিলেন। রাজা দরিদ্র ব্যক্তির কাতরোক্তি এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিলেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই সময় সন্ন্যাসী রাজাকে বলিলেন “মহারাজ আপনি রাজা হইয়া, যে শক্তির প্রভাবে দারিদ্র্য-বর্ণনায় সমর্থ হইয়াছেন, আমি সন্ন্যাসী হইয়া সেই শক্তি দ্বারাই আপনার নিকট রমণীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া-ছিলাম।” প্রকৃতই, যিনি প্রতিভাশালী কবি তিনি সকল প্রকারের কবিতাতেই রস করিয়া তুলিতে পারেন।

শ্রীহর্ষাদি মহাকবিগণ ঘোর অতিশয়োক্তি দ্বারা দময়ন্তী প্রভৃতির রূপ-গুণাদির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তদর্শনে বাল্য-কালীন সহৃদয়তা নিবন্ধন প্রিয়-বয়স্শগুণের অহুরোধে পূর্বে কোনও সময় ন্যায়রত্ন মহাশয় ‘নারীগুণাদি বর্ণনঃ’ নামে কতকগুলি কবিতা রচনা করেন। সে সকল রহস্তোদ্দীপক কবিতা পাঠ করিলে হান্ত সঞ্চার করা যায় না। কাব্যরসজ্ঞ কোনও নূতন লোক তাহার লিপিভঙ্গি, পরিপক্বতা ও রসিকতা দৃষ্টি করিলে, শ্রীহর্ষাদির রচনা বলিয়াই তাহার ভ্রম হইবে। ঐ সকল কবিতা ‘রসরত্নঃ’ নামক কবিতা গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। নিম্নে তাহা হইতে দুই চারিটি কবিতা উদ্ধৃত হইল। কবিতাগুলির প্রথমাংশের উৎকট বর্ণনা, শেষাংশে অল্পময় উপদেশাবলীতে পর্যাবসিত হইয়াছে।

কামিন্যুত্কট-বর্ণনাসু পদুতা যৈ যৈ: সহায়ীকৃত্য

তৈ লৈ সত্ৰকবয়োঃস্বতো রসমযো য: কালিদাস; কাকি; ।

ग्रीहर्षस्तु ततोऽपि सत्कविरतः काव्यादयशःकाम्यया  
सौन्दर्यादिक-वर्णना-विहृतयो नार्या हि कार्या मया ॥

देवैश्च मन्दर-पुरोग-पुरन्दराद्यै

धिंज् सिन्धुमन्थनमनुष्ठितमिष्टसिद्धौ ।

वाचो विनिन्दित-सुधा वसुधातरुण्या

नास्त्राद्य ते तु विवुधा न तुषेषु गण्याः ॥

विश्वोदभवास्यदभवेऽतिचिरन्तनत्वा

चम्पास्वराद् भुजगभस्म-विभूषितत्वात् ।

मालिन्ध-लक्ष्म रमणीभिरलक्ष्यभावात्

तत् सन्धवेदहि-विषाक्षहि विश्वनाथे ॥

शीतांशुमण्डल-समत्वमदूरदर्शी

पश्यत्यशेषगुणभाजिनि योषिदास्ये ।

हास्यास्पदं किमिदमेव न तस्य यस्मात्

शोभा नभःकमलवज्जलमण्डलत्वात् ॥

शङ्खे कथं कमल-कोरक कुञ्जरोय-

कुम्भादिके कुलवती-कुचसाम्य-लेशम् ।

शृङ्गं गिरेः कठिनतोन्नतितो यदेषां

क्लेशानलं शमयितुं तुहिनाचलस्यम् ॥

क्षीणं समीच्या शुमुखी-धृत-मध्यदेशं

स्नापेद्यथा क्षितितले निम्बिलाणवस्त्रे ।

संलज्जिताः किमपरं परमाणवोऽपि

वज्रजया जगति मेजु रतीन्द्रियत्वम् ॥

पादाब्ज-मार्जन-वशेन सरोवरान्तः  
 कान्तामलाद् विगलिताद् धृतपङ्कभावात् ।  
 पङ्केरुहस्य जननं निजवोज्ञ-साम्यात्  
 श्रुत्या मलात्तु मधुकैटभवम्भुरारिः ॥  
 नारी-सुवाहुज-मलेन मृणाल-जालं  
 सूतं तदीय-कमनीय-कुचद्वयोत्थम् ।  
 यत्तन्मलेन कमलस्य च कीरकाणि  
 शैत्यादिकानि सलिले तनु-सङ्गजानि ॥  
 यद्यन्मलं स्मितमुखी-मुखमण्डलस्थं  
 बन्धुत्वमेव विदितं पतितेऽपि तस्मिन् ।  
 तन्मूलकं जगति किञ्चन जायते चेत्  
 संसार-सारतर-तत् सुरदुर्लभं स्यात् ॥  
 ख्याताति सुन्दरतयैव रतिः स्मरश्च  
 यत्तत् परं परवतीभिरतीव सङ्गात् ।  
 तद्गोतनाभिरभिदीप्ततमौ यदेतौ  
 संसर्गजात-गुणजात समश्चितौ वा ॥  
 स्वेदादिजात-तरुणीतनु-पूतिगन्धो  
 ऽप्याकर्षति भ्रमरितं हि विदग्धचित्तम् ।  
 का मार्ज्जने सति कथा वपुष स्तदस्याः  
 किंवास्ति शस्ततम-वस्तु यदस्तु तुल्यम् ॥  
 धिक् कुर्वतां नव-मधूनि वधूमुखस्य  
 लालाशयापि शतशश्च सदाशयानाम् ।



तत्प्रीतिसाधन-तपश्चरणं तदस्याः  
 किंवास्ति शस्ततम-वस्तु यदस्तुतुष्यम् ॥  
 यन्नापविच-मलमूत्र-विराधिवास  
 स्तस्मिन् घृणास्मद-पदेऽपि सदा विलासः ।  
 शुद्धात्म-वृद्धतम-सत्कृतिनां तदस्याः  
 किंवास्ति शस्ततम-वस्तु यदस्तु तुष्यम् ॥  
 कान्ताश्च विद्धि विवुधैरपि नोपमेया  
 मेषा जिवर्ग-परिहारापि यतो न हेया ।  
 देवा दिनेश-गिरिजेश-गणेशमुख्याः  
 सर्वार्थदा अपि न वे रसिकैरलक्ष्याः ॥

भक्तविद्यानं उ भावमाधुर्यं गुणं श्रावणं भक्त्यात्वेन व्रतितं मागानां  
 अष्टछेपं छन्दसं श्लोकं किरूपं सूक्तं इहैव धाक, 'गङ्गा' विषयक  
 कविकृति कविता निम्न उक्तं करिष्ये तांशं अपरिचितं इहेन ।

भव-वारि भवदवारि नाम ते यामभीहरम् ।  
 कोऽनुमाता जगन्मातः कतमस्ते गुणः पुनः ॥  
 भव-वन्धन-युक्तासि जटया जगदम्बिके ।  
 भव-वन्धन-हन्त्री त्वं भवद्भावोऽयमज्ञतः ॥  
 अमृतं परतरं जज्ञुजे सिन्धुजादपि ।  
 तस्यादमर एव स्वाहोयदेव स्तवास्ततात् ॥  
 सुपर्णादिव सर्वज्ञात् विज्ञीर्यत् परमं पदम् ।  
 हेतुस्तौ तत्र सव्यवस्थायां मातरुपास्तहे ॥

সুলভং মলমসরাপি ত্বত্পদ্যঃ স্মৃ যতোঃ স্মৃ  
মিরসা তত্স্ময়ামি ত্বাং মাতর্গন্ধে প্রসীদতি

ভায়রত্ন মহাশয়ের রচিত শ্রীচৈতন্য-কবিতার মধ্যেও সার্বভৌম পূর্ব

মাতর্মমাতিতমসাবৃত মায্যবিদ্যে  
চেতোঃসিত কুত্সিতচিত্তাশ্রিতমীশঙ্কয়ে ।  
নান্দ্যে স্ময়ন্তু চুণয়ন্তু সুরাঃ শরণে  
নোপিচ্ছ্যমদ্র নটনং তব দম্বকন্যে ॥

“হে শিবরূপবিশারিণি মাতঃ কালিকে ! আমার চিত্ত তমো-  
গুণাচ্ছন্ন ও অতি অপকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন। এই চিত্তকে ঘৃণা করিয়া অস্ত্র  
দেবতারার স্পর্শ করেন না। না করেন, নাই করুন। কিন্তু তুমি  
যে আমাদের মা। অতএব তুমি এই চিত্তে নৃত্য করিতে ওদাস্ত করিতে  
পারিবে না।” অন্ধকারময় অশানক্ষেত্রে কালী নৃত্য করিয়া  
থাকেন। বাহুদৃষ্টে পূর্বোক্তরূপ অর্থ হইলেও শ্রেষে ঐ বাক্য দ্বারাই  
নিজের চিত্তকে অন্ধকারময় অশানক্ষেত্র সাজান হইয়াছে। ‘তমসাবৃত’  
এই শব্দের দ্বারা যেমন ‘তমোগুণাচ্ছন্ন’ অর্থ করা হইয়াছে, সেইরূপ  
‘অন্ধকারাচ্ছন্ন’ অর্থেরও উহার দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে। ‘কুৎসিত-  
চিত্তাশ্রিত’ শব্দের যেমন ‘কুৎসিতজ্ঞান-বিশিষ্ট’ অর্থ করা হইয়াছে,  
সেইরূপ ঐ বাক্য দ্বারাই ‘চাণ্ডালাদি-কুৎসিতজাতির চিত্তাধারা  
সম্বন্ধিত’ ইহাও বোধ হইয়া থাকে। অতএব বাগ্ভট্ট দ্বারা নিজের  
চিত্তকে অন্ধকার পূর্ণ, চাণ্ডালাদির চিত্তা দ্বারা সম্বন্ধিত অশানক্ষেত্র-  
রূপেও শ্রেষে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হেতুই উক্তকবি বলিতে  
পারিয়াছেন “অস্ত্র দেবতারার ঘৃণা করিয়া স্পর্শ করিবেন না। নাই

করুন । এই শব্দে । যে স্বকরালিকে । এই চিত্রে নৃত্য করিতে তুমি  
ওদাত্ত করিতে পারিবে না ।” সংস্কৃত শ্লিষ্ট কবিতার ভাব ভাষান্তরে  
বাহির হয় না । সংস্কৃতক ব্যক্তিগণই ইহার মাধুর্য অমূল্য করিবেন ।  
আমিরমের কবিতাও এইরূপ আছে ।

স্তাস্ত্রী সখি সখ্যকর্মসু রতা মর্দ্যস্বাঘোপন  
স্তাপ্যং প্রাপয়সীতি মাহুয়জনপ্রীতিং ন কিং সাধয়েত্ ।  
বিষ্ণুশো বররাজকুমার-করাঘাতেন সখ্যস্তান-  
প্রিয়ঃপঙ্কজকীরকং তবনবং ভঙ্গাপদং প্রাপয়ন্ ॥

কোনও অবিবাহিতা বরঃবা রাজকন্যাকে তাঁহার সঙ্গিনীগণ  
বলিতেছেন “সখি আমরা তোমার সখ্য কর্ম করিয়া থাকি । তুমি আমা-  
দের নিকট নিজের মর্দ্যবাধা গোপন করিয়া আমাদের কাছে দিতেছ ।  
অতএব অগবীষন করুন, উপবনে তোমার মাথের যে পদ্ম-কলিকা  
অগ্নিরাছে, প্রবল রাজ-হতী আসিয়া শুভাঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া  
দিয়া অচিরেই আমাদের প্রীতি সম্পাদন করুক ।” বাহ্যভাবে এই  
অর্থ আসিলেও কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাব অন্তরূপ । অবিবাহিতা  
রাজকুমার মর্দ্যবাধা বুঝিয়া সখিরা তাঁহাকে হুমসাতার দিতেছেন  
“রাজকুমার অর্থাৎ প্রবল রাজা সখরই তোমার বর হইবেন । সে  
পক্ষে ‘করাঘাতেন’ ‘মদ্যস্তন’ প্রভৃতির ব্যাখ্যাস্তর করতঃ শ্লোকটির  
অন্যরূপ অর্থ করিতে হইবে ।

এইরূপ শ্লিষ্ট কবিতা ন্যায়রস মহাশয় অনেক সময়েই ব্যবহার  
করিয়াছেন । সপ্রাক্ত ব্যক্তিগণকে যে সকল কবিতা উপভোজন  
করিয়াছেন, তন্মধ্যেও প্রায়শঃই এইরূপ স্থলর ব্যর্থকতা পরিলক্ষিত  
হয় । বলা, —

दुःसाधवैधमहनावगमसिंहाय  
ताताञ्जयाति शुभलक्षणं सेवितोऽयं ।  
भूजावाधाप्रशमने नियतव्रतश्री-  
युक्तः सदा विजयतां रघुराजसिंहः ॥

( त्रेण्मात्रं मादेकं महाशक्तिं ७२३३  
मिश्र-मन्त्रिधाने पठितः । )

भूमृतसरो विजयतां जगतां हितार्थं  
नैर्मलप्रभाजि करुणासलिलैर्विराजि ।  
यस्मिन् विराजति सदा कमलेशपाद  
स्तस्मिन् सिंहाय न भवेत् कमलोदयः किं ॥  
गम्भीरतामुणसुशीतलतेकसप्त  
पद्मोदयादवनतोक्तृतराजहंसः ।  
नित्यं द्विजालिपरिसेवितं शोभमानं ।  
यदयामग्रहश्च शरणन्तु सरो द्विजस्वात् ॥

( पातिशान्तिं मादेकं महाशक्ति-  
मन्त्रिधाने पठितः । )

त्रेतायां स्वयमीश ऐशविभवात् पृथुशवेशं भजन्  
यस्मात् प्रार्थयतेऽप्येतृकगुरोराशोः शतं सन्ततं ।  
तद्देवर्षि-वशिष्ठवंशजमया श्रीमत्सुजीवाशया  
दत्ताशोः किमुपेक्ष्यते क्षितिपते सन्तानं सीतापतेः ।  
श्रीमन्माधवदीनवास्यवधराधीशस्य वासुदेवो  
यत्स्थानं परमारमावहुसमाप्नोति च यत्र स्वर्गः ।

पद्मामाश्रमयोश्च विष्णयकरो विष्णुश्च वेश्मावलो  
मायङ्गे किमिदं यदं जयपुरं गोलोकलोकौऽथवा ॥

( জয়পুরের বর্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মাধব  
সিংহ-সন্নিধানে পঠিত । )

কবিতায় নেশা বড় গুরুতর নেশা । কত কত বুদ্ধিমান্ যুবক  
এই নেশায় পড়িয়া শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করতঃ ভবিষ্যৎ  
উন্নতির পথ রোধ করিয়াছেন । প্রাচীন বাক্যও আছে “শাস্ত্রং  
কাবোন হনাতে।” ত্রায়শাস্ত্র-পাঠাবস্থায় কবিত্বের নেশায় পড়ায়  
এক সময় ত্রায়রত্ন মহাশয়ের ঐ শাস্ত্রে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সমূহ  
বিঘ্ন হয় । যুবক নারায়ণ মহাশয়কে ভাটপাড়ার ভবিষ্যৎ আশা-  
স্থল বলিয়া ৬ হলধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের তৎকালে  
বিশ্বাস ছিল । সেই ত্রায়রত্ন মহাশয়ের, পাঠে ঐরূপ বিঘ্ন উপস্থিত  
দেখিয়া, পঠদশায় কবিতা রচনা পরিত্যাগ করাইবার অভিপ্রায়ে ৬ হল-  
ধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ত্রায়রত্নমহাশয়কে খোরতর তিরস্কার করেন ।  
তদবধি প্রতিজ্ঞা করিয়া কবিত্বের ষাঁক ত্রায়রত্ন মহাশয় কতক  
কমাইলেন । তথাপি কবিত্ব শক্তি এমনই সামগ্রী যে, উচ্ছ্বাস উপস্থিত  
হইলে তাহা দমন করা যায় না । একারণ, কি ভক্তি, কি রসিকতা,  
কি উপদেশোচ্ছ্বাস, যখন যে বিষয়ে উচ্ছ্বাস আসিয়াছে বাধ্য হইয়া  
ঐহাকে সেই বিষয়ে রচনা করিতে হইয়াছে । কোনও মনোরম  
স্থান বা ভীর্থাদিতে গেলে সুন্দর ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন ।  
সম্রাট রাজা জমীন্দার গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় কবিতা  
উপহার দিয়াছেন । ইরোপ আমেরিকা হইতে সংস্কৃত-সেবী  
সাহেবেরা ভারতে সংস্কৃত-চর্চা দর্শন করিতে আসিয়া, যখন যিনি  
নারায়ণ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সকলকেই উৎকৃষ্ট

উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা অভিনন্দিত করা হইয়াছে। জায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ সমগ্রজীবনের রচনা যদি সংগৃহীত থাকিত, তবে তাহার সমষ্টি যে কত হইত বলা যায় না। কিন্তু কবিষ্ট প্রচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা জায়রত্ন মহাশয়ের না থাকায়, তিনি ঐ সকল কবিতা যত্ন করিয়া রাখেন নাই। যখন যে কবিতা করিয়াছেন, মিকটস্থ বাক্য ও ছাত্রদিগকে দেখাইয়া কয়েক দিন আমোদ করিয়াছেন মাত্র। জায়রত্ন মহাশয়ের আশ্রয়িত তন্ত্রের পুথি, স্মৃতির পুথি, ন্যায়ের পুথি প্রভৃতি অশেষ করিলে তাহাদের আশে পাশে ছেঁড়া কাগজে লেখা, তাঁহার রচিত বহুতর পুরাণ কবিতা পাওয়া যায়। জায়রত্ন মহাশয়ের বৈরাগ্য-বিষয়ক কবিতা বা দেবদেবীর স্তব দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, শ্রদ্ধাচাৰ্য্যাদিও বৃষ্টি সেরূপ স্তবাদি রচনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু নম্না স্বরূপ ‘মোহভঞ্জন দশকং’ এবং ‘রাজরাজেশ্বরী স্তোত্রং’ প্রদত্ত হইল।

### মোহভঞ্জন দশকম্।

ভয়ানে নবনির্মিতৈ ধবলিতৈ সৌধৈ সদাবস্থিতং  
নৃত্যৈশ্চিত্তবিনোদকারিতল্লণীসংঘেন সংসেবিতম্।  
নিদ্রাবেশবশেন মুদ্রিতদৃশ্যং মামেকদৈকঃ পুমান্  
যাং যাং বাচমুবাচ বিস্ময়করৌ তাং ভ্রাতরাকর্শয় ॥ ১ ॥

সম্মার্থ।

ধবলিত সৌধমাঝে নবীন উদ্যানে,  
চিরস্থখে বাস করি হরবিভ বনে।  
নৃত্যগীত-বিনাসেতে মোহি' অধিরল,  
চারিদিকে সেবা করে বিগাসিনী দল।

অপূর্ব-মৌনব্যাম্বল সে অপূর্ব-হানে  
এভাবে পরমসুখে আছি মুগ্ধ-মনে ।  
একদা মুদ্রিত অঁখি হ'লে নিজাশনে,  
মহলা পুরুষ এক শিরসেতে এসে,  
বিচিহ্ন বাক্য কত তুলা তাঁর নাই,  
আমারে কি ব'লে গেল শুন তুমি ভাই ।

इष्टं कुष्ठज पूतिगन्धिकुरसैः स्निष्टं वपुस्तो कदा  
सृष्टं नैवच वान्धवेः किमपरं जुष्टं न जायादिक्रैः ।  
भक्तं तत् क्षतजातयोणितयुतं भुक्तं त्वया म्हादिवद्  
मर्ष्यं माकुरु जीव वर्ध्वा नवो नायं तवाविर्भवः ॥

সম্মার্শ্য।

হে জীব! লেপেছ দেহ কস্তুরি চন্দনে,  
মোহে অভিমান তাই ধরে নাকো মনে ।  
একদা দেখেছি শুন, ছিল নিরস্তর  
নিদারুণ কুষ্ঠ-ভরা তব কলেবর ।  
দিবা নিশি ক্ষত হ'তে কত রস ওঠে,  
চারিদিকে কি বিবস পুঁতি গন্ধ ছোটে ;  
সে জননে দেখেছি হে আমি তব কার  
না বন্ধ, না আশা, কেহ সেবিবারে চার ।  
বিগলিত-পূজ-রক্ত ক্ষত-হস্ত হ'তে  
নিরত মিলিছে তব আশ্রয়ী সাথে ।  
স্বচক্ষে দেখেছি আমি, কুঙ্করের প্রায়  
কুখ্যে যেতেছ তুমি সেই সমুদ্র ।

ନବ ଆବିର୍ଭବ ତବ ନହେ ଏହି ଭବେ,  
ରେ ଜୀବ ! ବର୍ଷର ! ତାଙ୍କ' ବୃଦ୍ଧା ଗର୍ଭ ତବେ ॥

अध्वानस्तव वाजिराजि-शकटेः संसज्जितैः शोभिताः  
प्राग् जन्मन्यधुनेव ताः सुखनिशा योधारसं यापिताः ।  
दृष्टं तत् जनौ त्वया परिजनैर्मिच्छाज्जनैर्जीवितं  
गर्वं मा कुर्व जीव वर्ष्पर नवो नायं तवाविर्भवः ॥

ସନ୍ଧ୍ୟାର୍ଥ ।

ହେରିରେ ମୋଡାଗା, ଯେନେ ଏତ ଗର୍ବୋଦୟ,  
ଅଦୃଷ୍ଟ-ଚକ୍ରେର କିଛି ନହ ପରିଚୟ ।  
କୋନ' ଜନ୍ମେ ଏହି କ୍ରମେ ର'ତ ତୋମା ତରେ  
ଅଧ-ହତୀ ନୁଁ ଗଞ୍ଜିତ ମଧ୍ୟେର ହୁ'ଧାରେ ।  
ତଥେନୋ ଏକ୍ରମେ ତୁମି କଡ଼ିଏ ଯଡ଼ନେ  
ସାମିନୀ ଜାଗିତେ ଯତ ଯୁବତୀର ମନେ ।  
ସେହି ଜନ୍ମେ ଏ'ଓ ଦେଖି, ଭାଗା-ବିପର୍ଯ୍ୟାସେ  
ଅକନ୍ୟାଂ ଡିକ୍କା କର ପରିଚୟ ନ'ୟେ ।  
ନବ ଆବିର୍ଭବ ତବ ନହେ ଏହି ଭବେ,  
ରେ ଜୀବ ! ବର୍ଷର ! ତାଙ୍କ' ବୃଦ୍ଧା ଗର୍ଭ ତବେ ।

पश्यामि स्र परस्य वृत्तिहरणं त्वं दम्भुद्धनी रतः  
कृत्वा निवृत्तमतोषयः परिजनं सम्प्राप्य देहासवत् ।  
पश्चात्त्वं परिहास्य पोष्यनिष्करं काराप्रविष्टाद्विह  
गर्वं माकुर्व जीव वर्ष्पर नवो नायं तवाविर्भवः ॥



মর্মার্থ ।

এরূপে কতই জন্ম কত ভাবে গত  
কোন' জন্মে নিরবধি দয়াভার রত ।  
দাস-রূপে সন্তোষিতে নিজ-পরিজন  
নিরন্তর পরবৃত্তি করিছ হরণ ।  
গোষ্য তরে এই ভাবে দয়া-বৃত্তি করে',  
একদিন আছি দেখি বন্ধ কারাগারে ।  
ফুরায়েছে দয়া-বৃত্তি স্বজন-পালন,  
মিটেছে মিলন-আশা জন্মের মতন ।  
নব আবির্ভব ঐষ নহে এই ভবে,  
রে জীব ! বর্ষর ! ত্যজ' বৃথা পক্ষ তবে ।

दृष्ट्वेति कदा सुतादिककृतां सेवामुदा मृत्युता  
नित्यं सर्व-सुपुर्व-गर्व-निचयो नीतस्वयास्त्वय्यताम् ।  
सर्वे ते तव सन्निधौ प्रियजना याताः पुनः संक्षयं  
गर्वं मा कुर्व जीव वर्जर नवी नायं तवाविभवः ॥६॥

মর্মার্থ ।

দেখিয়াছি কত জন্মে তোমারে বতনে  
সেবিত্তেছে পত্নী-পুত্র চির-সুট-মনে ।  
সেবা দেখি' মমে মনে হইত উদয়,  
হেন সেবা দেবতারো ভাগ্যে বুঝি নয় ।  
ধীরে ধীরে স্বধ-রবি, অন্তাচলে গেলে  
চেয়ে দেখি অগ্ন্যাং তপস্যান্য-কালে,

যত প্রিয় জনে কেনি' একাকী তোমায়ে  
নুকাইল কালগ্রাসে চোখের উপরে ।  
নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে,  
রে জীব ! বর্ষর ! তাজ বৃথা গর্ষ তবে ।

यस्मासीद्गिरिमेखरे विचरषं सिंहः समं शर्षया  
सोऽयं स्त्रीकुर्वते सदाङ्ग-पदाघातं त्वदीयाङ्गने ।  
दृष्ट्वा हिरदाकृतिं धृतवतो दुःखं कदापीदृशं  
गर्वं मा कुर्व जीव ! वर्षर ! नवो नायं तवाविर्भवः ॥

মর্ম্মার্থ ।

যে করীন্দ্র উচ্চতম নগেন্দ্র-শেখরে  
সিংহ সহ বিহরিত গর্কিত-অস্তরে,  
সে মহান্ জীবে তুমি বাঁধিয়া অঙ্গনে  
বাধা দাও পদাঘাত, অঙ্কুশ-তাড়নে !  
অভিমানে আজি মনে কর না স্মরণ  
তুমিও কতই যোনি করেছ ভ্রমণ ।  
কতু পেয়ে সুবিশাল করি-কলেবর,  
এতই নাহনা আহা পেতে নিরন্তর ।  
নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে,  
রে জীব ! বর্ষর ! তাজ বৃথা গর্ষ তবে ।

क्रोडा यस्य करीन्द्र-कुम्भनिकरे वासी गिरीन्द्रोदरे  
सोऽयं स्त्रायसपञ्चरे पशुवरस्त्वत्प्रीतये नृत्यति ।  
तद्वाघेव गता कदापि भवता सिंहाकृतिं विभ्रता  
गर्वं मा कुर्व जीव ! वर्षर ! नवो नायं तवाविर्भवः । ७ ।

মর্থ্যার্থ ।

সে মৃগেন্দ্র, রাজা বার মৃগেন্দ্র-নিলরে,  
 খেলা বার নিরবধি করি-কুন্ত ল'য়ে,  
 তৃপ্তি হেতু বন্ধ করে' আরম-পঞ্জরে,  
 মনোমত্ত খেলা তুমি খেলাও তাহারে ।  
 কোন' কালে পেরে আঁহা মৃগেন্দ্র-আকার,  
 এ লাঞ্ছনা মেধিরাছি সহ' অনিবার ।  
 নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে,  
 রে জীব ! বর্ষর ! ত্যজ বৃথা গর্ব তবে ।

दृष्टन्ते मकटायवच्च-वपुषः पृष्ठे भटारोपणं  
 कृत्वावापयटनं कयाहतिवशाद् द्रुमारवं कुर्वतः ।  
 घासघासगतस्य दृष्टिरसमा दृत्वाम्मकायं कदा  
 गर्भं मा कुरु जीव ! वर्षर ! नवो नायं तवाविर्भवः ॥८॥

মর্থ্যার্থ ।

তব করে যেই বাধা পার অশ্বগণ,  
 সে বাধা তোমারো কভু করেছি মর্শন ।  
 মেধিরাছি বন্ধ তুমি থাকিতে শকটে  
 অথবা যুদ্ধেতে চল যোদ্ধা ল'য়ে পিঠে ।  
 অভিমানে আজি তুমি নাহি কর চিতে,  
 কশাঘাতে হেঁচা-রবে কতই কাঁদিতে ।  
 তখন এ কীর-সর ছিন্ন না তোমার  
 কুখার ঘাসের গ্রাস মিলিত আহার ।  
 নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে,  
 রে জীব ! বর্ষর ! ত্যজ বৃথা গর্ব তবে ।

লব্ধ্বা দুৰ্দ্ধম মত্ৰ মানবজনিং লব্ধ্বা ধ সত্ সন্নিধি  
নিদ্রাহারবিহারমাতৃকারণং স্বং ঘৌরুষং মন্যসে ।  
নিস্তারৈকগতির্মতিঃ স্তুতিনতো প্রীতিঞ্চ কিস্বীশ্বরে  
ধিক্ তাং তাং যদপাস্য পাশবমযৌ বৃত্তি স্বযোপাস্যতে ॥

মর্থার্থ ।

সুহৃৎ ভ নরজন্ম করৈছ ধারণ,  
মাধু সজ পেতে পার করিলে যতন ।  
এ সুযোগ যদি, কেন পশুর সমান  
নিজাশর বিহারেতে পুরুষার্থ জ্ঞান ।  
ভগবানে ধ্যান, জ্ঞান, প্রণাম, ভকতি,  
জীবের নিস্তার তরে এক মাত্র গতি ॥  
ধিক্ তোমা পশু-বৃত্তি উপাসনা করে'  
কাল বাপ নিরন্তর এ সকল ছেড়ে ।

তস্মাদ্বেদ মৃণীশ্বাদ নিচয়ং বিশ্বস্য নিঃসংগ্যং  
জ্ঞাত্বা তর্কবিশোধিতার্থমনয়োরাচার্য-শুশ্রূষয়া ।  
সাচ্চাত্তর্ক্যমনিত্যভোগমখিলং হিত্বৈব নিত্যং সুখং  
মহত্তমা ভাবয় ভাস্করং রঘুবরং কিস্বা भवानीश्वरम्॥১০॥

মর্থার্থ ।

বেদ-বাণী, ঋষি-বাণী, শিব-বাণীচরণে,  
নিত্য ছাড়ি' বিশ্বমহা বিদ্যা-মূলা হ'য়ে !  
কাম-মদে জ্ঞানবান্ আচার্য্য সেবনে,  
তর্ক-বিশোধিত-ধর্ম শিখহ যতনে ।

দুঃখ-সম্মিলিত তুচ্ছ সুখভোগ ছেড়ে,  
চেষ্টা কর নিত্যসুখ সাধাক্তের তরে ।  
ভক্তি-ভরে ব্রহ্মভাবে ভাব' রঘুবর,  
দিনমণি, ভবানী, কি ভবানী-ঈশ্বর ।

রাজরাজেশ্বরী-স্তোত্রম্ ।

বেধোবিঘ্নাশিবৈঃ শুম্ভপ্রদপদং সংস্থাপ্য শীর্ষস্থিতে  
মম্বৈ কাশ্ম্বননির্ম্মিত জননি তে যত্রৈশ্বরং চিন্ত্যতে ।  
উদ্ভূতি স্তিতি সংজ্ঞতি প্রজনিকাশক্তিঃ স্থিরত্বাশয়া  
নিস্তারায় মযার্থ্যতে পদতরীঃ শ্রীরাজরাজেশ্বরী ॥

( মহাসমুদ্র ভাবে                      কি ঐশ্বর্য্য কি গৌরবে  
ব'সে আছ ত্রিপুর-সুন্দরি !  
বিভব সম্পদ তরে                      কে না তোমা সুরাসুরে  
সেবা করে রাজ-রাজেশ্বরী ! )  
মঞ্চ শোভে স্বর্ণভারে                      সেই মঞ্চ নিজ শিরে  
বিধি ধরে' আছে অমুকুণ,  
সে মঞ্চ মন্তকোপর                      ধরে' আছে মুরহর,  
পুরহর করেছে ধারণ !  
মঞ্চোপরি তুমি তারা                      সে মঞ্চ ধরিয়া তা'রা  
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারণ,  
জতিতে অচলা শক্তি                      কত মতে করে' ভক্তি  
তব পদ চিন্তে অমুকুণ !

অন্য কিছু নাহি আশ,  
হৃদে মম অভিলাষ,  
তুন গো মা রাজ-রাজেশ্বরি,  
ভীষণ এ ভব-ঘোরে                      এ দাস নিস্তার তরে  
নিস্তারিণি চাহে পদ-তরী ।

त्वां धृत्वापि पुरन्दरः समगमत् स्वाराज्य मैरावतं  
लेभे नन्दनकाननं विमलभा रम्भा मयो-सेवनम् ।  
दम्भादम्बुदमाश्रयं কুহতে দম্বোলি-সম্ভালনং  
निस्ताराय मयार्थयते पदतरोः श्रीराजराजेश्वरि ॥

মর্থার্থ ।

ভক্তি-তরে পুরন্দর                      সে মঞ্চ মন্তকোপর  
লভিয়াছে করিয়া ধারণ—

স্বর্গের রাজ্য কিবা,                      কিবা রম্ভা, শচী-সেবা,  
ঐরাবত, নন্দন-কানন !

নিরন্তর ভক্তি-তরে                      সেই মঞ্চ শিরে ধরে  
পুরন্দরে কি শক্তি-স্বজন !

সদা সেই শক্তি-তরে                      বসিয়া অমৃত পরে  
দন্তে করে দম্বোলি-চালন ।

অন্য কিছু নাহি আশ                      হৃদে মম অভিলাষ  
তুন গো মা রাজরাজেশ্বরি,

ভীষণ এ ভব-ঘোরে                      এ দাস নিস্তার-তরে  
নিস্তারিণি চাহে পদতরী ।

জ্ঞাত্বা भक्तिमति प्रपूज्य भवतीमाशापतिश्चेत्तयः  
कार्ये स्त्रीयसुखाद्यशक्तिमनमन् मुक्तिं गताः केचन ।

সূরঃ শক্তিমন্বাণ বৃষ্টি-রণে সৌমঃ সুধাবর্ষণে  
নিস্তারায় মযার্থ্যতে পদতরী: শ্রীরাজরাজেশ্বরী ॥

মন্ত্যার্থ ।

নিরন্তর মা গো তোরে                      শক্তি-তরে সেবা করে'  
শক্তি পেলে দশ দিকপাল,  
সবতনে ভক্তি-ভরে                      মুক্তি তরে সেবা করে'  
মুক্তি পেলে মুক্তির কাঙাল ।  
রস আকর্ষণ করে'                      সূর্য্য মেঘ, বৃষ্টি করে,  
চল করে সুধা বরষণ,  
ওই পদে ভক্তি করি'                      ওগো রাজ-রাজেশ্বরী,  
যে যা' চাহে দাও গো তখন !  
অন্য কিছু নাহি আশ                      হৃদে মম অভিলাষ  
শুন গো মা রাজরাজেশ্বরী,  
ভীষণ এ ভব-ঘোরে                      এ দাশ নিস্তার তরে  
নিস্তারিণি চাহে পদতরী ।

धर्मार्थी भजतीह कोऽपि भवती' कोऽप्यर्थलाभाशया  
कामप्रार्थनयेव कोऽपि भजते कोवाऽमृतार्थी भवन् ।  
भक्तैः प्रार्थितमेकदा वितरितुं तं तं वरं सादरं  
मूर्त्तिस्ते किमु शोभते गिरिसुते रम्येऽस्तुर्व्वाहुभिः ॥

মন্ত্যার্থ ।

কেহ ভজ্ঞে ধর্ম আশে,                      কেহ অর্থ অভিলাষে,  
কেহ কাম, কেহ মোক্ষ তরে,  
চারি কল হ'বে দিতে                      'তাই কি মা চারি হাতে  
বসে' আছি চারিফল ধরে' ।

অক্ষয়ী কৌল সুবীচনামৃতরসৈঃ সস্তাপমাশ্রয়স্মিকং  
 তাপং দুঃসহমাধিভৌতিকমপাকর্তুং দ্বিতীয়েন চ ।  
 ভক্তোপাপতদাধিদৈবিকসমুত্তাপং তৃতীয়েন তে  
 মাতঃ কিং শুমলোচনশ্রয়যুতং সৌরাননং শোভতে ॥

মর্থার্থ ।

ত্রিলোকে ত্রিতাপ-বাধা বৃদ্ধেছ কি গিরিশ্রুতা  
 ত্রিনয়নে পূণ্য-দৃষ্টি করে'  
 সে ত্রিতাপ নাশিবারে আছ কি ত্রিভুজ ধরে'  
 অত হানি তাই কি অধরে ?

ऐश्वर्यं किम् वर्णयते तव शिवे त्वं राजराजेश्वरी  
 त्वच्चाद्याप्रकृतिस्त्वमेव च जगन्मातापि गीतागमैः ।  
 स्वेच्छातः कुरुषे यतस्त्रिजगतामत्पादनं पालनं  
 भुङ्क्ते क्लेशमशेषमेष सततं त्वद्वासदासः कथम् ॥

মর্থার্থ ।

বিভব ঐশ্বর্য্য তব বল মা কেমনে ক'ব  
 তুমি গো মা রাজরাজেশ্বরী,  
 তুমি আদ্যা সনাতনৌ, তুমি বিশ্ব-প্রসবিনী,  
 তব্বে গাহে মহিমা তোমারি !  
 তুমি মা ত্রিগুণ ধর' স্বেচ্ছায় তুমি মা কর'  
 ত্রিলোকেয় সৃজন-পালন  
 তবে মা গো কোন্ পাপে বল' এ অশেষ-ভাপে  
 বাস-দাস দহে অক্ষয় ।



নব্য কাব্যসমূহ আলোচনার স্রোতে রামায়ণ মহাভারত ভাগবতাদির আলোচনা চতুষ্পাঠীসমূহ হইতে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যাক্তি হয় না । সংস্কৃতশিক্ষার্থীগণের দ্বারা প্রাচীন কালের মত আবার ঐ সকল ধ্বংস-গ্রস্থ আলোচিত হোক, এই উদ্দেশ্যে নব্যগণকে লক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সকল উপদেশ কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

ভো ভো নব্য নবীনকাব্যজরসৈঃ শ্বঃশ্রয়সঃস্থালনং  
লক্ষ্যং মুখ্যফলন্তু যস্যবিষদ্যৌধামনস্তৌষণম্ ।  
যন্তৌষস্ব গণেশবাসবশিবদ্বৈষস্তু শেখঃফলং  
তস্মাত্ স্ত্রীমদকামজব্যসনদে কাব্যে মনো মার্প্যতাং ॥

মর্থ্যার্থ ।

নব্য-কাব্য-রসান্বাদে, ওহে নব্যদল,  
প্রক্ষালিত হয় মাত্র নিজের মঙ্গল ।  
কামিনীকুলের মন' বিবেক মতন,  
তারে সন্তোষিতে চিত্ত ধায় অক্ষুণ্ণ ।  
নারী-প্রেমে হ'লে মত্ত নর যায় ভুলে,  
গণেশ বাসব শিব আদি দেবকুলে ।  
অতএব স্তন ভাই, যেই কাব্য-রসে  
নারী প্রতি ধায় মন', চিন্তে গর্ভ আসে,  
যে কাব্যে বাড়ায় কাম, বাড়ায় ব্যসন,  
সে কাব্যের রস পান কর' না কখন ॥

কালোঃক্ষিন্ কুটিলে সতামপি সদা স্তান্তন্তু কান্তাগতং  
বাহুবাতি সুরাধিকং তব পুনস্তাহনামুজ্জ্বলিতম্ ।

তস্মাত্ কিং भवितेति भावय, पुनः काव्याब्धि-सम्यक्जने  
भो भ्रातः किमनर्थसार्थघटनं सम्भावितद् भाव्यताम् ।

মর্শ্বার্থ ।

ভগ্নধর কলিকাল হয়েছে উদয়  
এ কালে সাধুরো চিন্তা নারী প্রতি ধার ।  
তাঁহে উত্তেজিত পুনঃ যৌবন তোমার,  
বারুণী-সুরার চেয়ে মাদকতা তার ।  
ইহাতেই কত তব অনিষ্ট ঘটন,  
হ'তে পারে, মনে মনে করহ চিন্তন ।  
পুনঃ আধুনিক কাব্যে রসের সাগরে  
ডুবিলে ভাল কি মন্দ, দেখ চিন্তা করে' ॥

यत् संसेव्य महर्षि सन्ततिगणाः सन्तोऽभवन् सदगुणा  
स्तत्श्रीभागवतादि भारतमयो वाल्मीकि-सद्भारती ।  
तत्सत्त्वेऽप्यधुनातनाति रसिक ग्रन्थे समालोचिते  
विद्यां विद्धि समुद्रमध्यपतितां सिद्धेदविद्या सतां ॥

মর্শ্বার্থ ।

ভাগবত, রামায়ণ, শ্রীমহাভারত,  
রহিয়াছে ঋষি-গ্রন্থ জুড়িয়া জগৎ ।  
বাহা পাঠে হইতেন ঋষিগুণগণ  
কতগুণী, কত জানী, কত বিচক্ষণ ।  
থাকিতে সে ঋষিগ্রন্থ, ভবে অবিরত  
রসিকের রস-গ্রন্থ হ'লে আলোচিত,  
প্রস্থান করিবে বিদ্যা সাগরের জলে,  
অবিদ্যাই হ'বে সার বিদ্যানের দলে ॥



## একাদশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গীয় বিদ্যুৎসমাজ সংস্থাপক ধনবান্ ও বিদ্বান্গণের স্মৃতি রক্ষা। সমাজ বন্ধনে  
প্রাচীনগণের বুদ্ধিমত্তা। দেশীয় সামগ্রীর গৌরব রক্ষায় দেশবাসীর কর্তৃ-  
ব্যতা। শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ ঐতদ্ভাসারে এই ত্রিবিধ  
উপাসনাবস্থা বর্ণন। তর্কশাস্ত্রের দায়িত্ব। প্রাচীনগণ কর্তৃক বঙ্গে  
জাতিাত্মিক দর্শনে উপেক্ষার হেতু। অন্তান্ত দর্শন তর্কশাস্ত্র  
কিনা জানিবার উপায়। অদ্বৈতবাদখণ্ডন গ্রন্থের পরিচয় এবং  
আপত্তি উপপত্তিচ্ছলে মর্ম প্রকাশ আরম্ভ। নিজগুরুমত  
সংস্থাপন ও তদ্বিরোধি মত খণ্ডনের বৈধতা। পদ্ম-  
পুর্ণাণে সদস্য শাস্ত্র নিরূপণ ও অদ্বৈতবাদ শ্রবণে  
পাতিত্য বর্ণন। ‘ঐতদ্ভাস্মিৎ সর্বং \* \*’  
ইত্যাদি ঐতির স্বারসিক ব্যাখ্যারম্ভ।  
পরমাণু সংস্থাপন।

যে সকল শক্তিমান পুরুষ পূর্কপূর বঙ্গের বিদ্যুৎসমাজের গঠন ও  
সংরক্ষণ করে দৃঢ়ব্রত ছিলেন, বিদ্যুৎ-ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের  
স্মৃতিচিহ্ন সংশ্লিষ্ট রাখা সর্বপ্রধান কর্তব্য। কারণ অধ্যাপকেরা  
শাস্ত্রসেবী, ধনবান্ বিদ্বান্গণেরা তাঁহাদের প্রতিপালক। দেশের  
শাস্ত্রীয় সমাজ রক্ষার বিদ্বান্ অপেক্ষা বিদ্যোৎসাহীর চেষ্ঠা সমধিক  
ফলপ্রসূ। বর্তমান ধনবান্গণ অপেক্ষা পূর্ক পূর্ক ধনবান্গণ সে চেষ্ঠা

অনেক অধিক পরিমাণে করিয়া গিয়াছেন। এখনও সমাজের যে বন্ধন পরিলক্ষিত হয়, তাহা তাঁহাদেরই চেষ্টার পরিণাম নাই। নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তৎসন্তান শিবচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণদেব এবং তাঁহার বংশধর স্বাধীকান্ত দেব ও কমলকৃষ্ণ দেব, নড়ালের রতন রায়, উলোর মহাদেব মুখোপাধ্যায়, বামনদাস মুখোপাধ্যায়, রয়ালির রাজচন্দ্র রায়, কলসকাটীর বরদাকান্ত রায় প্রভৃতি পূর্বতন ভূম্যধিকারী ও রাজন্যবর্গ কিরূপে বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজের পরিগঠন ও সংরক্ষণ করিবেন সেই চিন্তায় নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন। মহিষাদলের রাজধারা পূর্বপুরুষ-প্রবর্তিত নিয়মানুসারে অন্যাপি দেশীয় সমাজ-রক্ষক বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছেন। বর্তমানের মহারাজাধিরাজ ৬ মহতাব্ চন্দ্র, কলিকাতার ৬ প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতিও বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠাদির দ্বারা সমাজের বহু বল বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়েও গৃহস্থের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, আজীবন ক্রমশে অর্থোপার্জন করিয়া ও বহু ক্রমশে সেই অর্থগুলি সঞ্চয় করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বর্গগমনের কিছু পূর্বে যখন দেখিলেন তাঁহার পুত্রগণ কৃতকর্মী হইয়াছেন, তখন নিজের অর্জিত কপর্দক পর্যন্ত তাঁহাদের জন্য না রাখিয়া বাবতীর অর্থ দেশের বিদ্বৎসমাজ সংরক্ষণ কল্পে প্রদান করিয়া যান। এতব্যতীত, বঙ্গ-সরস্বতীর প্রেরিত একটি বৃধশেখর দেশের বিদ্বৎ সমাজ রক্ষার পক্ষে লোকাভীত কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি মহামহোপাধ্যায় ত্রীব্রত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপ্ততা করিয়া কাউল সাহেব যে কার্য সাধন করিতে পারেন নাই, ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর যে কার্য সাধন করিতে পারেন নাই, এই পুরুষ সেই

কার্য সাধন করিয়াছেন। গতর্গমেন্টকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া, ডিরেক্টর সাহেবকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া ইনি সংস্কৃত বিদ্যার রক্ষাকল্পে আশাতীত সাহায্য বাহির করেন, এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতেও বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। পরীক্ষা-সংস্থাপনাদির দ্বারা বিদ্যৎসমাজ রক্ষা পক্ষে বহু সদ্ব্যবস্থাও ইহার দ্বারা সাধিত হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষগণ যদি মহেশচন্দ্রের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি করিয়া তাঁহার সংগৃহীত অর্থ ব্যবস্থা সহ ব্যয় করিতে পারেন, তবে এই বৃদ্ধ শেখরের কৃতিত্বও বঙ্গীয় বিদ্যৎসমাজ রক্ষা পক্ষে বহুদিন সফল উৎপন্ন করিবে। দেশীয় বিদ্যারক্ষাকল্পে ধনবান্গণের অর্থব্যয় ক্রমশঃ খুব কমিয়া যাইবে বলিয়াই অনুমান হয়। এ সময় মহেশচন্দ্রের কৃতিত্বই সমধিক মূল্যবান হইয়াছে।

বর্তমান সময় অপেক্ষা প্রাচীন সময়ে কি ধনবান্গণ, কি অধ্যাপকগণ, সকলেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব সাধন করিতে জানিতেন। যেমন আবশ্যকীয় সামগ্রীতে তাঁহারা বঙ্গীয় সমাজ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এমন আর কোনও সমাজে নাই। ধর্ম শাস্ত্রের সূক্ষ্মতম মীমাংসা বঙ্গদেশের স্মৃতিশাস্ত্রে। বঙ্গদেশের ব্যাকরণ-চর্চা সম্পূর্ণ ফলের দিকে দৃষ্টি করিয়া। বঙ্গদেশের সাহিত্য-চর্চায় ত্রায় সাহিত্য চর্চার প্রণালী কুত্রাপি নাই। বঙ্গদেশের ত্রায় দর্শন সকল দর্শনের রাজ্য। বঙ্গে আচার্য্যগণ জন্মিয়া সকল শাস্ত্রের সহিত তর্ক শাস্ত্রের সম্বন্ধ এমন পরিবদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, ক্রমে ভারতীয় সকল বিদ্যাহানেই এই তর্কশাস্ত্রের রাজতা স্বীকৃত হইল, যে কোনও শাস্ত্রে রাজশক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে সকল সম্প্রদায় কর্তৃক তর্কশাস্ত্র আরাধিত হইতে লাগিল, এবং প্রধান সমাজ স্থানে বিদ্যা-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইলে এই তর্কশাস্ত্রকেই প্রাধান্য-পদ অর্পণ

করিয়া তদধীনে অভ্যন্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা চলিতে থাকিল। এক্ষণে সেই রাজতা ভারত-ব্যাপিনী।

বিদ্যা, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি দেশের গৌরববর্ধক সামগ্রী। সেই গৌরবকর সামগ্রীগুলির মধ্যে যে দেশ হইতে যাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা সেই দেশের সামগ্রী বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত হয়। তদনুসারে তর্কশাস্ত্রটিকে বঙ্গদেশের সামগ্রী বলিয়া সকল স্থানের বিদ্ব-  
দগণলই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব তর্কশাস্ত্রের রাজতার বঙ্গদেশেরই রাজতা। জাতীর গৌরবের পক্ষপাতী কি ধনবান বিষয়লোক, কি শাস্ত্রসেবী ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সকলের পক্ষেই বদ্ধ-  
পরিবর্তন হইয়া এই শাস্ত্রের রক্ষা সাধন করা বিধেয়। কাল মাহাত্ম্যে লোকে ক্রমশঃ অন্নায়ুঃ ও হীনবল হইয়া আসিতেছে। অর্থাগম বিরহিত কঠিন পরিশ্রম আর কেহ কামনা করেনা। আত্মবোধ্য দর্শনাদি লইয়াই এক্ষণে অনেকে বাস্তব হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু প্রকৃত সুসার সামগ্রী সমাজে না থাকিলে সমাজের গুরুত্ব নষ্ট হইবে। এক্ষণে সর্বদাই ইহা স্মরণ করা, এবং সমাজের সংস্থাপক প্রাচীন মহাত্ম্যপণের দৃষ্টান্ত অহুসরণ করা, সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

শুধু জাতীর রাজতা রক্ষার জন্য তর্কশাস্ত্র রক্ষার আবশ্যকতা নহে। শাস্ত্রীয় সমাজের সর্বোচ্চ কার্য সাধন করিবার তার তর্ক-  
শাস্ত্রেরই স্বন্ধে সমর্পিত। শ্রুতিতে আদিষ্ট হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত তিনটি উপায় পর পর অবলম্বন করিতে হইবে। যথা,

১। শ্রোতব্যঃ।

২। মন্তব্যঃ।

৩। নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

‘শ্রোতব্যঃ’ শব্দের অর্থ কি? প্রথমে ঐতি-সাহায্যে নির্ণয় করিতে হইবে। সেরূপ করিলে ব্রহ্মের উপাস্যত্ব মুক্তি-প্রযোজকত্ব ও অন্যান্য নানা বিষয় সিদ্ধ হইবে। কিন্তু নির্বিশ্বাসে তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ উপনিষদে নাই। বিভিন্ন উপনিষদে আপাততঃ দৃষ্টিতে কেবল বিভিন্ন মতের খণ্ডনই পরিলক্ষিত হয়। কোন’ উপনিষদে ‘অসং’ খণ্ডন করিয়া ‘সং’ সংস্থাপিত হইয়াছে। কোন’ উপনিষদে ‘সং’ খণ্ডন পূর্বক ‘অসং’ সংস্থাপন করা হইয়াছে। কোন’ উপনিষদে ‘তন্ন’ ‘তন্ন’ করিয়া ব্রহ্মকে বুকান হইয়াছে। কোন’ উপনিষদে ‘তৎসমুদয়কেই’ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সর্বসাংশের একবাক্যতা করিতে গেলেও মত পার্থক্য দাঁড়াইয়া যায়। ইহা ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার সপ্রমাণ করিয়াছেন। এ কারণ দ্বিতীয় উপায় উক্ত হইয়াছে ‘মন্তব্যঃ।’ অর্থাৎ অনুমাতব্যঃ। স্মৃতিও আছে ‘মন্তব্যশ্চোপপত্তিঃ।’ সহচার, দৃষ্টান্ত বা উপকথা সাহায্যে উপপত্তি হয় না। উপপত্তি প্রণালী যে কত কঠিন তাহা এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কতক প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ঐতির তাৎপর্যজ্ঞানে গোলযোগ ঘটিলে প্রত্যেক স্থলেই ‘পক্ষ’ ‘হেতু’ ‘সাধ্য’ ‘পক্ষবশ্মতাজ্ঞান’ ‘কার্যাকারণভাব’ ও তৎসাহায্যে ব্যাপ্তি নির্ণয় করিতে না পারিলে উপপত্তি করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে ঐতিও রহিয়াছে, ন প্রবচনেন। ঋষি-আদেশ রহিয়াছে,

আর্যং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যন্তর্কেণাভিসন্ধন্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ ॥

অতএব শ্রোতব্যঃ এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়া আর্যাদর্শন মাত্রেই রচিত বটে, কিন্তু মন্তব্যঃ এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়াই

তর্কশাস্ত্রের সৃষ্টি। এ কারণ, নিদিধ্যাসনের পূর্বসোপানে উপনীত হইবার জন্য তর্কশাস্ত্রেরই প্রয়োজনীয়তা।

আত্মীক্ষিকী বিদ্যা মুক্তির কিরূপ প্রযোজক তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে আদিষ্ট নিম্নলিখিত প্রমাণ দৃষ্টে অনুমান করা যায়। যথা,

যথা দৃঢ়ৈঃ কৰ্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নাম নোনিভৈঃ ।

বিদ্যামাত্মীক্ষিকীং হিহা তিতীৰ্ষন্তি ভবান্বিতং ॥

তর্কশাস্ত্রের প্রতিকূলে উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যাখ্যা শ্লষ্টিগণ গ্রাহ্যই করিতেন না। মহাভারতে প্রমাণ যথা,

তত্রোপনিষদং তাত পরিশেষন্তু পার্থিব।

মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চাত্মীক্ষিকীং পরাং ॥

এই সকল পর্যালোচনা করিয়া আস্তিকগণ তর্কশাস্ত্রের দাবিতে বৃদ্ধিতে পারিবেন। হিন্দুসম্মান আত্ম-গন্তব্যপথ অবধারণের জন্য শ্রুতির অধীন হইবেন। শ্রুতিকে আবার আত্মগন্তব্য-পথ অবধারণের জন্য তর্কশাস্ত্রের অধীন থাকিতে হইবে। অতএব বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে গিয়া তর্কশাস্ত্রকে এক রকম সর্বজন সাঙ্গিতে হইবে।

তর্কশাস্ত্র যোগবলে এইরূপ সর্বজন সাজে না। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এরূপ কঠিন নিয়মাবলীতে পরিবদ্ধ যে, প্রকৃত তথ্য ইহার গভীর বহির্ভাগে কোনও রূপে বাইতে পারিবে না, এবং অপসিদ্ধান্ত ইহার সীমা স্পর্শ করিতে পারিবে না। তৃতীয় পরিচ্ছেদ দৃষ্টি করিলে অভিজ্ঞগণ কতক পরিমাণে ইহা বৃদ্ধিতে পারিবেন। তর্ক-সাপেক্ষ যে কোনও প্রকার শাস্ত্রের মীমাংসায় গোলযোগ দাঁড়াইলে, তর্কিকগণ



সেই গভীর ভিতর আনিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করেন, এবং তর্কশাস্ত্রোক্ত উপায় সকল একে একে প্রয়োগ করিতে থাকেন । প্রতি স্মৃতি পুরাণাদিতে সম্পূর্ণ অমীমাংসিত সামগ্রী এই সকল গভীতে ফেলিয়া মীমাংসা করিবার সময় নৈরাসিকগণের বিচারের একটি বর্ণও অল্প সম্প্রদায়ের বোধগম্য হয় না । যদিবা বর্ণবোধ হয়, তবে তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারের দিকে দৃষ্টি করিয়া অভিভূত হইতে হয় । একবার একটি কাগজের কলে গিয়া দেখিয়াছিলাম, কলের এক ধারে ময়লা নেকড়া, ঘাষ, মাটি প্রভৃতি যত কিছু আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হইতেছে । কলে সেই গুলি নানা আকার ধারণ করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে বিশুদ্ধ কাগজ হইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে । ভারতীয় শাস্ত্র-সমূহের সহিত তর্কশাস্ত্রের সম্বন্ধও ঠিক ঐ ভাবে পরিবদ্ধ । তর্ক-সাপেক্ষ শাস্ত্রীয় সামগ্রীসমূহ ইহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তর্কশাস্ত্রোক্ত উপায়ে উপায়ে কিছুক্ষণ হ্রস্বোদ্যম ভাবে পরিচালিত হইয়া, অবশেষে তাহার তাস্তিক মীমাংসা বাহির হইয়া আসিবে । বাহ্য-বিজ্ঞান পর্যালোচনা করিলে যেমন পাশ্চাত্যজাতির নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া থাক, অন্তর্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ করিলে সেইরূপ ভারতীয় তর্ক-শাস্ত্রের কলাকৌশলে স্তম্ভিত হইবে ।

(১) শ্রোতব্যঃ, (২) মন্তব্যঃ, (৩) নির্দিধ্যাসিতব্যঃ, এই তিনটি সোপানের দ্বিতীয় সোপান তর্কশাস্ত্রের উপর ভর করিয়া গঠিত । ঐ সোপানে তর্কশাস্ত্রেরই সাহায্য মহর্বিগণ গ্রহণ করিতেন, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । ঐ সোপানে উঠিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করিবার জন্তই প্রথম সোপানে বিভিন্ন দর্শনকার বিভিন্ন বৈচিত্র্য প্রদর্শন করাইয়াছেন । সাক্ষ্য এই প্রথম সোপানে পুরুষ প্রকৃতিকে অবলম্বন

করিয়া, ষট পট মঠাদি বিভিন্ন সামগ্রী গুলিকে প্রকৃতিরই আবি-  
 র্ভাবরূপে শ্রুতিবলে মানাইয়া লইলেন। বেদান্ত গাহিলেন “ওকথা  
 কিছু নহে।” তিনি শ্রুতিবলে ব্রহ্মে মোহ-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া  
 বলিলেন, “ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতে মোহসম্বন্ধ-বিশিষ্ট। বিষ্ঠা কুমি  
 শূকর পর্য্যন্ত সকলেই মোহাবাচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। তুমি আমিও মোহা-  
 বচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। মোহবশেই মোহাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে ষট পট মঠ  
 বলিয়া বোধ হইতেছে। সর্বজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্রে যাহাদিগের  
 উল্লেখ আছে, তাহারা সর্বপ্রকার মোহে আচ্ছন্ন। শিব, দুর্গা,  
 বিষ্ণু প্রভৃতি সর্বপ্রকার মোহে আচ্ছন্ন। ইহারা কেহই বিত্ত্ব-  
 ব্রহ্ম নহে। প্রলয় না হইলে ব্রহ্মের মোহসম্বন্ধ কস্মিন্ কালেও ঘোচে  
 না।” যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, ব্যবহার করিতেছি, এ সকল  
 কিছুই নাই, ভ্রম চলিয়াছে মাত্র, কেবল ব্রহ্মেরই সত্তা আছে, মীমাংসক  
 এ কথা স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন “ব্রহ্মই নাই, আর  
 সবগুলি আছে। তপঃ যজ্ঞাদি আবশ্যক, কিন্তু শিব দুর্গাদি অলীক।  
 তোমারই ফলের জন্য মাত্র ঐ সকল করণা করিয়া লইতে হইবে।”  
 এইরূপে নানাবিধ উপায়ে প্রথম সোপান চিত্রিত করিয়া দর্শনকারেরা  
 মুমুকুর তত্ত্বজিজ্ঞাসা বৃদ্ধি করাইয়া দ্বিতীয় সোপান অবলম্বন করিবার  
 প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলেন। সে সোপানে উঠিয়া শ্রুতির গলদেশ  
 হইতে বৈচিত্র্য-হার খুলিয়া লওয়া হইল। বিবিধ সিদ্ধান্তের প্রয়ো-  
 জনীয়তা ফুটাইয়া গেল। নিমিখ্যাসনের জন্য শ্রুতির একটা মাত্র  
 সিদ্ধান্ত পরিরক্ষিত হইল। তাহাতে কোনও বৈচিত্র্য নাই। তাহাতে  
 নির্দ্ধারিত হইল, বিষ্ঠা কুমি শূকর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম অনাদিকাল  
 হইতে নিরন্তর মোহোপহিত নহে। ব্রহ্মে মোহের কোনও সম্বন্ধ  
 কখনই ঘটিতে পারে না। শিব দুর্গাদি মোহাচ্ছন্ন নহেন। বিত্ত্ব

ব্রহ্মই ঐ সকল রূপ ও বিবিধ লীলা ইচ্ছা পূৰ্ণক স্বীকার করিয়াছেন। ঘট-পট মঠাদি যেমন দেখিতেছি, তাহাদের স্বরূপও তাহাই। গল্প করিয়া প্রত্যেক পদার্থ উপপত্তি করা অপেক্ষা চক্ষুঃ কর্ণের প্রামাণ্য আছে। কোষাধীন বা চিরপ্রচলিত মহাজনের ব্যবহারাধীন শ্রুতাক্ত পদার্থই সিদ্ধ হয়। 'তন্ন' 'তন্ন' করিয়া ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে, এবং স্ব স্ব অধিকার মন্ত যথাশাস্ত্র উপাসনা করিতে হইবে।" এইরূপে দ্বিতীয় সোপানে উঠিলে প্রথম সোপানের বৈচিত্র্য-প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া আসে, এবং এই একটা মাত্র সিদ্ধান্তের জন্য স্বরূপ-নির্দেশক বাক্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয়। একারণ অতি যত্ন সহকারে এই দ্বিতীয় সোপানেরই উপকরণ পূর্বে বঙ্গদেশে রক্ষিত হইত।

নবদ্বীপ. ভাটপাড়া, বাথলা, বিক্রমপুর, ত্রিবেণী প্রভৃতি বঙ্গীয় প্রাচীন সমাজ মাতেই যত অভিজ্ঞ দার্শনিক জ্ঞানিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় সোপানের সামগ্রী সমূহেরই সকলে প্রাণপণে রক্ষা সাধন করিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নবকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, রামরতন রায় প্রভৃতি প্রাক্তন দেশীয় প্রাচীন ভূম্যধিকারী ও রাজন্যবর্গ সেই সামগ্রী দ্বারাই সমাজ বন্ধন দৃঢ় রাখিতে সর্বদা চেষ্টা করিতেন। তক' সাহায্য গ্রহণ করার পরিবর্তে মাত্র সহচার দৃষ্টান্তাদির সাহায্য গ্রহণ করার এবং মাত্র গল্পাংশে ওপন্যাসিকতা দেখাইয়া চিত্তাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করার, আর কোনও দর্শনই দ্বিতীয় সোপানের কার্য সাধন করিতে সমর্থ নহে, ইহা তৃতীয় পরিচ্ছেদ দৃষ্টে বিশেষ অভিজ্ঞগণ বুঝিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা দৃষ্টে পরে আরো অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন। ফলে, দ্বিতীয় সোপানে উঠিবার জন্য প্রথম সোপানের আবশ্যিকতা হইতে পারে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় সোপানে সমাজ অধিষ্ঠিত থাকিলে প্রথম সোপানে তাহাকে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা অনাবশ্যক, অতি অল্প

পূর্বেও বঙ্গীয় সমাজের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কাউল সাহেব ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসেই কাণ্ড্য করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার ৮ প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিদ্যা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে অন্য কোনও দর্শনের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে একবার জিজ্ঞাসা করেন “কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে একমাত্র ন্যায়দর্শনেরই পদ স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইয়াছে, অন্যান্য দর্শনের পদও পৃথক্ সৃষ্টি করা হয় না কেন?” বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর দেন “যে দেশের দর্শনে স্বয়ং গৌতম কণাদ কর্তৃক উচ্চ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, এবং যে দেশে তর্ক শাস্ত্র দার্শনিক-জীবন গঠন করে, সে দেশে অন্যান্য দর্শন মাত্র উপকথা সহযোগে পদার্থতত্ত্ব বিবৃত করিয়া থাকে বলিয়া দার্শনিক আসন প্রাপ্ত হয় না।” প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা উভয়েই পরম অভিজ্ঞ। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় দেশীয় প্রাচীন-গণের সহিত ঐক্য হইত, রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অভিপ্রায় বর্তমান সময়ের বহু ধনবান্ বিদ্যার্থীলোকের অভিপ্রায়ের সহিত ঐক্য হয়। কারণ, এক্ষণে বহু ধনবান্ প্রথম সোপানের বৈচিত্র্য-শোভা দর্শনেও অভিলাষী হইয়াছেন। ‘শ্রোতব্যঃ’ এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়া ‘বেদান্ত’ ‘সাংখ্য’ প্রভৃতি যত কিছু দার্শনিক কল্পনা সৃষ্ট হইয়াছে, সকল গুলি পর্যালোচনা করিবেন বলিয়া ঐ সকল সামগ্রী লইয়া বিদ্যামন্দিরাদি স্থাপন করিতেছেন। কিন্তু ‘শ্রোতব্যঃ’ এই অংশে আবদ্ধ না থাকিয়া যদি তৃতীয় সোপান অর্থাৎ ‘নিদিধ্যাসন’ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে ঐ সকল ধনবান্ কামনা করেন, তবে দ্বিতীয় সোপানেরও সামগ্রী পরিষ্কার রাখিতে হইবে। সেখানে প্রথম সোপানের সকল বৈচিত্র্য ঘুচাইয়া দিয়া পূর্ব্বেম্বিত মহাবিগণের মত একমাত্র

সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করতঃ তত্ত্বনিরূপণ করিতে হইবে। সে সিদ্ধান্তে বিষ্ঠা, শূকর, কুমি সকলই ব্রহ্ম এই তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। শিব, দুর্গা, বিষ্ণুকে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সর্বজগৎকে সর্বপ্রকার অজ্ঞানাবৃত বলিয়া অবধারণ করা হয় নাই। যে সকল শ্রুতি প্রথম সোপানে অদ্বৈতবাদের সাধক হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতি দ্বিতীয় সোপানে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে থাকিবে। এসকল বিষয় ‘অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন’ নামক একখানি গ্রন্থে নারায়ণ মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তর্কানুমানের আকার সাধারণের বোধগম্য হইবেন। তবে তর্কশাস্ত্রানুমোদিত ত্যাগ্য ব্যাখ্যা ও গ্রাহ্য ব্যাখ্যা জ্ঞাত হইয়া দেশের প্রাচীন-প্রথা ও ঋষি-মীমাংসা অনুসারে নিদিধ্যাসনের পূর্বপথ বাঙ্গালী মাত্রেই পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। একারণ, অদ্বৈত ব্যাখ্যায় দোষারোপ সহ তর্ক-সম্মত শ্রুতি-ব্যাখ্যা অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন গ্রন্থ হইতে গুরু শিষ্যের আপত্তি উপপত্তি ছলে নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ ব্যাখ্যার বিরোধী শ্রুতি উপনিষদের সকল ব্যাখ্যাই নিদিধ্যাসনের পূর্ব সোপানে আন্তিকগণকে পরিত্যাগ করিয়া, শক্তি লক্ষণাদি সাহায্যে অনুকূল ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহা তর্কশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

### অদ্বৈতবাদ খণ্ডন।

শিষ্য। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্য কি?

গুরু। আমি গৌতমকণাদাদি মহর্ষিগণের প্রবর্তিত সম্প্রদায়-ভূক্ত। ‘ঋষি মতে এবং গুরুপরম্পরায় মতে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আমি লোকতঃ ধর্মতঃ বাধ্য।’ উক্ত মহর্ষিগণ এবং আমার গুরু-পরম্পরা শ্রুতি বুঝিতেন না; অথবা শ্রুতিবিরুদ্ধমত চালাইয়া গিয়াছেন, একথা আমি কখনও স্বীকার করি না। তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধ

মতকেই আমি শ্রুতি-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য। অবৈতবাদ ধক্তনের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত, হুজুগে হুজুগে অনেক বস্তুর প্রসার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বঙ্গদেশে অবৈতবাদের প্রসার বৃদ্ধির হেতু আমি তাহাই মনে করি। কারণ, প্রাচীনগণের ধার্মিকতা আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহারা অবৈতবাদের দ্বারা বঙ্গীর সমাজ বন্ধন করিয়া যান নাই। শ্রুতি-সম্মত সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি-বিরুদ্ধ সামগ্রীর দ্বারা পূর্বপুরুষেরা বঙ্গীর সমাজ বন্ধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরগণের মনে এ পাপ বিশ্বাস কদাচ স্থান পাওয়া উচিত নহে। ধার্মিকচূড়ামণি শ্রীগোরাঙ্গদেব বলিয়াছিলেন “গীতাত্ত্ব বুঝিলাম, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য-তত্ত্ব যে বুঝা দার।” এই প্রবাদ অব্যাপি সর্বত্র প্রচলিত আছে। প্রাচীনগণের ধার্মিকতার এবং দেশাচারের পবিত্রতার বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেক দেশেই শাস্ত্রীয় মীমাংসা হওয়া উচিত, ইহা আমার ধারণা।

শিষ্য। আপনার ধারণা বলিয়াই কি বেদান্তটা অণুজ্ঞ হইয়া গেল ?

গুরু। হিন্দুর ঘরে জন্মাইয়া কেহ কন্মিন্ কালে বেদান্তকে অন্তর্ভুক্ত বলে না, বেদান্ত আলোচনা করিতে গিয়া বেদের কদর্থ আলোচিত হইয়া না পড়ে, ইহাই বুদ্ধান দ্বৈতবাদিগণের উদ্দেশ্য। সম্প্রদায়-বিশেষে একটি নবীন মত প্রবর্তিত করিয়া, আত্মমতের গুণটির জন্য স্বপক্ষে কতকগুলো শ্রুতি উপনিষদের বাধ্যা করিয়া গিয়াছেন, সে বাধ্যাকে তাবলিয়া বেদান্ত বলা যাইতে পারে না। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে “জগৎ উচ্ছিন্ন দিব্যর জন্য অর্থাৎ কলি-প্রচার করিবার জন্য মারাবাদের সৃষ্টি। বেদ বাক্যকে ছদ্মবেশ পরাইয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে যেন এই শাস্ত্র কতই বেদার্থ-

বিশিষ্ট। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা শ্রুতির কদর্থ এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র-বিশেষ। এই শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রে, ব্রহ্ম নিগূর্ণ, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অবৈদিক শাস্ত্রের চর্চা করিলে জ্ঞানী ব্যক্তিরও পাতিত্য জন্মে।” পৌরাণিক বাক্যটি নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল। যথা,

পার্বতীঃ প্রতীশ্বর উবাচ ।

প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকং ।  
 মচ্ছক্ত্যা বেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সম্প্রোক্তানি ততঃপরং ॥  
 কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ ।  
 গৌতমেন তথা ন্যায়ঃ সাঙ্খ্যন্তু কপিলেন বৈ ॥  
 দ্বিজম্মনা জৈমিনিনা পূর্ববেদময়ার্থকং ।  
 নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরং ॥  
 ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্বাকমতিগর্হিতং ।  
 দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিয়ুগা বুদ্ধরূপিণা ।  
 বৌদ্ধশাস্ত্রমসং প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকং ।  
 মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ ॥  
 ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ।  
 অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়িত্বাতিগর্হিতং ॥  
 কৰ্ম্মস্বরূপত্যাগ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে ।  
 সর্বকৰ্ম্মপরিভ্রংশমৈককৰ্ম্মং তত্র চোচ্যতে ॥

পরাত্ত্বজীব্যোতৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে ।

ব্রহ্মণোহপ্যপরং রূপং নিগুণং দর্শিতং ময়া ॥

সর্বস্য জগতোহপ্যস্য নাশনাত্মং কলৌ যুগে ।

বেদার্থবস্তুহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকং ॥

ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণং ।

যস্য শ্রবণমাত্রেন পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি ॥

শিষ্য। নিরীশ্বর-বাদের প্রশংসা যে বচনে রহিল সে বচন কিরূপে প্রামাণিক হয়? ইহা অপ্রামাণিক বচন।

গুরু। ‘নিরীশ্বরবাদ’ শব্দের অর্থ তুমি কতটা অমুধাবন করিয়াছ? পদ্মপুরাণে পাগলের বচন নাই জানিবে। মন্ত্র এবং ব্রহ্ম একই পদার্থ, ভিন্ন ব্রহ্ম নাই, ইহা কোন’ মীমাংসকের মত। প্রত্যর্থও এই অমুসারেই তিনি মীমাংসা করিয়াছেন। প্রথমাবস্থায় মন্ত্রেই প্রাধান্যবুদ্ধি সাধকের একান্ত প্রয়োজনীয়। এই দর্শন সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে একান্ত উপযোগী। মহর্ষি জৈমিনি এই দর্শনের প্রণেতা। ইহা অতি সাবিকের শাস্ত্র। ‘নিরীশ্বরবাদ’ শব্দে ‘নাস্তিবাদ’ নহে। ‘নাস্তিবাদ’ যে অতি গর্হিত তাহা ‘চার্কাবমতি গর্হিতং’ এই বাক্যে পরেই প্রকাশ করা হইয়াছে।

শিষ্য। পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ বাক্য নাই, পুরাণের সকল বাক্যই প্রামাণিক, ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?

গুরু। যে বাক্যের মীমাংসা হইতে পারে, যে বাক্য ঐতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ নহে, যে বাক্য তর্কানুমানের বিরুদ্ধ নহে, সে বাক্যকে সহসা অপ্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য নহে। বিজ্ঞানভিত্তিক অনুধ



প্রাচীন আচার্য্যেরা ঐ ধর্ম্মবিধা কল্পিত করিয়া অদ্বৈতবাদ আলোচনা করিতে হিন্দুসন্তানকে একরকম নিষেধই করিয়া গিয়াছেন।

শিষ্য। তবে কি সকল বস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান আপনি চাহেন না ?

গুরু। চাহিবনা কেন ? যদি সেরূপ চিন্তা করা শাস্ত্রের আদেশ থাকে, যদি সেরূপ চিন্তা করা সেই মহাপুরুষের অভিলষিত হয়, যদি সেরূপ চিন্তা করিলে তাঁহার দয়া পাওয়া যায়, তবেই করিতে পারি। নিজের ইচ্ছায় পারি না। সেই পরম পুরুষের কৃপা লাভার্থ আমাদের অধিকার বুঝিয়া শাস্ত্র যেমন আদেশ করিবেন, তাহা করিতে পারি। শাস্ত্রোক্ত অধিকার মত স্বতঃকৈতুকে তাঁহার পিতা ব্রহ্মভেদ চিন্তা করিতে আদেশ দিলেন। আমাদের অধিকার তত নহে। তবে কখনও যে সে অধিকার পাই নাই এমন নহে। প্রাতঃকালে চিন্তা করিবার বিধি “অহং দেবো নচান্যোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোক ভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্যযুক্তস্বভাবান্॥” ইত্যাদি। এঃরূপে অধিকার মত চিন্তা করিবার বিধি থাকিলেও, আমরা সকলেই ব্রহ্ম এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে।

শিষ্য। আপনার মন অহুসারে তো ঋতি চলিবে না। ঋতিতে অদ্বৈত-সাধক বচন সহস্র সহস্র।

গুরু। ন্যায়, সাধ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি যত বর্ণন আছে, ঋতি যে অদ্বৈত-পক্ষে ইহা কোনও বর্ণনকারের বোধে আসে নাই। পরস্পরে নানা রকমে মতভেদ থাকিলেও, ঋতি যে বৈত-পক্ষে ইহা সর্ববাদিসম্মত। ঋতিতে দৈতভাব এতই স্পষ্ট যে, বৈদান্তিকগণের মধ্যেও রামানুজ, মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের সহিত একমত হইতে পারিলেন না।

শিষ্য । সকলে যদি পাপিন হইয়া থাকেন ?

গুরু । অপরাধ ?

শিষ্য । ছানোগ্য উপনিষৎ প্রভৃতি অধৈত-ভাবে তিন্ন ব্যাখ্যা হয় না ।

গুরু । ছানোগ্য উপনিষদে অধৈত-ভাব আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলৌকিক ।

শিষ্য । ছানোগ্য উপনিষদের “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি য়েতকোতো” এই বাক্যে কি বুঝাইতেছে ?

গুরু । ‘ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি য়েতকোতো’ এই বাক্যটির বিশেষ বিচার করা প্রয়োজন । কারণ সকল বাক্য পদার্থ-সাধক নহে । ঘটপটাদি মৃত্তিকা, গঙ্গাগোদাবরী প্রভৃতি নদী, রূপ রস গন্ধাদি গুণ, এইরূপ প্রয়োগসকল পদার্থ-সাধক । আর এক প্রকার প্রয়োগ আছে, তাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র । যথা, শালগ্রামই সাক্ষাৎ বাসুদেব, গুরু স্বয়ং ব্রহ্ম, জলই নারায়ণ, গঙ্গা সৰ্ব্বতীর্থময়ী, ঘটী সৰ্ব্ববাদ্যময়ী, ইত্যাদি । ‘শালগ্রাম সাক্ষাৎ বাসুদেব’ এই বাক্য, শালগ্রামে বাসুদেব-বুদ্ধি করিবার জন্য হিন্দুর প্রতি আদেশ-বাক্য । ‘গুরু স্বয়ং ব্রহ্ম’ এই বাক্য গুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিবার জন্য, মাত্র শিষ্যের প্রতি আদেশ-বাক্য । গঙ্গাতিরিক্ত তীর্থ থাকিলেও গঙ্গার সাধককে সৰ্ব্বতীর্থ-বুদ্ধি করিতে হইবে ; ‘গঙ্গা সৰ্ব্বতীর্থময়ী’ এই বাক্যের দ্বারা তদ্বিবরেই আদেশ করা হইয়া থাকে । ঘটীতিরিক্ত বাদ্য থাকিলেও অন্য বাদ্যের অসঙ্গত-স্থলে ঘটায়ই সৰ্ব্ববাদ্য-বুদ্ধি করিয়া দেবপূজাদি করিতে হইবে, ‘ঘটী সৰ্ব্ববাদ্যময়ী’ এই বাক্যের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় । এই গুণি আদেশ-বাক্য, তোমাকে এই এই রূপে বুদ্ধি করিতে হইবে, এ ভাবের

উল্লেখ না থাকিলেও শাস্ত্রমতে উক্ত বাক্যগুলির তাৎপর্য তাহাই। পরস্পর বিভিন্ন সামগ্রী, ইহা সিদ্ধ থাকিলে সে বাক্যপদার্থ সাধক হইতে পারে না। অতএব ‘ঐতদাত্মামিদং সৰ্বং তৎ সত্যং’ এষ্ট শ্রুতির দ্বারা যদি আত্মাতিরিক্ত পদার্থের সত্যতা সাধন করা হইয়া থাকে, তবে ‘স আত্মা তত্ত্বমসি’ এই দুই অংশও পদার্থ সাধক নহে, সিদ্ধ-পদার্থে ব্রহ্মবুদ্ধি করিবার জন্য ষ্ঠেতকেতুর প্রতি আদেশ-বাক্য মাত্র। ‘সকলেই ব্রহ্ম’ ঐদৃশ বাক্য যে পদার্থ-সাধক, কুত্ৰাপি ইহার উল্লেখ নাই। অধিকন্তু, এই সকল বাক্য, আদেশবাক্য মাত্র তাহা ‘তমাদেশমপ্রাক্ষ্যে’ ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা উপক্রমেই স্পষ্টভাবে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শিষ্য। ষ্ঠেতকেতুর প্রতি এরূপ আদেশ করিবার প্রয়োজন কি ?

গুরু। ব্রহ্মচর্যাদির পর ষ্ঠেতকেতু যে অবস্থায় উপনীত হইলেন, সে অবস্থার উপাসনাই সকল বস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান করা। অবস্থাভেদে ‘একত্ব’ ‘পৃথক্ব’ প্রভৃতি বিবিধ বুদ্ধি সহ উপাসনার বিধান আছে। ভগবৎগীতার উক্ত হইয়াছে,

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখং ॥

‘স আত্মা’ ‘তত্ত্বমসি’ এই বাক্যদ্বয় যে উপাসনার্থ আদিষ্ট হইয়াছিল, ইহা অমুমান করিবার পক্ষে আরো হেতু আছে। যদি পদার্থ-তত্ত্বটী ষ্ঠেতকেতুর কর্ণে উপদেশ করাই পিতার উদ্দেশ্য হইবে, তবে পুত্রকে দীর্ঘকাল কঠোর ব্রহ্মচর্যাদিতে নিরোদ্ধিত করিয়া অধিকার প্রতীক্ষা করিতে হইত না। ষ্ঠেতকেতু যে অবস্থায় উপনীত হইলেন, সেই অবস্থার উপাসনাই আদিষ্ট হইল বলিতে

হইবে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থ অমূল্য করিলে জানিতে পারা যাইবে, সৰ্ব্বজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্বে সৰ্ব্বপদার্থে ব্রহ্মজ্ঞান করিবার শাস্ত্রীয় বিধি আছে। ঐ জ্ঞান আহার্য্য-জ্ঞান, অর্থাৎ ঘট-পটাদি ব্রহ্ম না হইলেও তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে হয়। এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পরে লিখিত হইবে। এক্ষণে পাঠক এইটুকু জানিয়া রাখিবেন, যেতকতক সৰ্ব্বজ্ঞ করাই পিতার উদ্দেশ্য। তাহার হেতু এই, পিতা উপক্রমে বলিয়াছিলেন “তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনা-শ্রুতংশ্রুতং ভবতামতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি।” অর্থাৎ “সৌম্য তুমি কি গুরুর নিকট এমন কোনও আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যদ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অসম্মত সম্মত হয়, অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়, অর্থাৎ সকল বিষয়েরই তোমার জ্ঞান হইতে পারে?” অতএব পুত্রকে যখন সৰ্ব্বজ্ঞ করা প্রয়োজন, তখন পূর্বে-কথিত ‘আহার্য্য’ জ্ঞানটাই যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই।

শিষ্য। ‘স আত্মা তত্ত্বমসি’ এট বাক্য যদি আহার্য্যজ্ঞানপর আদেশ-বাক্য হয়, তবে ‘ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্ব্বং তৎসত্যং’ এই অংশের দ্বারা আত্মাতিরিক্ত পদার্থের সত্যতা সিদ্ধ হওয়া উচিত। তাহা কি হইতেছে?

গুরু। এ পক্ষে এখনও সন্দেহ? ‘ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্ব্বং’ এই বাক্য ঘটক ‘এতৎ’ শব্দটী পরমাণুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার হেতু এই, অব্যবহিত পূর্বেই পরমাণু সংস্থাপিত হইয়াছে। অতএব ঐ বাক্যের অর্থ “এই নিখিল ভৌতিক জগৎ পরমাণুরাজ্য।” অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন, ঘট পটাদি সমুদায় ভ্রমজ্ঞানের বিষয়। সে মত খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন “তৎ সত্যং।” অর্থাৎ, এই সমুদয় প্রমাজ্ঞানের বিষয়। নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন ‘সৎ’

অর্থাৎ ‘সত্য’ বস্তু হইতে ‘অসৎ’ অর্থাৎ ‘মিথ্যা’ বস্তু জন্মিতে পারে না। শ্রুতিও তাহাই বলিলেন। গীতায়ও বলিয়াছেন ‘নাসত্যো বিদ্যাতে ভাবো নাত্যবো বিদ্যাতে সত্যঃ।’ অর্থাৎ শূন্য হইতে যেমন পারমাণ্বিক বস্তু জন্মে না, সেইরূপ ‘সৎ’ হইতে অপারমাণ্বিক বস্তু জন্মে না। এই বচনের বিশেষ বিচার মূল গ্রন্থে উষ্টব্য।

শিষ্য। “এতৎ” শব্দে পরমাণু বুঝিলেন কিরূপে? অব্যবহিত পূর্বে ‘পরমাণুর’ সংস্থাপন গগনকুম্ভমবৎ অলীক।

গুরু। শ্রুতিটী দেখ “বায়নসি সম্পদ্যাতে মনঃ প্রাণে প্রাণন্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং।”

শিষ্য। একি হাসির কথা বলিলেন। ইহা বিলীনাবস্থার বর্ণনা। সকল বস্তু লয় পাইয়া পরম দেবতাতে পর্য্যবসিত হয়। পরম দেবতা শব্দে ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে।

গুরু। দেবতা শব্দের শব্দার্থের দ্বারা কখনও ব্রহ্ম বুঝায় না। তবে লক্ষ্যার্থের দ্বারা ব্রহ্মকে দেবতা শব্দে গ্রন্থে এক একবার অভিহিত করা হইয়াছে। একারণ লক্ষ্যার্থের দ্বারা “পরস্যাং দেবতায়াং” শব্দে সাধারণ বুদ্ধিতে ‘ব্রহ্ম’ বুঝিবার কথা বটে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা চলিবে না। এখানে ‘পরস্যাং দেবতায়াং’ এই শব্দ পরিভাষাপর। কাহাকে এই পরিভাষা প্রদান করা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া দিতেছেন, যথা “স য এবোহগ্নিমা।” ‘পরাদেবতা’ শব্দে বর্দ ব্রহ্মই আনা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইবে তবে “স য এবোহগ্নিমা” এই অংশ প্রদর্শন করান ব্যর্থ হয়। অতএব এই অগ্নিমা শব্দের দ্বারা বুঝা গেল, প্রলয় কালে সৃষ্ট বস্তু পরমাণুতে পর্য্যবসিত হইল। সৃষ্টিকালে প্রথমেই তেজঃ জল প্রভৃতি বহু শরীর

ব্রহ্মই পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পরমাণু হইতে ঐ সকল সৃষ্টি করিয়া নিজে তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহা পরমাণুগুলক। তৎপরে বাহ্য সৃষ্ট হইল তৎসমুদয়ও পরমাণুগুলক। অতএব অগ্নিমা সিদ্ধ করিয়া ‘ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং তৎসত্যং’ এই শ্রুতি উত্তম সঙ্গত হইয়াছে। পূৰ্ব্বোক্ত তেজঃ, জল প্রভৃতি হইবার সময় সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম “বহু স্যাং প্রজায়েম” এইরূপ ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ‘সৰ্বং স্যাং প্রজায়েম’ এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। অতএব ‘ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং’ ইহার অর্থ ‘ব্রহ্মাত্ম্যামিদং সৰ্বং’ এরূপ করা অসঙ্গত। ‘বহু’ ও ‘সৰ্ব’ শব্দে অনেক প্রভেদ। ‘বহু বস্ত্র নীলবর্ণ’ বলিলে সৰ্ব বস্ত্র নীলবর্ণ বুঝায় না। এতদ্ব্যতীত, অগ্নিমাই যদি ব্রহ্ম হইবে, আর ব্রহ্মই যদি সকল বস্তু হইবে, তবে ‘ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং’ না বলিয়া ‘এষ আত্মা ইদং সৰ্বং’ অথবা ‘এষ ইদং সৰ্বং তৎসত্যং’ বলিলেই চলিত। ‘স আত্মা’ এই অংশ না বলিলেও তাহা হইলে কোনও হানি হইত না। অবিদ্যাগ্ৰন্য বিকার (বিবৰ্ত্ত) অভিপ্রায়ে যদি ‘যন্’ প্রত্যয় করিয়া ‘ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং’ রাখা হইয়া থাকে, তবে ‘তৎসত্যং’ এই অংশ লাগে না। কারণ অবৈতবাদিগণের মতে সৃষ্ট সমুদয় ভ্রম জ্ঞানের বিবয়। ‘তত্ত্বমসি খেতকেতো’ ইহার পরে ‘তৎসত্যং’ না দিয়া মধ্যস্থলে ‘তৎসত্যং’ দেওয়ার তদবধি সত্যত্ব-নির্ণয় হইয়া গেল ইহা অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। এতদ্ব্যতীত, সবিধস্থ শব্দের পর ‘তৎ’ প্রয়োগ না করিয়া ‘এতৎ’ প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। এখানে তাহাও করা হইয়াছে। অগ্নিমা উল্লেখের পরেই ‘ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং’ এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। পরবর্ত্তি বাক্যগুলিও যদি পরস্পরের সহিত ‘তাদাত্ম্য’ ব্যঞ্জক হইত, তবে এই ‘এতৎ’টী ব্যবহার করিয়া আবার ছাড়িতে হইত না। ‘আত্মা’

ইহাদের সহিত তাদাত্ম্য-বাক্যক নহে, “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ” এই বাক্যে বহুপূর্বে আত্মার সংস্থাপন থাকায় ‘এতৎ’ শব্দ পরিত্যাগ করতঃ ‘স আত্মা’ বলিতে হইয়াছে।

শিষ্য। ‘তৎসত্যং’ এই বাক্যের ‘তৎ’ কিরূপে রহিয়াছে? এখানেও ‘এতৎ’ প্রয়োগ করা তবে তো উচিত।

গুরু। সদ্জন্য পদার্থ সং হয়, ইহা প্রকাশ করিবার জন্যই ‘তৎ’ প্রযুক্ত হইয়াছে। ‘তৎ’ শব্দের অর্থ ‘তস্মাৎ’। সূত্রাং কোনও দোষ হয় নাই।

শিষ্য। ‘অগ্নিমা’ শব্দ ব্রহ্ম তাৎপর্যে না লাগাইলে অনেক দোষ ঘটে।

গুরু। কোনও দোষ নাই। ‘অগ্নিমা’ শব্দে ‘ব্রহ্ম’ এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না। ‘পরম্যাং দেবতাস্যং’ এবাক্যেরও লক্ষণা করিয়া ‘ব্রহ্ম’ বুঝিতে হইবে? ‘অগ্নিমা’ শব্দেরও লক্ষণা করিয়া ‘ব্রহ্ম’ বুঝিতে হইবে? যদি ব্রহ্মেই লক্ষণা করিতে হয় তবে ‘স য এবো-হগ্নিমা’ এই অংশ প্রদর্শন না করিলেও চলিতে পারিত ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ‘পরম্যাং দেবতাস্যং স য এবোহগ্নিমা’ এই ক্রতির আমরা যে মীমাংসা করিলাম, ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেবও সেই মীমাংসা করিয়াছেন। ‘ভূতেষু তঃ ক্রতেঃ’ এই সূত্রের ব্যাখ্যা কালে এবিষয় অগ্রে প্রকাশিত হইবে।





## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

‘সদেব সোম্যোদ মগ্ন আসীৎ’ ‘আত্মা এক এবাগ্ন আসীৎ’ ‘অসম্বা ইদ মগ্ন আসীৎ’ প্রভৃতি শ্রুতি সমূহের স্থারসিক ব্যাখ্যা। ব্রহ্মে ‘সমুগ্ন নিগুণ’ ‘কর্তা অকর্তা’ প্রভৃতি বিশেষণের সার্থক্য। পরমাণু সংস্থাপন। জায়মতে প্রকৃতির স্বরূপ নির্দেশ। ‘অজ্ঞামেকাং’ ইত্যাদি শ্রুতির স্থারসিক ব্যাখ্যা।

শিষ্য। আপনি পরমাণু সিদ্ধ করিলেন। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে অগ্নিমাди কিছুই ছিলনা। এক মাত্র ব্রহ্ম ছিলেন ইহা শ্রুতির মধ্যে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ‘ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থও ছিল’ এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মিথ্যা, এসম্বন্ধেও বিশেষ উল্লেখ শ্রুতির ভিতরই আছে।

গুরু। অশেষ ধীশক্তি-সম্পন্ন নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ বাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, শ্রুতি তাহার বিরোধে কথা বলিবেন, এমন হইতে পারে না। ‘ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ ছিল না’ একথা কোথায় স্পষ্ট লেখা আছে বল।

শিষ্য। এই দেখুন প্রথমেই বলিতেছেন, একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। যথা “সদেব সোম্যোদমগ্ন আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ঃ”। এই দেখুন তাহার পরেই বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ ছিল বাঁহারা



বলেন. তাঁহাদের মত ঠিক নহে। বথা, “এক আত্মসদেবেদ মগ্র  
আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। তন্মাদসতঃ সজ্জায়েত। কুতন্ত সোমোবাং  
সাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সবেব সোমোদমগ্র আসী-  
দেকমেবাদ্বিতীয়ং।”

গুরু। পূর্বাংশের দ্বারা ‘সং’ অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম’ ছিলেন ইহা সিদ্ধ  
হইতেছে। পরাংশে অর্থাৎ যে অংশে ‘অসং ছিল না’ বলিতেছেন, ‘অসং  
ছিল’ সেই অংশে সিদ্ধ হইতেছে।

শিষ্য। কিরূপে ?

গুরু। শূন্যবাদিগণের মতে ‘একমেবাদ্বিতীয়মসং’ সৃষ্টির পূর্বে  
ছিল। অর্থাৎ তাঁহার বালেন সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অভাব পদার্থ  
বিদ্যমান ছিল, দ্বিতীয় পদার্থ ছিল না। ‘অসং ছিল না’ ইহা যে  
অংশে প্রতিপাদিত হইতেছে, শূন্যবাদিগণের মত নিরাস করাই সেই  
অংশের উদ্দেশ্য। পরমাণুবাদও নিরাস করা যদি সে অংশের উদ্দেশ্য  
হইত, তবে ‘অসং’ এই শব্দে ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ বিশেষণ দেওয়া  
চলিত না। কারণ পরমাণু ‘অদ্বিতীয় অসং’ নহে, ‘সদ্বিতীয় অসং’।  
যেহেতু তাহা কোটি কোটি। স্রুতির পূর্বাংশের দ্বারা ব্রহ্ম ছিলেন  
প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন্ অর্থ ব্যঞ্জক ‘অসং’ ছিলনা, কোন্ অর্থ  
ব্যঞ্জক ‘অসং’ ছিল, তাহা পরাংশে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ‘ব্রহ্মই  
মাত্র ছিলেন’ যদি ইহা প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হইত, পূর্বাংশের  
দ্বারা ই সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত। হইলী অংশ দ্বিবার  
প্রয়োজন হইত না। প্রয়োজন হইলেও ‘অসতের’ উপর ‘একমেবা-  
দ্বিতীয়ং’ বিশেষণ দেওয়া চলিত না। “সবেব সোমোদমগ্র আসীং”  
ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাই সাধারণ বুদ্ধিতে ‘ব্রহ্মভিন্ন কিছু ছিল না’ ইহা  
বুঝিবার কথা। তাহার উপর স্পষ্ট করিয়া যদি বলা যায় ‘অসং’

ছিল না, তবে আর রক্ষা থাকেনা। জগৎ হইতে একেবারেই তত্ত্ব লোপ হইয়া যায়। এই কারণ সৃষ্টির পূর্বে কোন্ অর্থ ব্যাক্তক ‘অসং’ ছিল না তাহা দ্বিতীয় ক্রটিতে ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ বিশেষণ দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অসং ছিল এ বিষয়ের প্রত্যক্ষরও অগ্রে প্রদর্শিত হইবে।

শিষ্য। ‘অসং’ শব্দের দ্বারা কি পরমাণু লাভ হয় ?

গুরু। সং শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। সে ভাবে ধরিলে অসং শব্দের দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত বিচারে যে সদ্ধিতীয় অসং সংস্থাপিত হইয়াছে, পরমাণু সেই সদ্ধিতীয় অসত্তের অন্তর্গত।

শিষ্য। ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ শব্দে ‘সম্ভাতীয় দ্বিতীয় রহিত’ ও ‘বিজাতীয় দ্বিতীয় রহিত’ অর্থ করিতে হইবে। নচেৎ ‘এক’ ও ‘অদ্বিতীয়’ দুইটি শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় না। অতএব পরমাণু সিদ্ধ করিতে পারেন না।

গুরু। ‘স য এষোহণিমা’ এই সকল বাক্যের ব্যাখ্যা স্থলেও স্বয়ং দেখাইয়া পূর্বেই বুঝান হইয়াছে, বিজাতীয় দ্বিতীয় সামগ্রী সৃষ্টির পূর্বে ছিল। সকলের সহিত বিরোধ ঘটাইবার জন্য তোমার ইচ্ছামত ব্যাখ্যা কি স্বীকার করিতে হইবে? ‘এক’ ও ‘অদ্বিতীয়’ দুইটি শব্দের প্রয়োগ করায় কোনও দোষ ঘটে নাই। অনিশ্চিত পদার্থে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাতে হইলে ‘পুনরুক্তি’ দোষের মধ্যে নহে। এই বচনের মধ্যে কেবল মাত্র ‘এক’ ও ‘অদ্বিতীয়’ ইতর-ব্যাবর্তক নহে। ‘সদেব নোমোদমগ্র অসীং’ এইরূপে একবার উল্লেখ করিয়া আবার বলা হইয়াছে, ‘সদেবসোমেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং’ ইহাতে কি পুনরুক্তি থাকিয়া যাইতেছে না? রূপৰং বস্তুর মধ্যে জলীয়, তৈজস এবং পার্থিব পরমাণু নিত্য,

ইহা বুঝাইবার জন্য লিখিত হইয়াছে, ‘ত্রীণিরূপাণীতোবসত্যং’।  
 তুমি এই শ্রুতির বেক্রপই ব্যাখ্যা কর, এই শ্রুতিটী যে পুনঃ পুনঃ  
 উক্ত হইয়াছে তাহা উপনিষদ্ দেখিলেই জানিতে পারিবে। ‘ঐতদাত্ম্য-  
 মিদং সৰ্বং’ ইহা বুঝাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ দৃষ্টান্ত দিলেন, এবং  
 পুনঃ পুনঃ ‘ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং’ ইত্যাদি শ্রুতি উল্লেখ করিলেন।  
 অতএব অনিশ্চিত পদার্থে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাইতে হইলে পুনরুক্তি-  
 দ্বাৰা হয় না। “জপাং সিদ্ধি জপাং সিদ্ধি জপাং সিদ্ধিনঃ সংশয়ঃ।”  
 “সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।” ইত্যাদি বহু প্রয়োগই পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি  
 যদি মনস্তুষ্টি না হয়, তবে একমেবাদিতীয়ং এই শ্রুতিস্থ ‘এক’ শব্দের  
 ‘মুখ্য’ অর্থ গ্রহণ করিলেই সকল গোল মিটিতে পারে। কোষ যথা,  
একে মুখ্যান্ত কেবলাঃ। অদ্বৈতবাদিগণের ব্যাখ্যা স্মৃষ্ট নহে।  
 দ্বিতীয়রহিত বলিলেই যখন ইষ্ট সিদ্ধি হয়, তখন ‘সজাতীয় দ্বিতীয়  
 রহিত বিজাতীয়দ্বিতীয় রহিত’ একরূপ পৃথক্ ভাবে বলিতে হইবে  
 কেন? দ্বিতীয় রহিত বলিলেই যদি ইষ্ট সিদ্ধি হয়, তবে ‘লাল  
 দ্বিতীয় রহিত’ ‘পীত দ্বিতীয় রহিত’ ‘শ্বেত দ্বিতীয় রহিত’ ‘স্থূল দ্বিতীয়  
 রহিত’ ‘সূক্ষ্ম দ্বিতীয় রহিত’ একরূপ প্রয়োগ কি কেহ করিয়া থাকে?

শিষ্য। ‘সদেবসোমোদমগ্র আসীৎ’ ইত্যাদি শ্রুতির যে অংশে  
 ‘অসং ছিলনা’ বলিয়া স্পষ্ট নিষেধ রহিয়াছে, সেই অংশ হইতে ‘অসং  
 ছিল’ ইহা আপনি সিদ্ধ করিয়া লইলেন। যে শ্রুতিতে ‘অসং’ শব্দের  
 নান গন্ধ নাই, তাহার গতি কি হইবে? ঐতরেয়োপনিষদ্বাক্য  
 দেখুন “আত্মা একএবাগ্র আসীদ্ নাভ্যং কিঞ্চন যবং স ঐক্যত  
 লোকান সৃজত।”

শুধু। এক শ্রুতির দ্বারা যখন পদার্থান্তর সিদ্ধ হইতেছে, তখন  
 অন্য শ্রুতি সে পদার্থের ব্যাবৰ্ত্তক হইতে পারে না। যে শ্রুতির

উপাধি করিতেছে, উহা বিশেষ বিচার করিয়া দেখ। “ব্রহ্মবাক্য”  
পদার্থান্তর ছিল না এরূপ মর্মে ঐ প্রতিপন্ন দ্বারা আশ্রিত হইতেছে না। আশ্রয়  
প্রত্যক্ষাদি বিদ্যমান ছিল, তাহা ‘তদৈক্যত’ বাক্যেই প্রতিপন্ন হইতেছে।  
‘মিথঃ’ শব্দের, ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যই করিয়াছেন ‘ব্যাপারবৎ’। সুতরাং  
ঐ সকল বাক্যের দ্বারা বৈতনিক হইতেছে। ‘একমাত্র ব্রহ্মই  
সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন’ এরূপ প্রতিপন্ন অদ্বৈতবাদিগণ যখনই  
প্রদর্শন করিবেন, তাহা কর্তৃবিধায় লিখিত হইয়াছে এই মীমাংসা  
করিতে হইবে। অর্থাৎ সেইরূপ প্রতিপন্ন দ্বারা বুঝিতে হইবে “কর্তারূপে  
সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। দ্বিতীয় কেহ কর্তারূপে ছিলেন  
না।” “আত্মা এক এবাং আত্মান্যত্বং কিঞ্চন মিথঃ স ঐক্যত  
লোকানসৃজত” এই প্রতিপন্ন দৃষ্টে তোমার আপত্তি জন্মিতেছে। এই  
প্রতিপন্ন কর্তৃবিধায় লিখিত ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ‘নান্যত্ব  
কিঞ্চন মিথঃ’ এই অংশের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যই করিয়াছেন ‘ব্যাপারবৎ  
আর কিছু ছিল না।’ যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই না থাকে তবে  
“ব্যাপারবৎ আর কিছু ছিল না” এই অংশ বিশেষ করিয়া বলিতে  
হয় না। এই সকল প্রতিপন্ন সহিত বিরোধ পরিহার করতঃ  
নেহনানান্তিকিঞ্চন ইত্যাদি প্রতিপন্ন সমূহেরও এইরূপই মীমাংসা করিতে  
হইবে। গ্রামে বহু আনাড়ী চিকিৎসক সবেও বলা যাইতে পারে “গ্রামে  
চিকিৎসকই নাই।” এই চিকিৎসক শব্দটী সূচিকিৎসক তাৎপর্য্যে  
উক্ত, এইরূপ মীমাংসা করিতে হয়। গ্রামে অসার মনুষ্য থাকিলে  
বলা যাইতে পারে “গ্রামে একজন মনুষ্য নাই।” এই বাক্যস্থ মনুষ্য  
শব্দ সারবানু মনুষ্য তাৎপর্য্যে উক্ত এইরূপ মীমাংসা করিতে হয়।  
সেইরূপ বহুপদার্থসে যখন নেহনানান্তিকিঞ্চন এইরূপ প্রতিপন্ন পাওয়া  
যাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, আর আর সকল পদার্থই অসার; আর

পদার্থ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। মুখ্য কর্ত্ত্বরূপে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনও বস্তু নাই, এরূপ স্বীমাংসা করিলেও চলে। শুধু তাৎপর্যে উক্ত ঈশ্বর বাক্যের স্বীমাংসা পরে লেখা হইবে।

শিষ্য। এই জাতীয় শ্রুতি যদি কর্ত্ত্ববিধায় অথবা বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যে লিখিত হইয়া থাকে, উপাদান বিধায় ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ ছিল এতাবের শ্রুতিও তো এক আধটি থাকা প্রয়োজন।

গুরু। কেন থাকিবে না? সদ্ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ ছিল এবিষয়ে তৈত্তিরীয়োপনিষদে প্রমাণ দেখ, অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। এই শ্রুতির দ্বারা জানা যাইতেছে যে, সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থও ছিল। ব্রহ্ম ছিলেন ইহা 'সদেবসোমোদমগ্র আসীৎ' এই সকল শ্রুতির দ্বারা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছ। অসৎ হইতে সং জন্মিতে লাগিল। 'সং' শব্দে যেমন 'ব্রহ্ম' অর্থ পাওয়া যায় 'সত্তাবিশিষ্ট' অর্থও পাওয়া যাইতে পারে। 'অসৎ' হইতে সেই অর্থবাক্যক 'সং' জন্মিতে লাগিল। জনক অবশ্য ব্রহ্মকেই বলিতে হইবে। 'তদাত্মক' পদার্থগুলিও স্বয়ং করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাহার জনক স্বয়ং, বিভিন্ন জনক নাই।

শিষ্য। 'তদাত্মক পদার্থ' ইহার অর্থ কি?

গুরু। ওঁ তৎসং ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণ্ডবিধঃ সূতঃ অর্থাৎ 'ওঁ' 'তৎ' 'সং' এই তিনটীর প্রত্যেকটীর দ্বারা 'ব্রহ্ম' অর্থ বুঝাইয়া থাকে। অতএব 'তদাত্মক' শব্দে 'ব্রহ্মাত্মক' পদার্থ; অর্থাৎ 'ব্রহ্মা' 'বিকু' 'মহেশ্বর' 'কালী' প্রভৃতি। ইহাদের অগ্র জনক নাই। নিজেই জনক। এবিষয়ে আরও শ্রুতি রহিয়াছে যথা, অহং বহুমাং। এবং ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানিভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজামাহং ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥

শিষ্য। আপনি যে সকল ক্রটির এই ভাবে অর্থ করিতেছেন, তাহা সপ্তগুরুপর বলিব। সপ্তগুরুপর বলিলে অনাদিবেদ, সর্গজ্ঞতা, কৃতিমত প্রভৃতি সকল বিষয়েরই সৃষ্ট উপপত্তি হইতে পারিবে।

গুরু। ব্রহ্মে সপ্তগ, নিগুণ প্রভৃতি নানা রকমের অবচ্ছেদ কল্পনার আবশ্যকটা কি? ‘সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ’ এই ক্রটির পরেই ‘তদৈকত’ এই শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব ‘সৎ’ শব্দের পরিবর্তে এই ‘তৎ’ শব্দের নির্দেশ করা হইয়াছে বলিতে হইবে। তবে ঘটপটাদি ‘সৎ’ না হইল কেন? ছান্দোগ্যোপ-নিষদে নিগুণব্রহ্মের নাম গন্ধ নাই। উপক্রমে যে ব্রহ্মের কথা লিখিত, উপসংহারে “ঐতদাত্মমিদং সর্বং তৎসত্যং স আত্মা” ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মই বৃত্তিতে হইবে। নচেৎ উপক্রম উপসংহারের ঐক্য হয় না। বিশেষতঃ কারণরূপে যদি কৃতিমতাদি ব্রহ্মে সিদ্ধ হয়, তবে সে সকল সামগ্রীর নাশ কল্পাইলে গৌরব। যেহেতু সেই নাশের প্রাগভাব, তাহার নাশ, তাহার প্রাগভাব এইরূপে অনবস্থা ঘোষ ঘটয়া যায়। ভূতাদির স্মরণীয় কল্পাইলেও সেই ঘোষ। তবে আর কোন্ কার্যের জন্য নিগুণ ব্রহ্ম কল্পাইতে হইবে?

শিষ্য। নিগুণ ব্রহ্ম কোনও কাষে আত্মন, অথবা না আত্মন, অনেক সময় ব্রহ্মে ‘সপ্তগ’ ‘নিগুণ’ উভয় বিশেষণই পাওয়া যায়। ‘অকর্তা’ ‘কর্তা’ উভয় শব্দের প্রয়োগই পাওয়া যায়।

কৃত । শব্দ প্রয়োগের উপপত্তি করিবার জন্য ব্রহ্মে 'সত্ত্ব' 'নিগুণ' 'কর্তা' 'অকর্তা' প্রভৃতি নানারকমের অবচ্ছেদ্য করণা করিতে হইবে এক্ষণ প্রশ্ন কি আছে ? ব্রহ্মে 'সত্ত্ব' বিশেষণ দিবায় হানি নাই । যেহেতু তাহাতে নিত্যবোধ, নিত্যকৃতিময় প্রভৃতি বিদ্যমান । 'গুণ' শব্দে অনেক সময় 'সব' 'রজঃ' 'তমঃ' এই ত্রিবিধ সামগ্রী বুঝাইয়া থাকে । নৈয়ায়িকেরাও ইহাকে কণ্ঠ অদৃষ্টের মধ্যে পরিগণনা করেন । ব্রহ্ম তাহার অতীত । এই অতিপ্রায়েই ব্রহ্মে 'নিগুণ' বিশেষণ দেওয়া হইয়া থাকে । ব্রহ্ম সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর কর্তা । সূত্রায়ং 'কর্তা' বিশেষণ দেওয়া যাইতে পারে । আমরা কার্য্য করিলে অদৃষ্ট জন্মে, ফলভোগ হয় । কিন্তু ব্রহ্ম কর্তা হইলেও তিনি আমাদের তুল্য ফলোপহিত কর্তৃত্ববিশিষ্ট নহেন । ব্রহ্মে 'অকর্তা' বিশেষণ পাইলে, বুদ্ধিতে হইবে, তিনি ফলোপহিত কর্তা নহেন । তুমি যাহাকে 'কর্তা' বলিতেছ, তাহাকেই 'অকর্তা' বলিবে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে । ব্রহ্মের শাখায় কপিসংযোগ থাকে, সর্বত্র থাকে না । তথাপি, 'ব্রহ্ম কপিসংযোগী' এই প্রয়োগই হইবে, 'ব্রহ্ম কপিসংযোগী নহে' এরূপ প্রয়োগ হইবে না । যদি হয়, সকলে সে প্রয়োগ স্বীকার করিবে না । বিশেষতঃ ব্রহ্মের যে অবচ্ছেদে 'কর্তা' শব্দ প্রযুক্ত, সেই অবচ্ছেদেই 'অকর্তা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় যে সকল 'অঙ্গ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নিজের উপাধি অবচ্ছেদেই বলিতে হইবে । যেহেতু ঘট, পট, আমি, তুমি, শিব, দুর্গা প্রভৃতি সকল প্রয়োগই উপাধি-উপহিত ব্রহ্মে । সেই উপাধি-উপহিত ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

তস্ম্য কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারমব্যয়ং ।

'নত্বাবচ্ছেদে কর্তা' ও 'অব্যয়াবচ্ছেদে অকর্তা' এরূপ অর্থ করা

সঙ্গত সবে । আমরা কৰ্ত্তা ; স্বৰ্গ, নরক, অদৃষ্ট কলে গিলি হই ।  
শ্রীকৃষ্ণ কিস্ত তাহা হন না । তিনি বলিতেছেন,

নমাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।

এ বচন সঙ্গত করিবার জন্য বলিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জ্ঞান  
ঐ সকল ফলোপহিত কৰ্ত্তা নহেন । অতএব ‘অকৰ্ত্তা’ শব্দে তাহাই  
বুঝা উচিত । শ্রীকৃষ্ণকে পরম ব্রহ্মই বল, আর সৰ্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সকল  
প্রকার মোহাক্ষুন্নই বল, ‘কৰ্ত্তা’ ‘অকৰ্ত্তা’ শব্দের প্রয়োগ এক অবচ্ছেদেই  
রহিয়াছে বলিতে হইবে । এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মকে ‘সত্ত্ব’ বলিতে হইলে  
তোমাদের মতে সৃষ্টির পূর্বে ‘অবিদ্যা’ ছিল, বলিতে হইবে ।  
সৃষ্টির পূর্বে ‘পরমাণু’ প্রভৃতিই ছিল এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া  
যায় । অবিদ্যা নামক কোনও অতিরিক্ত পদার্থ ছিল ইহার  
প্রমাণ নাই । ঋতঞ্চ সত্যাকাশীকান্তপনোহধাজায়ত ইত্যাদি শ্রুতির  
দ্বারা জানিতে পারি যে, সাগর, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির উৎপত্তি বিষয়ে  
দুইটি সামগ্রী ছিল । নচেৎ ‘ঋত’ ও ‘সত্য’ দুইবার উল্লেখ করিবার  
প্রয়োজন হইত না । ‘ঋত’ ও ‘সত্য’ উভয়েই সমানার্থক । অতএব  
উভয়েই নিত্য, ইহা ঐ শ্রুতিতেই জানা বাইতেছে । অবিদ্যা নিত্য নহে,  
যেহেতু তাহার নাশ আছে । অতএব সাগর, সূর্য, চন্দ্রাদির  
উৎপত্তি-বিধায় পরমাণুই ছিল, অবিদ্যা ছিল না । ঋকিত নিষট্  
অর্থাৎ বেদাভিধানে ‘ঋত’ শব্দের ‘উদক’ ‘ধন’ ও ‘সত্য’ অর্থ করা হই-  
য়াছে । তুমি মনের মত অর্থ করিয়া পদার্থের লোপ করিলে চলিবে না ।

শিষ্য । ‘ঋত’ ও ‘সত্য’ দুইবার উল্লেখ থাকিলেও দুইটি পদার্থ সিদ্ধ  
করিব কেন ? সেরূপ অর্থ করাই যদি অভিপ্রেত হইত, তবে ‘ঋতে’  
‘সত্যে’ এইভাবে দ্বিবচন প্রয়োগ করিয়া একটি শব্দের দ্বারা ই কার্য  
নির্বাহ পাইত ।



শ্রুত । সমানই কথা । ‘বৃক্ষশ্চ বৃক্ষশ্চ’ এই ব্যুৎপত্তিতেই ‘বৃক্ষো’ সিদ্ধ হয় । বিশেষতঃ বিভিন্ন শব্দের দ্বারা যখন সত্য পদার্থ নির্দেশ করিতেছেন, তখন দ্বিবিচন দেওয়া চলে না । ‘তরু’ শব্দ ব্যবহৃত রহিয়াছে, ‘বৃক্ষ’ শব্দ ব্যবহার করিলেন না কেন, এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইতেও পারে না । বিশেষতঃ বিজ্ঞাতীয় দ্বিবিধ সত্য সংস্থাপন করা আবশ্যক-বিধায় বিবিধ শব্দের দ্বারা নির্দেশ করাই যুক্তিবৃত্ত । অতঃব এষ্ট ঋতিবাক্যে যে দ্বিবিধ সত্য পাওয়া বাইতেছে, তাহারই এক (জড়) জাতীয়কে পরমাণু সংজ্ঞা, অপর (চেতন) জাতীয়কে আত্মা সংজ্ঞা নৈয়ামিকেরা প্রদান করিয়াছেন । চকারদ্বয়ও সুস্পষ্ট ভেদসাধক ইহা ব্যুৎপন্নমাত্রেই জ্ঞাত আছেন । ব্রহ্ম নিতা বস্তু অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন পুরাণাদিতে এবিষয়ে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাও এক্ষণে যুক্তিবৃত্ত হইতে পারিল । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে,

সৃষ্ট্যন্ত্যুখঃ স্বকলয়াপি সসজ্জ সৃক্ষ্মাং

নিত্যাং সমেত্য সদসং তমজং ভজামি ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বারাও ইতিপূর্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে, সৃষ্টির পূর্বে অগ্নিমা ছিল । সৃষ্ট পদার্থ লয় পাইলে পুনরায় অগ্নিমাতেই পর্যাবসিত হইল । এই অগ্নিমাকে অবিদ্যা বলিতে পার না । বেহেতু অবিদ্যার নাশ আছে ।

শিষ্য । ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বারা পূর্বে যে পরমাণু সংস্থাপন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিচার এখনও বাকি আছে । তেজঃ পরমাণু দেবতারায়ঃ । স রূপোহনিমা । ঐতদাত্মামিদং সর্বং এই অংশের আপনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তেজস পরমাণু অন্য

নিখিল সৃষ্ট বস্তু এইরূপ অর্থই আসা উচিত। তাহা কেমন করিয়া  
সঙ্গত হয় ?

শুধু । ছান্দোগ্যোপনিষদ্ দৃষ্টে জানা যায় যে, প্রথম সৃষ্ট তেজঃ  
তৈজস পরমাণু মূলক । তৎপরে সৃষ্ট সকল বস্তুতেই, এমন কি সূর্য্য,  
চন্দ্র, বিহাং, অগ্নি প্রভৃতিতে পর্য্যন্ত রূপবৎ-ভূতাবিত্তর বিদ্যমান ।  
সুতরাং সৃষ্ট সকল বস্তুতেই তেজঃ বিদ্যমান, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের  
মত । অতএব পাশ্চাত্য সভাগণ যে বলিয়া থাকেন, সকল পদার্থেই  
নানাধিক ভাবে ‘ইলেকট্রিসিটি’ অর্থাৎ বিহাং আছে, তাহা মিথ্যা  
নহে । তৈজস পরমাণু উল্লেখ করতঃ ‘ঐতদাত্মামিদং সর্ব্বং’ বলা  
অসঙ্গত হয় নাই । ব্রহ্মহুত্রে ব্যাসদেবও বলিয়াছেন অসৌব চোপপত্তে-  
রেব উত্থা । সকল পদার্থেই তৈজসাংশ না থাকিলে স্ব স্ব পরমাণুতে  
পদার্থ সকল পর্য্যাবসিত হইয়া পড়ে । নৈয়ারিকেরা যাহাকে পরমাণু  
সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, সে বস্তু শাস্ত্রসিদ্ধ কিনা জানিতে হইলে  
ভগবৎগীতারও আলোচনা প্রয়োজনীয় । ভগবান্ কোন্ কোন্  
বস্তুতে প্রকৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিলেন তাহা প্রথমে দৃষ্টি কর,

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরক্ষধা ॥

অপরেষমিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ।

জীবন্তাং মহাবাহো যয়েদং ধাব্যতে জগৎ ॥

অর্থাৎ, ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, বোম, (ঐশ্বরিক) জ্ঞান,  
মিথ্যাজ্ঞানজনিত বাসনা, এই কয়েকটি সামগ্রী অপরা প্রকৃতি । এত-  
দ্রাব্যত, জীবন্ততা অর্থাৎ জীবে ভূতা বা জীবে হিতা প্রকৃতি পরা  
প্রকৃতি নামে অভিহিত । নৈয়ারিকেরা এই প্রকৃতিকে ‘অদৃষ্ট’ সংজ্ঞা

প্রদান করিয়াছেন। জন্য বাস্তবের প্রতি অদৃষ্টের কারণতা থাকার তাহাকে ‘পর্য প্রকৃতি’ সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। অপরা প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ অস্ত্র জীবের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃতি সংস্থাপন করিয়া তাহার কার্য্য বলা হইয়াছে,

এতদযোনীনি ভূতানি সৰ্ব্বাণীভূতপধারয়

অর্থাৎ ‘যাবতীয় ভূত প্রকৃতি মুগ্ধক।’ এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে প্রকৃতি অনাদি। পরা প্রকৃতি অর্থাৎ অদৃষ্টের অনাদিত্ব তদীয় ধারা লইয়া, ইহা নৈমিত্তিকপণ সিদ্ধ করিয়াছেন। সেই অদৃষ্ট-ধারার প্রযোজক অহংকার, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানজন্ত বাসনা। তাহারও ধারা লইয়া অনাদিত্ব বৃদ্ধিতে হইবে। আর আর যে সকল প্রকৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদেরও অনাদিত্ব কি এইরূপ ধারা লইয়া? ‘অপ এব সসজ্জাদৌ’ ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় জলধারা অনাদি নহে। অস্ত্র বাক্যের দ্বারাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যথা, “অব্যক্তাদানি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্ত-নিধনান্যেব”—অর্থাৎ ব্যক্ত-মধ্য ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, অব্যক্তেই পুনরায় তাহাদের নিধন অর্থাৎ লয় হইয়া থাকে। ভূতের অব্যক্ত অবস্থা অর্থাৎ নৈমিত্তিকেরা যাহাকে পরমাণু সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই বচনের দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে। \* অতএব

\* নৈমিত্তিকেরা কেহ কেহ বলেন, সৃষ্ট ক্রিয়াপতেজঃ প্রকৃতি পরমাণুপ্ৰা-  
রক্কন্তক। দীর্ঘজীবিত্য রক্ষনাথ শিরোমণি প্রভৃতি, বাহারা পরমাণু স্বীকার করেন না,  
তাহারা বলেন, ত্র্যসংগুপ্তই নিত্য চরম সূক্ষ্ম অবস্থা ভূতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত  
তদ্ব্যসার নামক গ্রন্থে জ্ঞানরত্ন মহাশয় এ বিষয় পরিপাটি ক্রমে বর্ণনা করিয়াছেন।  
আমরা পরমাণু নামে যে বস্তু সিদ্ধ করিতেছি, সৃষ্ট ক্রিয়াপতেজঃ প্রকৃতির উপাদান  
চরম সূক্ষ্ম দিত্যবরণপুঞ্জ সাধন করাই তাহার স্যংপর্য্য, এ দীর্ঘাশা বোধ হয়

ভুক্তধারায় অনাদিষ না থাকিলেও পরমাণুরূপী কিত্যাদিকে প্রকৃতি সংজ্ঞা দিয়া অল্প তৃতের আরম্ভরূপে তাহাদিগকে উল্লেখ করার, কোনও দোষ ঘটে নাই। অব্যক্ত অথচ মূর্ত কোনও সাবগ্ৰী নইয়া ব্রহ্ম নিখিল ভৌতিক জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহা মরা ততমিদং সর্বং জগদব্যক্ত-মূর্তিনা এই বাক্যের দ্বারাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 'অব্যক্তমূর্তিনা' এই পদ 'মরা' এই পদের বিশেষণ বলিয়া যেন কেহ বিখ্যাস না করেন। ব্রহ্ম মূর্ত-পদার্থ নহেন, ইহা সর্ব-সম্মত। অতএব জটিল ভাবে অন্বারসিক ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন কি? 'অব্যক্তেন' এইটুকুর মাত্র উল্লেখ থাকিলে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা চলিত। এতদ্ব্যতীত, ব্রহ্ম হিরণ্যমর্ত শরীর ধারণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, এবিষয়ের

অভিজ্ঞানের নিকট বিবৃত করা বাহুল্য। তবে, 'অব্যক্তানীনি জ্ঞানি' 'অব্যক্ত নিধনানোব', 'অব্যক্তমূর্তিনা' ইত্যাদি বাক্যের 'অব্যক্ত' শব্দ ত্রাসেরূপ পক্ষে সঙ্গত হয় কিরূপে ইহা অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। এ কারণ, 'অব্যক্ত' শব্দের কিরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তাহা মূল গ্রন্থে ত্রুটব্য। সংক্ষিপ্ত ভাষণার্থ্য্য এই, সহজে বাহার প্রত্যক্ষ হয় না, বাহার প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ উপকরণের আবশ্যক তাহা অব্যক্তের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। জলাধিতে এমন কীট বিদ্যমান বাহা সহজতঃ আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু বস্ত্র সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। এই সকল কীটকে কি ব্যক্ত কীট বলিতে হইবে? সেইরূপ গব্যাকবিবরণত সুখ্য-রশ্মি যোগে যদি কোনও ক্ষুদ্রতম বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব পায়, তাহাকেও অব্যক্ত বস্তুর মধ্যেই পরিগণিত করিলে হানি নাই। জারয়ত মহাশয়ের মতে আরো বিশেষত্ব এই, সূর্য্যরশ্মিযোগে গব্যাকবিবরণণে অন্ধকার গৃহে যে চরম সূক্ষ্ম বস্তু দৃষ্ট হইতে পারে, তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তু সমূহও বস্ত্র যোগে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ত্রাসেরূপ উক্ত বিশ্বর পক্ষেও দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এই সকল যুক্তি লইয়া মূলগ্রন্থে 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ ভাঙ্গা হইয়াছে।

বহু প্রমাণ আছে। অতএব 'অব্যাকৃষ্টি' ব্রহ্মই বা জগৎ সৃষ্টি করিলেন কই? বিশেষতঃ হিরণ্যগর্ভ শরীরের সৃষ্টিও 'অব্যাকৃষ্টি' হইতেই। এই 'অব্যাকৃষ্টি' সামগ্রীকে নৈরামিকেরা পরমাণু সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। 'অব্যাকৃষ্টি' বা ভৌতিক প্রকৃতির সাহায্যে যে সকল সৃষ্ট হইয়াছে, নাশকালে তাহারা কোথায় যাইবে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন,

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং ।

কল্পকয়ে, পুনস্তানি কল্পাদৌ বিশ্বজাম্যহং ॥

অর্থাৎ "সৃষ্ট ভূত সমূহ কল্পকয়ে প্রকৃতিতেই লীন হয়। কল্পাদিতে আবার ভূত সৃষ্টি করিয়া থাকি।" সেই সৃষ্টির সময় আবার প্রকৃতির সাহায্য লইতে হয় কিনা, এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ বলিতেছেন—

প্রকৃতিং স্বামবশ্চৈত্য বিশ্বজামি পুনঃপুনঃ ।

অর্থাৎ সহকারিণী প্রকৃতিকে লইয়াই আমি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।

শিষ্য। সাংখ্যমতানুযায়ীরা যাহাকে প্রকৃতি বলেন, তাহা কি তবে প্রকৃতি নহে? আপনি যাহা প্রদর্শন করাইলেন তাহাই কি তবে প্রকৃতির স্বরূপ?

গুরু। ভগবান্ যাহাকে প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই যে প্রকৃতি, এবিষয়ে সন্দেহ করিও না। অদৃষ্টকে প্রকৃতি বলে, ইহা গীতার তৃত্য নারায়ণদেও পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান্ অপরা প্রকৃতি রূপে পরমাধারি আরও কতিপয় বস্তুকে নির্দেশ করিলেন। অতএব 'প্রকৃতি' শব্দে এই সকল বস্তুই বুঝিতে হইবে। 'প্রকৃষ্ট

কৃতিবস্যা' এইরূপ অর্থ করিলে 'প্রকৃতি' শব্দ ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়া থাকে । তুর্গা কালী প্রভৃতি সেই জন্যই প্রকৃতি নামে অভিহিত হন । 'প্রকৃষ্টাচাসৌ কৃতিশ্চেতি' এই কর্তব্যধারয় সমাসের দ্বারাও 'প্রকৃতি' এই শব্দ নিষ্পন্ন হয় । যখন যেরূপ আবশ্যক, তখন সেইরূপ অর্থ করিতে হইবে । প্রকৃতিকে পদার্থান্তর স্বীকার করিতে হয় না । অদ্বৈত, পরমাণু প্রভৃতিকে প্রকৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । সেই প্রকৃতিই জগৎ উৎপন্ন করে, ব্রহ্ম অধ্বাক অর্থাৎ কর্তা থাকেন । প্রমাণ যথা,

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচরাচরং ।

কলে, সাম্ব্যামত খণ্ডন করা এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য নহে । প্রকৃতি শব্দের উপপত্তি ন্যায়মতে কতরূপ হইতে পারে তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করান হইল । বিজ্ঞ পাঠকগণ এইটুকু মাত্র এখানে জানিয়া রাখিবেন সাম্ব্যায় প্রকৃতির অথবা অদ্বৈতবাদের অবিদ্যার স্বরূপ নির্দেশক একটীও প্রমাণ ঐ সকল দর্শনকার এপর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন নাই । পক্ষান্তরে পরমাণু-সাধক প্রমাণ কোটী কোটী ।

শিবা । অদ্বৈতবাদের অবিদ্যা বা সাম্ব্যায় প্রকৃতির সাধক প্রমাণ, ঐ সকল দর্শনকার একটীও দেখাইতে পারেন নাই, এ কথাটা বলিতে পারেন না । একটী প্রমাণ তাঁহাদের আছে । এই দেখুন—

অজামেকাং রোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং

বহ্নীং প্রজাং সৃজমানাং সরুপাং ।

অজ্রোহ্যেকোজুযমানোহনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজ্রোহন্যঃ ॥

এতদ্ব্যতীত 'মারা' শব্দের উল্লেখ বহুস্থানে পাওন্না যায় ।

গুরু। মায়াশব্দ, হয় ব্রহ্ম তাৎপর্যো, নাহয় ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ  
 গুণ তাৎপর্যো, নাহয় অদৃষ্ট তাৎপর্যো, নাহয় সৃষ্টি সাধনোপযোগী  
 অপর কোনও উপকরণ তাৎপর্যো ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অদ্বৈতবাদি-  
 গণ ইহার যে স্বরূপ নিরূপণ করেন, সে স্বরূপ কোন' প্রমাণানুসারেই  
 সিদ্ধ হয় না। 'অজ্ঞামেকাং রোহিত গুরু কৃষ্ণাং' ইত্যাদি বচনটি  
 সাংখ্যমতে প্রকৃতি-সাধক এবং অদ্বৈতবাদি-মতে অবিদ্যা-সাধক  
 বিচিত্র প্রমাণ। কারণ স্বরস অন্বেষণ পূর্বক ব্যাখ্যা করিলে এই শ্রুতির  
 দ্বারা পরমাণুই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু ঐ শ্রুতান্ত প্রথম বক্তৃতা  
 রূপবিশিষ্ট। তৈজস পরমাণু, জগীয় পরমাণু, পার্থিব পরমাণুর রূপকে  
 যথাক্রমে 'রোহিত' 'গুরু' ও 'কৃষ্ণ' সংজ্ঞা ছান্দোগ্য উপনিষদেও  
 প্রদান করা হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থের যে কোন' রূপ এই রূপ-ত্রিতয়ের  
 সংমিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাও ঐ উপনিষদেই স্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে।  
 নৈয়ায়িকগণও পরমাণুর রূপ স্বীকার করেন। "সমবায়িকারণের  
 রূপই তৎ সময়েত পদার্থের রূপের কারণ" ইহাও নৈয়ায়িকগণেরই  
 মত। অতএব 'সরূপাং' এই বিশেষণেরও সার্থক্য আছে। তবে  
 যথাক্রমে দৃষ্টি করিলে ন্যায়মতের সহিত রূপ বিষয়ে যদি আপাততঃ  
 কোনও বিরোধ বোধ হয়, তাহার মীমাংসা অগ্রে লিখিত হইবে।  
 প্রজাজনন কার্যো 'রোহিত' সংজ্ঞক সামগ্রীই সর্বাগ্রে উপযোগী,  
 তৎপরে গুরু সামগ্রীর কারণতা, তৎপরে 'কৃষ্ণ' সংজ্ঞক সামগ্রীর  
 উপযোগ, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। এ শ্রুতিতেও সেই ক্রম  
 সূত্রকিত। সূত্রাং প্রথম লিখিত নায়িকা স্বরূপিনী অনাদি পদার্থটি  
 পরমাণুরূপিনী দেবতা। এই পরমাণু সাধক শ্রুতিটি লইয়া অদ্বৈত-  
 বাদিগণ 'অবিদ্যা' সাধন করিতে চাহেন। 'অবিদ্যা' কি রূপ-বিশিষ্ট  
 সামগ্রী? 'ত্রৈণিকপাণীত্যেব সত্যং' ইহাও ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত

হইয়াছে। ‘অবিদ্যা’ কি সত্য ? বিশেষতঃ ‘অজ্ঞোহেকঃ’ অজ্ঞোহিন্যঃ’ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা পরমায়া ও জীবায়া সিদ্ধ হইতেছে। জীবায়া পরমায়া একই সামগ্রী হইলে ‘অন্যঃ’ এই সূক্ষ্মই তেজ সাধক শব্দ প্রযুক্ত হইত না।

শিষ্য। পূর্বে যে নারিকা স্বরূপিণী অনাদি সামগ্রী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ‘একাং’ এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরমাণু কোটি, কোটি। সুতরাং ঐ সামগ্রী রূপবৎ হইলেও ‘পরমাণু’ সিদ্ধ করিলেন কিরূপে ?

গুরু। বাঙ্গালা ভাষায় ‘এক’ শব্দের ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া তোমার যে সংস্কার হইয়া রহিয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় ‘এক’ শব্দের অর্থ কেবল মাত্র তাহাই নহে, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোষ দেখ “একে মুখান্য কেবলাঃ।” এতদ্ব্যতীত, নীচরূপ সরূপ বিবিধ পরমাণু। তন্মধ্যে সরূপ-পদার্থ-সৃষ্টির প্রধান উপযোগী যে পরমাণু, তাহা একই জাতীয় অর্থাৎ সরূপ। ইহা জানাইবার জন্যও ‘একাং’ বিশেষণ প্রযুক্ত। যেহেতু, ‘এক’ শব্দের লাক্ষণিকার্থ ‘একজাতীয়’ হইতে পারে। ইহা পরে জানিতে পারিবে। তদ্ব্তিন্ন, অদ্বৈতবাদিগণের মতেও ‘অবিদ্যা’ নানা। তৎ সমষ্টিতে ‘এক’ ব্যবহার তাঁহারাও করিয়া থাকেন। ধান্য রাশিতে ‘একোমহান্ ধান্যরাশিঃ’ প্রয়োগ হয়; বৃক্ষরাজিতে ‘একাং বনং’ প্রয়োগ হয়। তদনুসারে ধরিলে পরমাণুরূপিণী প্রকৃতি সম্ভবিত্তেও ‘একাং’ ব্যবহার হইতে পারে। এইরূপে ‘অজ্ঞোহেকাং’ এই অংশের দ্বারা স্বারসিক ভাবে পরমাণুই আসিতে পারে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ ঐ অংশের দ্বারা সম্বন্ধসমুদ্ভূতপদার্থক পদার্থ সম্ভবিত্তি সিদ্ধ করিতে চাহেন। সরূপ করিলেও আমাদিগের কোন হানি সম্ভাবনা নাই।



স্বরূপমোক্ষগাত্যক পদার্থকে তাঁহারা বলিবেন 'অবিদ্যা', আত্মা বলিব 'অদৃষ্টাঙ্গা', ইহাই মাত্র বিশেষ। ধাক্কা খাইয়া অদৃষ্টের অনাদি নিম্ন ধাক্কা 'অজ্ঞাঃ' এই বিশেষণের সার্থক্যই হইয়াছে। সে বাহ্যহটক প্রথমাত্মের দ্বারা অদৃষ্টরূপিণী পরাপ্রকৃতি অথবা পরমাধু-রূপিণী অপরাপ্রকৃতি বাহাই সিদ্ধ কর, সেইটাকে প্রজাজনন-কার্য্যে রূপকভাবে নারিক। সাজাইয়া অপর একটি অনাদি পদার্থকে নারিক সাজাইয়াছেন। এই দ্বিতীয় অনাদি পদার্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। উভয়ের সহযোগে বাহা সৃষ্ট হইল, কর্ম্মকল অত্মসারে অপর একটি অনাদি পদার্থ সেই সমুদয় ভোগ করিয়া, মুক্তির পূর্বে তাদৃশ সদ্ধ পরিভ্যাগ করেন। এই অনাদি পদার্থ জীবাশ্মা। 'এনাঃ' এই শব্দের অর্থ 'অজ্ঞাঃ' অথবা 'প্রজ্ঞাঃ', বাহা অতিক্রমি তাহাই করা বাইতে পারে। 'বহ্নীঃ প্রজ্ঞাঃ সৃজমানাঃ সন্ধাঃ' এইরূপ পাঠ থাকিলেও 'এনাঃ' এই একবচনাত্ম প্রয়োগে হানি নাই। মুক্তির পূর্বে এক এক জীবাশ্মা এক এক দেহই পরিভ্যাগ করিয়া থাকেন। সে বাহ্যহটক 'অজ্ঞামেকাঃ' 'অজ্ঞোহ্যেকঃ' 'অজ্ঞোহন্যঃ' ইত্যাদি শব্দ সমূহের দ্বারা পরস্পর ভেদই তো সিদ্ধ হইতেছে। পরস্পরে অভেদও বিদ্যমান ইহা কোন্ অব্যভিচারী নিয়মের দ্বারা জানা গেল ? 'ষট্ভিন্নঃপটোষট্ভিন্নঃ,' 'বৃক্ভিন্নঃ জলং বৃক্ভিন্নঃ', 'এজাতীয় প্রয়োগকে সাধু করিবার জন্য বাগ্জাল বিস্তার কর্তব্য কি অস্বঃপ্রদর্শিত রীতিতে শ্রুতাদির ব্যাখ্যা কর্তব্য তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি বিচার করুন।





## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সর্বং ধ্বিনং ব্রহ্ম অহং ব্রহ্মস্মি প্রভৃতি বিবিধ ক্রতির  
স্বারসিক ব্যাখ্যা। স্তবাদির সীমাংসা। প্রত্যগ্ভূত মনু  
নেতি নেত্যাঙ্কা ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যাদি ক্রতির  
স্বারসিক ব্যাখ্যা। সাধর্মানাগতাঃ সামান্যুপৈতি  
ইত্যাদি বাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণের আবশ্যকতা।  
অদ্বৈত বাখ্যার বাধ। আহার্যজ্ঞানের  
আবশ্যকতা। তাহার বিরাম। প্রকৃত ব্রহ্ম-  
জ্ঞান এবং সর্বজ্ঞাবস্থা। মুক্তির কারণী-  
ভূত জীবতত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ।

শিবা। ‘ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং\*\* আত্মা’ এই ক্রতির যেরূপ অর্থ  
করিলেন, ‘সর্বং ধ্বিনং ব্রহ্ম’ ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’ ‘অহং ব্রহ্মস্মি’  
এ সমুদয় ক্রতির কি তবে ঐরূপ অর্থই করিতে হইবে?

তদা। এই গ্রন্থের পূর্ব পরিচ্ছেদ নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি কর এবং  
অন্য কোনওরূপ অর্থ করা যায় কিনা আগনিই বিচার কর। তদবৎ-

গীতার উক্ত হইয়াছে “অবজানন্তি মাং মূঢ়া মাহুযীঃ তনু মাপ্রিতং । পরং ভাব মজানন্তো মমভূতমহেশ্বরং ॥” অর্থাৎ “আমি সর্বভূতের দেহের ইহাই আমার পরম ভব । মূঢ় ব্যক্তিরাই আমাকে মনুষ্য-মহীষী বলিয়া অবজ্ঞা সহ স্থির করে । তাহার। আমার পরম ভব কিছুই জানেনা।” এইসকল প্রমাণ দৃষ্টেও বুঝা যায় তোমার ঐ শ্রুতিগুলি স্বরূপ-নির্দেশক নহে । ‘ষট্ স্বং ধর্ম্মরূপোহসি’ ‘আপো নারায়ণঃ স্বরং’ ‘শুক্রেব স্বরং ব্রহ্ম’ ‘শালগ্রামঃ স্বরং হরিঃ’ ‘সর্ববাদাময়ী ষণ্টা’ ‘সর্ব তীর্থানি জাহবী’ ‘অহং দেবোহথ নৈবেদ্যং’ ইত্যাদি বাক্য সমূহের ন্যায় ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ‘তত্ত্বমসি’ ‘সর্বং ধ্বিদং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি বাক্য সমূহেরও দ্বারা বুঝিতে হইবে, বিশেষ বিশেষ উপাসনাব্যবহার ঐ ঐ রূপ চিন্তার বিধি মাত্র । শ্রুতি বলিতেছেন

সর্বং ধ্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত উপাসীত ।

অর্থাৎ “ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্ম হইতে পালিত, ব্রহ্ম হইতে লীন সকল বস্তুই ব্রহ্ম, এই প্রকার চিন্তা করতঃ শাস্ত হইয়া উপাসনা করিবে।” অতএব বুঝা গেল ‘নাদেবো দেবমচ্চরেৎ’ ‘দেবো ভূষা যজ্ঞেদেবং’ ইত্যাদি বাক্যের তুল্য উপাসনা তাৎপর্য্যেই তোমার শ্রুতিগুলি উক্ত হইয়াছে । উপাসনাপর অধ্যায়সমূহ হইতে শ্রুতি সংগ্রহ করিয়া অবৈতবাদিগণ পদার্থ সিদ্ধি করিয়া থাকেন । কোন্ প্রণীত সাধকের উপাসনার জন্য ঐ সকল শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহাও আমরা বিশেষরূপে সমগ্রাণ করিয়াছি । ‘ষট্ স্বং ধর্ম্মরূপোহসি’ ‘আপো নারায়ণঃ স্বরং’ ‘সর্ববাদাময়ী ষণ্টা’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ষট্, জল বাদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে না । কিন্তু ‘সর্বং ধ্বিদং ব্রহ্ম’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ‘তত্ত্বমসি’ এই সকল বাক্যের দ্বারা

‘সর্বং’ ‘অহং’ ‘ত্বং’ এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব লোপ পাইবে, এমন অমোঘ হেতু তুমি প্রতির মধো কোথায় পাইলে ?

শিষ্য । পুরাণাদিতে বহু স্তবাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে দেখা যায়, ব্রহ্মকেই উদ্দেশ্য করিয়া অনেক স্থলে বলা হইয়াছে ‘তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি ক্ষিত্তি, তুমি জল, তুমি কৰ্ত্তা, তুমি কৰ্ম্ম, তুমি জ্ঞেয়, তুমি জ্ঞান, তুমি জ্ঞাতা, তুমি স্থল, তুমি সূক্ষ্ম, তুমি বাল, তুমি বৃদ্ধ, ইত্যাদি ।

গুরু । স্তব খুজিয়া খুজিয়া পদার্থ-উপপত্তি করিতে হইবে নাকি ? আরোপিত বাক্যের নাম স্তব ইহা পণ্ডিতমাত্রেই জ্ঞাত আছেন । পদ্ম-মাহাত্ম্যে উল্লিখিত হইয়াছে,

স্তুতিবাদমিমং মহা কুন্তীপাকে মহীয়তে ।

অর্থবাদ এবং স্তব যে অসত্য এবং পদার্থ-নির্গম বিষয়ে পণ্ডিতগণের অশ্রদ্ধের, কাশীধণ্ডেও তদ্বিষয়ে প্রমাণ যথা,

নার্থবাদোহয়মুদিতঃ স্তুতিবাদো ন বৈ মূনে ।

সত্যং যথার্থবাদোহয়ং শ্রদ্ধেয়ঃ সন্তিরাদরাৎ ॥

উদাহরন্তি যে মূঢ়াঃ কুতর্কবলদর্পিতাঃ ।

কাশ্যাং সর্বার্থবাদোহয়ং তে বিট্‌কৌটা যুগে যুগে ॥

অতএব, স্তাবক-বাক্য স্বরূপ-নির্দেশক প্রমাণ নহে । রাজাকে অনেক সময় ‘ত্বমর্কত্বংসোমঃ’ বলিয়া স্তব করা হয় । পরী সন্থদে উক্ত হইয়াছে ‘নগৃহংগৃহমিত্যাহগৃহিণীগৃহমুচ্যতে’ । সন্তানানুরাগী ব্যক্তি সন্তানকেই সর্বাপেক্ষা সার বিবেচনা করিয়া বলিয়া থাকেন “তুমি ধন, তুমি রতন, তুমি সব” । অতএব ব্রহ্মানুরাগী ব্যক্তি ব্রহ্মকে সার বস্তু বিবেচনা করিয়া “তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি জল,

‘তুমি স্থল, তুমি সব’ এ সকল বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহাতে বৈচিত্র্য কি ? শুভেই বল, আর ‘সৰ্বং ব্রহ্মময়ঃ জগৎ’ ‘অহং ব্রহ্মান্মি’ ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি প্রতিবাক্যেই বল, যেমন ব্রহ্মসম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তদ্রূপ ‘অহং’ ‘ত্বং’ ‘সকলং’ ইত্যাদি নিখিল বস্তু সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে । ‘স্বমৰ্কস্বঃসোমঃ’ এই বাক্যের দ্বারা সূর্য্যচন্দ্রের অস্তিত্বের অপলাপ হয় না, ‘গৃহিণী গৃহমুচ্যতে’ এই বাক্যের দ্বারা গৃহের অস্তিত্বের অপলাপ হয় না, ‘তুমি ধন, তুমি রতন’ এই বাক্যের দ্বারা ধনরত্নের সত্তার অপলাপ হয় না, কিন্তু তোমার প্রদর্শিত প্রতিগুলির মধ্যে যে ‘অহং’ ‘ত্বং’ ‘সৰ্বং’ প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর উল্লেখ রহিয়াছে সেই গুলিরই বিভিন্ন সত্তার অপলোপ হইবে, এ বিষয়ের কারণ কি ? জ্ঞাত ও নিত্য, প্রতিপাল্য ও প্রতিপালক, ভোগ্য ও ভোক্তা একই বস্তু, ইহা কোন্ প্রতির আদেশ ? ভোগ্যভোক্তৃত্ব, প্রতিপাল্যপ্রতিপালকত্ব, জ্ঞাতত্ব, এ সকল ব্যবহারিক দশায় মাত্র, প্রকৃত পক্ষে এ সকল কিছুই নহে, এ কথা বলিতে পার না। ব্যবহারিক দশায় পার্থক্য থাকিলে তদনুসারেই প্রতির ব্যাখ্যা করিতে হয়। আয়ুঃ ও মৃত্যুতে ব্যবহারিক দশায় পার্থক্য আছে বলিয়াই ‘আয়ুর্ঘৃতং’ এই প্রতির লক্ষণা করিতে হয়। প্রতি-বলে আয়ুঃ ও মৃত্যুতে অভেদ সিদ্ধি হয় না। তুমি অগ্রে কোনও অব্যভিচারী নিয়মে সপ্রমাণ কর যে, সকল প্রতি ও স্তববাক্যে যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে তাহাদের সত্তা ভ্রমমূলক ; তৎপরে প্রতি গুলির যেকোন অর্থ করিতে ইচ্ছা সেইরূপ অর্থই করিও। নচেৎ তোমার মনের মত অর্থ করিতে দিব কেন ? ব্রহ্ম প্রত্যক্ অর্থাৎ বিশ্ব-ব্যাপী, ইহা প্রতিতে উক্ত হইয়াছে। ‘প্রতি অঞ্চতি’ এই ব্যুৎপত্তিতে ‘প্রত্যক্’ এই পদটি সিদ্ধ। ‘প্রতি সামগ্রী’ যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, তবে ‘প্রত্যক্’ এই বিশেষণও একে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যেহেতু ব্রহ্মে

‘প্রত্যক্’ এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই হেতু তিনি প্রতি সামগ্রী হইতে ভিন্ন, ইহা নিশ্চয় করা উচিত হয় । প্রতিও বলিতেছেন-  
প্রত্যগবুলোহচ্ছুরপ্রাণোহ মন্য অকর্তা । প্রত্যগবুলমনুঃ ।  
ইত্যাদি । ব্রহ্মে নিখিল বস্তুই ভেদ বিদ্যমান, তাহা নেতিনেত্যায়া  
ইত্যাদি স্বরূপ-নির্দেশক শ্রুতিসমূহের দ্বারাও স্পষ্টই জানা যায় ।  
অতএব সকল শ্রুতির দ্বারা যাহাদিগের ভেদ সিদ্ধ হইতেছে, তুমি কেন  
তাহাদিগের বিভিন্ন সত্তা অস্বীকার করিবে, এ বিষয়ের কোনও শ্রুতি  
আছে কিনা ?

শিষ্য । ব্রহ্মবিদ্বব্রহ্মৈব ভবতি এই শ্রুতির দ্বারা জানা যায় যে,  
ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন ।

গুরু । ‘ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন’ এ কিরূপ ভীষণ  
কথা তোমার মুখে শুনিলাম ? ব্রহ্মের অজ্ঞাতা পুরুষকে কি তুমি ব্রহ্ম  
বল না নাকি ? তোমার মতে ব্রহ্মবিদ্ অবস্থায়ও ব্রহ্ম, তৎপূর্বেও ব্রহ্ম,  
তৎপরেও ব্রহ্ম । ‘ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ্ ভবতি’ এইরূপ প্রয়োগ থাকিলে বরং  
স্বরূপ-নির্দেশক হইতে পারিত । ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি’ এ কিরূপ  
স্বরূপ নির্দেশ করা হইল ? যুবা দেবদত্তো ভবতি, উপবীতী যজ্ঞদত্তো  
ভবতি, নিরয়গামী জীবো ভবতি, পুষ্পিতো বৃক্ষো ভবতি, এরূপ  
উদ্দেশ্য-বিধেয় হইতে পারে না । কিন্তু দেবদত্তো যুবা ভবতি, যজ্ঞ-  
দত্ত উপবীতী ভবতি, জীবো নিরয়গামী ভবতি, বৃক্ষঃ পুষ্পিতো ভবতি,  
এইরূপ উদ্দেশ্যবিধেয়ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । বিশেষ বিচার মূল আছে  
দ্রষ্টব্য । এক্ষণে এইটুকু মাত্র জানা উচিত এ জাতীয় শ্রুতি লক্ষণাপর  
বলিতে হইবে । ‘ব্রহ্ম বিদ্ মুক্তো ভবতি’ এই অর্থ করিতে হইবে ।

শিষ্য । লক্ষণাপর কেন বলিব ? ‘ঘটোদ্রব্যঃ’ এরূপ প্রয়োগ কি  
সাধু নহে ? ব্রহ্মের অজ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্ম কি না আমার বিচারের আব-

শ্রুত নাই। ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্ম, তাহাই এই শ্রুতির দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গুরু। ব্রহ্মকে তোমরা জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া থাক। জ্ঞান ও জ্ঞাতা একই বস্তু নহে ইহা লৌকিক নিয়মে আমার সিদ্ধ আছে। সেরূপ হইলে, বোধো বেত্তি, দ্বেষো দেষ্টি, ইচ্ছা ইচ্ছতি, ক্রুতিঃ করোতি, এই সকল প্রয়োগ স্বারসিক হইত। জ্ঞান ও জ্ঞাতা একই বস্তু যদি ইহা সিদ্ধ করিতে পার, তবে ‘ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মই’ এই বাক্যকে ‘ঘটোদ্রব্যং’ এই বাক্যের সহিত তুলনা করিতে পার, গুণ গুণীর অভেদ ঘোষণা করিতে পার, যেমন যেমন কথা বলিয়া থাক তেমনি তেমনি কথা বলিয়া পদার্থ উপপত্তি করিতে পার। কিন্তু যদি শ্রুতি গুলিকে স্বপক্ষে রক্ষা করিতে সমর্থ না হও, তবে তোমার সিদ্ধান্তে, তোমার দৃষ্টান্তে প্রামাণ্য-সংস্থাপন করিব কিসের বলে ? জ্ঞান ও জ্ঞাতা যখন এক বস্তু নহে তখন ‘ঘটোদ্রব্যং’ এষ্ট বাক্যের সহিত শ্রুতিটির তুলনা করিতে পার না। ‘সর্ববাদ্যময়ীঘণ্টা’ ‘আপো নারারণঃ স্বয়ং’ ‘গুরুরেব স্বয়ংব্রহ্ম’ ‘শালগ্রামঃ স্বয়ং হরিঃ’ ‘ঘট ঙ্গ ধর্মরূপোহসি’ ‘সর্বভীর্থানি জাহ্নবী’ ইত্যাদি বাক্যসমূহের সহিত ঐ জাতীয় শ্রুতির তুলনা করিতে হয় তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। স্তাবক বাক্য, অর্থাৎ ঐ জাতীয় শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষের প্রশংসা ঘোষণা করা হইয়া থাকে এইরূপ মীমাংসা করিলেও হানি নাই। প্রশংসা-তাৎপর্য্যে ‘বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুই’ এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা চলে। ‘ব্রহ্মের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন’ এই শ্রুতির ব্যাখ্যা আরও বহু প্রকারে করা যাইতে পারে। ‘ইব’ প্রয়োগের স্থলে অর্থাৎ যেখানে বহু সাধর্ম্মা বিদ্যমান, সেখানে কখন’ কখন’ তদ্বৎস্তর আরোপ এবং ‘এব’ প্রয়োগ সর্বসম্মত। যথা

“গৌরীাহিকঃ” “কুণটা পিশাচী” “অজস্বক এব” “লম্পটঃ পশুয়েব” “বাহুলতা” “মুখচক্ষু” ইত্যাদি। এইরূপ প্রয়োগ পরস্পরে ভেদ নাশক নহে। সাধর্ম্ম্য-ব্যঞ্জক। সাধর্ম্ম্য্য সিদ্ধি হইলে তো ভেদই সিদ্ধ হইয়া গেল।

শিষ্য। ‘সাধর্ম্ম্য্য’ শব্দের অর্থ কি ?

গুরু। ‘তদ্ ভিন্নত্বে সতি তদগত ধর্ম্মবস্তুঃ।’ অর্থাৎ যদি কোনও ভিন্ন বস্তুতে সমান কোনও ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তবে ‘সাধর্ম্ম্য্য’ প্রয়োগ হয়। নচেৎ ‘লক্ষণা’ করিতে হয়।

শিষ্য। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মের বিরূপ সাধর্ম্ম্য্য লাভ করে ?

গুরু। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি মুক্ত হয়। অদৃষ্টরাহিত্যাদি রূপ সাধর্ম্ম্য্যের দ্বারা আত্যন্তিক ঈর্ষ নিবৃত্ত্যাদি হইয়া থাকে। আর অম্ম, মৃত্যু প্রভৃতির দ্বারা ক্লেশ পাইতে হয় না।

শিষ্য। লম্পটঃ পশুয়েব, মুখচক্ষু এব, এই সকল প্রয়োগের সহিত তুলনায় ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মেব’ এই বাক্যের উপপত্তি আপনি করিতেছেন। অতএব আপনিও প্রতির শস্যার্থ রক্ষা করিতেছেন না। যদি শস্যার্থই না রহিল, তবে আপনাকে সাধর্ম্ম্য্য সিদ্ধি করিতে দিব কেন ? লক্ষণা সাহায্যে আমিই অভেদ সিদ্ধি করিয়া লইব।

গুরু। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ মত প্রবর্ত্ত করিবার জন্য যথেষ্টভাবে লক্ষণা করিলে চলিবে কেন ? আমি লক্ষণার দ্বারা সাধর্ম্ম্য্য-সিদ্ধি করিতেছি। তাহাতে শাস্ত্র রক্ষিতই হইতেছে। ভগবদ্ গীতায় উক্ত হইয়াছে

ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্য্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যধিস্থিচ ॥

অর্থাৎ “তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আমার সাধর্ম্ম্য্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আর শরীর



পরিগ্রহ করে না। নাশনিবন্ধনও কষ্টে পায় না।” অদৃষ্ট-বাহিত্যাদি রূপ সাধর্ম্যের দ্বারা ছুঃখ-মোচনাদি যাহা বলিয়াছি, সকলই গীতার পাইলে। পরমং সাম্যমুপৈতি প্রভৃতি শ্রুতিও দৃষ্টি করিলে অনুভব করিতে পারা যায়, মুক্ত জীব ব্রহ্মের তুল্য হয়, ব্রহ্ম হয় না।

শিষ্য। এ সকল বাক্যেরও লক্ষণা করিয়া অদ্বৈতপক্ষে আনয়ন করিব।

গুরু। অদ্বৈতবাদিগণ করিয়াছেনও তাহাই। ‘ইদং জ্ঞান-মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ’ এই সকল বাক্যের ভাষ্য করিবার সময়, শঙ্করাচার্য্য আনন্দগিরি প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণ লিখিয়াছেন ‘সাধর্ম্যা’ শব্দের মুখার্থ গ্রহণ করিলে ভেদ সিদ্ধি হইয়া যায়। এ কারণ ‘ব্রহ্মপদ’ এই অর্থ গ্রহণ করা হইল। ‘ঐশ্বর্যমসি’ ‘ব্রহ্ম-বিদ ব্রহ্মৈব ভবতি’ এ সকল বাক্য লাক্ষণিক। তত্বপরি তোমার ইচ্ছায় ‘মমসাধর্ম্যমাগতাঃ’ ‘পরমং সাম্যমুপৈতি’ ইত্যাদি বাক্যকেও লাক্ষণিক বলিতে হইবে। সব লক্ষণায় লক্ষণায় চলিল। জীব প্রকৃত কিরূপ বস্তু, শাস্ত্র মুখ্যভাবে তাহা খুলিলেন না। শাস্ত্রের উপর এমন দোষা-রোপ করা বৃত্তিযুক্ত নহে। যদি দৈবাৎ দ্বিবিধ বাক্য পাওয়া যায়, তথাপি ভেদ-সাধক বাক্যের লক্ষণা করা অশাস্ত্রীয়। অভেদ-সাধক বাক্যের লক্ষণা করা শাস্ত্র-সঙ্গত। এ বিষয়ে বিশেষ বিচার জানিতে হইলে মূল গ্রন্থে শক্তি ও লক্ষণার বিচার দ্রষ্টব্য। এখানে কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিতেছি। “ব্রহ্ম হইয়াছে” এই তাৎপর্য্যে ‘ব্রহ্ম সদৃশ হইয়াছে’ ‘ব্রহ্মতুল্য হইয়াছে’ ‘ব্রহ্মের সমান হইয়াছে’ এই সকল বাক্য প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু ভিন্ন বস্তু ব্রহ্মের ভায় হইলে ‘ব্রহ্মই হইয়াছে’ এরূপ প্রয়োগ করা যায়। সেইরূপ স্থলেই লক্ষণা দ্বারা অর্থ করিতে হয় ‘ব্রহ্ম সদৃশ হইয়াছে’। সং সন্মুখ্যকে

লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে ‘তিনি দেবতা’। লক্ষ্যার্থীদ্বারা অর্থ করিতে হয় ‘দেবতা সদৃশ’। কিন্তু দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায় না “তিনি দেবতা সদৃশ”। সাদৃশ্য বা তদ্ব্যাপ্তক কোনও শব্দ প্রযুক্ত হইলে, সে বাক্যকে লক্ষণাপর বিবেচনা করা অসম্ভব। তদ্ব্যাপ্তক বাক্যকেই লক্ষণাপর বুঝিতে হইবে। ‘মম-সাদৃশ্যামাগতাঃ’ একরূপ প্রয়োগ না থাকিয়া যদি থাকিত ‘মামাগতাঃ’, তাহা হইলে লক্ষণ-সাহায্যে ‘মম্মাগতাঃ’ ‘মৎস্বরূপম্মাগতাঃ’ একরূপ ব্যাখ্যা করা চলিত। অতএব সুস্পষ্ট ভেদ-সাধক প্রমাণ সকল বিদ্যমান থাকিতে ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’ ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি বাক্যকে ‘সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা’ ‘ঘট ইং ধর্মরূপোহসি’ ইত্যাদি প্রাপ্তক বাক্য-সমূহের সাহিত তুলনা না করা কেন? এতদ্ব্যতীত, ‘বহুবোধ্যতাঃ’ ‘বহুবো বৃক্ষাঃ’ ‘বহুবো জীবাঃ’ ‘দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে’ ‘দ্বাহুপর্ণা সযুজ্ঞা সখায়া’ ‘যতো বৈ ইমানি সর্বাণি ভূতানি’ ‘সর্বেবয়মতঃপরং’ ইত্যাদি লৌকিক অলৌকিক প্রয়োগ দুটাই বল, আর চাক্ষুষাদি অবলম্বনেই বল, বহু ঘট, বহু জীব প্রভৃতি সিদ্ধ হইতেছে। ওহ এক ভিন্ন হই নহে। স্মরণ্যং বহু পদার্থ সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। বহু অবিদ্যার দোহাই দিয়া এক ব্রহ্মে তুমি বহুব্বেদ উপপত্তি করিয়া থাক। তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। যেখানে কোনওরূপ গতাস্তর নাই ইহা বাদী, প্রতিবাদী উভয়ে একবাক্যে স্বীকার করেন, সেই খানেই বিশেষণের বহু লইয়া ধর্মের বহু অবধারণ করা হয়। যথা ‘বহ্বাঃ ঋতয়ঃ’ ‘বহ্ব্যাদিশঃ’ ইত্যাদি। কিন্তু স্মারসিক ব্যাখ্যা দ্বারা এক পক্ষ পদার্থের উপপত্তি করিতে যেহলে সমর্থ হইবেন, সেহলে অস্মারসিক ব্যাখ্যা কখনই গ্রাহ্য নহে। সেরূপ হইলে শব্দগত বহু লইয়া ‘একং গগনং বহুনি’, ঐশ্বর্যের বহু লইয়া

‘একো রাজা বহবঃ’ এ সকল প্রয়োগও হইতে পারিত। অতএব ‘অবিদ্যা’দি লইয়া প্রক্ষে বহু ব্যবহার’ এ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নহে। তর্কানুমানাদির দ্বারা এবং ‘অন্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যাস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ইত্যাদি বাক্যের বিচারের দ্বারা অগ্রে আরো সুস্পষ্টভাবে সপ্রমাণ করা যাইবে যে ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’ এইরূপ প্রয়োগ সমূহ ‘ঘটো-জব্যং’ এরূপ প্রয়োগের তুল্য নহে। কিন্তু ‘ঘট ইং ধর্মরূপোহস্মি’ ‘আপো নারায়ণঃ স্বয়ং’ ‘সর্ববাদ্যমগ্নীঘণ্টা’ এই সকল প্রয়োগের সহিত তুলনা করিতে হইবে এবং ‘ব্রহ্মবিদ্বব্রহ্মৈব ভবতি’ এই সকল বাক্যের লক্ষণা তুমি যে রূপ করিতেছ সে রূপ করা চলিবে না। আমি যে লক্ষণা করিতেছি তাহাই প্রকৃত লক্ষণা বুঝিতে হইবে। লক্ষণা না করিলেও ‘ব্রহ্মবিদ্বব্রহ্মৈব ভবতি’ এই শ্রুতির ব্যাখ্যা দ্বৈতপক্ষে হইতে পারে, কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে তাহা হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কেই কোনও কোনও শ্রুতিতে ‘ব্রহ্ম’ সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। যথা, যে ব্রহ্মণী বেদিতব্যো পরঞ্চাপরমেবচ। যুক্ত জীব শরীর পরিগ্রহ করে না, জীবব্রহ্মই থাকিয়া যায়। সেই অভি-প্রায়ে উক্ত হইয়াছে ‘ব্রহ্মবিদ্বব্রহ্মৈব ভবতি।’ ব্রহ্ম ও জীব সাধক যত শ্রুতি আছে, কৃত্রাপি অভেদ প্রদর্শিত হয় নাই, পরস্পরে ভেদই সংস্থাপিত হইয়াছে। যথা,

দ্বানুপর্ণা সমুজ্জা সখয়া সমানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে।

তয়োরনন্তঃ পিপ্পলং স্বাদন্ত্যনশ্লনন্তোভিচাকশীতি ॥

এই শ্রুতিতে ‘অন্ত’ শব্দটী ব্রহ্ম ও জীবে সুস্পষ্ট ভেদই সাধন করিতেছে। অভেদ সিদ্ধি হইবে কিরূপে? ‘ঘটভিন্নঃ পটো ঘটভিন্নঃ’ এরূপ প্রয়োগ সম্ভব নহে ইহা পূর্বেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম-

স্বত্বাদির দ্বারাও যে বৈতসিদ্ধি হইতেছে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। অতএব যথেষ্ট ভাবে স্বত্বাদির ব্যাখ্যা করতঃ অসম্ভব সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে।

শিষ্য। সকল বস্তু ব্রহ্ম নহে, অথচ উপাসনা বিশেষের জন্য ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিতে হয় ইহা আপনি বলিতেছেন। সুতরাং এই জ্ঞানটী ভ্রমজ্ঞান ইহা আপনাকে বলিতে হইতেছে। আমাদের যে অংশে ভ্রম নাই, অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে পৌছিলে সেই অংশে ভ্রম কিরূপে সম্ভব পাইতে পারে?

গুরু। সকল ভ্রম সম্ভব না পাউক, আহার্যাজ্ঞানাদি রূপ ভ্রম উন্নত স্তরেও সম্ভব পায় ইহা সকল অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। নচেৎ ‘অনুসঙ্গ’ হইতে পারে না। ‘দ্বারং’ বলিলে আব-  
শ্যক-স্থলে যোগিপুরুষেরাও আমাদের জ্ঞায় ‘দ্বারং পিনঙ্গি’ বুঝিয়া লইতে পারেন। ‘পিনঙ্গি’ এটা শব্দটী ‘দ্বারং’ এই শব্দের উত্তর-  
বর্তী না হইলেও উত্তরবর্তী বলিয়া যখন জ্ঞান হইয়া থাকে, তখন আহার্যাদি রূপ ভ্রম (তদভাববতি তৎপ্রকারক জ্ঞান) যোগি-পুরুষেরও হইতে পারে।

শিষ্য। আবশ্যকীয় স্থলেই যোগিপুরুষগণের সেরূপ জ্ঞান হইতে পারে। অনাবশ্যক স্থলে সেরূপ হইবে কেন? ব্রহ্মরূপে নিম্নলি বস্তুর জ্ঞান করিয়া যোগিপুরুষের লাভ কি?

গুরু। অনাবশ্যক নহে। ‘ব্রহ্মান্সি’ ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আপনাকে ‘ব্রহ্মত্ব প্রকারে’ বুঝিলে, আত্ম-পাতাদি শব্দা নিবৃত্তি পায়। তখন ‘আমি মরিব’ ‘আমি ক্লেশ পাওঁতেছি’ এই সকল ভাবিয়া কেহ আকুল হয় না। “সৰ্বং ব্রহ্মসমঃ অগং” “সৰ্বং ধৰিৎ

ব্রহ্ম” “বাসুদেবঃ সর্বমিতি” ইত্যাদি বাক্যমত ব্রহ্মরূপে নিখিল বস্তু জ্ঞানে ভাসিলে, শত্রু-মিত্র-জ্ঞান, ভাল-মন্দ-বিচার, ঘেব অনুরাগ সকলই তিরোহিত হয়। কেননা তখন বৈষম্য-বুদ্ধি থাকে না। উপাসনা-পথে ইহা একটি অল্প লাভের সামগ্রী নহে। ভগবদ্গীতার পঞ্চমাধ্যায়ে ভগবান্ বলিতেছেন

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সর্বভূতান্নভূতাত্মা কুর্ক্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব ধ্রুপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

ইহৈব তৈর্জিজ্ঞিতঃ স্বর্গো যেমাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ॥

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ।

যোহন্তঃস্থখোন্তরারামস্তথাস্তজ্জ্যোতিরেব যঃ

স যোগী ব্রহ্ম-নির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥

অতএব জানা গেল (ব্রহ্মভূতান্নভূতাত্মা হইলে অর্থাৎ) ব্রহ্ম-রূপে নিখিল বস্তু জ্ঞানে ভাসিলে যে অবস্থা হয় তাহাকেই ‘ব্রহ্মভূতঃ’ ‘ব্রহ্ম-নির্বাণ’ ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। নচেৎ “ব্রহ্ম-ভেদ জ্ঞান হইলে সম ও নির্দোষ হওয়া যায়, ব্রহ্মও সম-নির্দোষ”, এই অংশ বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করাইতে হয় না। “বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্ততে। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুহৃদ্বভঃ।” এই বাক্যের দ্বারাও স্পষ্টই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ‘বাসুদেব’ ও ‘সর্ব’ পার্থক্য আছে। যেহেতু সেই জ্ঞানে বাসুদেব ও সর্ব উভয় সামগ্রীই ভাসিয়া থাকে। অতএব এই সকল বাক্য

আহাৰ্ঘ্যজ্ঞানপর মাত্র। 'ব্রহ্মভূত' সংজ্ঞা প্রদান করিয়া যে অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞানপর অবস্থা নহে, শ্রীধর স্বামি প্রমুখ টীকাকারগণও এই কথাই বলিয়া থাকেন। মুক্তির পূর্বে 'আহাৰ্ঘ্য-জ্ঞান' ভাঙ্গিয়া গিয়া ব্রহ্মগত যথার্থ ধৰ্ম্মসমূহের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে তাহা পূৰ্বেকৃত 'আহাৰ্ঘ্য-জ্ঞানপর' বচনগুলির পরেই ভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যথা,

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সৰ্বলোক-মহেশ্বরং

সুহৃদং সৰ্বভূতানাং জাত্না মাং শান্তিমুচ্ছতি ॥

অতএব বুঝা গেল, ব্রহ্মরূপে নিখিল বস্তুর জ্ঞান মুক্তির পরম্পরা সাধক। ঐ জ্ঞানের পরে মুক্তির পূর্বে অগ্ররূপে ব্রহ্মজ্ঞানও হইবে।

শিবা। 'সৰ্বযজ্ঞ ভোক্তৃৎ', 'সৰ্বলোক-মহেশ্বরৎ', 'সৰ্ব-সুহৃৎ' প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মের দ্বারা যুগপৎ জ্ঞানের প্রসক্তি কি? বিশেষতঃ সৰ্বপদার্থের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার আমাদের কৈ আছে? সুতরাং 'সৰ্বলোক-মহেশ্বরত্বাদি' রূপে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। অতএব ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা স্মৃতস্ত।

গুরু। ব্রহ্মভেদ জ্ঞানাদির পর সৰ্বজ্ঞ মহাযোগী হইতে পারিব। সে অবস্থায় সৰ্বপদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকার, এবং 'সৰ্ব যজ্ঞভোক্তৃৎ' 'সৰ্বলোকমহেশ্বরৎ' 'সৰ্বসুহৃৎ' প্রভৃতি ব্রহ্মগত-অসাধারণ সকল ধর্ম্মের দ্বারা যুগপৎ জ্ঞান সম্ভব পাইবে। সেই অবস্থা, এবং তৎপরবর্ত্তি অবস্থার বর্ণনা অত্র ভগবান্ এইরূপ করিয়াছেন। যথা,

নাস্তি বুদ্ধিরবুক্তস্য নচাবুক্তস্য ভাবনা।

নচাতাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ স্মৃৎং ॥

শিবা। ব্রহ্মভেদজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান নহে, এবিষয়ে কি আরও স্পষ্টতর প্রমাণ আছে?

শুক। মুক্তির আসন্ন-কারণীভূত জ্ঞানই 'জ্ঞান' পদবাচ্য। প্রমাণ  
যথা “মোক্শেধীর্জ্ঞানমত্তত্ৰ বিজ্ঞানঃ শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।” নৈয়ায়িক  
আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ‘দেহদেহীর জ্ঞানই’ মুক্তির আসন্ন  
কারণ। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ও তাহাই বলিতেছেন। যথা,

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহ্ঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞথাপি মাং বিদ্ধি সৰ্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যন্তজ্ঞানং মতং মম ॥

এই ভগবদ্বাক্যে জানা যাইতেছে, ‘ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞানই’ ‘জ্ঞান’  
পদ-বাচ্য। অর্থাৎ ঐ জ্ঞানই মোক্ষের আসন্ন-কারণ। পূর্বাঙ্কের  
দ্বারা জানা যাইতেছে, শরীরের নাম ‘ক্ষেত্র’ এবং সেই ক্ষেত্রের  
জ্ঞাতা বলিয়া জীবের নাম ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’। পরাঙ্কে জানা যাইতেছে  
যে, নিখিল বস্তুর নামও ‘ক্ষেত্র’। সেই নিখিল বস্তুরূপ ক্ষেত্রের  
জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মও ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’। অতএব ‘সৰ্ব্ব-সৰ্ব্বজ্ঞ-জ্ঞান’ ও  
‘দেহ-দেহি-জ্ঞান’ ভেদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান দ্বিবিধ। এই দুই  
জ্ঞানকে ‘জ্ঞান’ বলিয়া উল্লেখ করায়, ইহারাই মুক্তির আসন্ন  
কারণ। অতএব ব্রহ্মরূপে সৰ্ব্ববস্তুর জ্ঞান মুক্তির আসন্ন-কারণ  
নহে। ব্রহ্মরূপে সকল বস্তুর জ্ঞান হইবার পরে, ব্রহ্মের যথার্থ  
জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা পূর্বেও বুঝান হইয়াছে, এখনও বুঝিতে  
পারিলে। কারণ ব্রহ্মরূপে নিখিল বস্তুর জ্ঞান হইলে, ‘সৰ্ব্বজ্ঞ’  
এই ‘বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান’ এবং ‘দেহী’ এই ‘বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান’  
অর্থাৎ ‘ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান’ হওয়া অসম্ভব।



## চতুদশ পরিচ্ছেদ ।

সাকারোপাসনার অতীতাবস্থা সমূহের ক্রম । ব্রহ্মভেদজ্ঞান ।  
পরাত্ত্বি । ব্রহ্মতত্ত্ব ও তৎসহ সৰ্ব্বতত্ত্বের সাক্ষাৎকার ।

জীবজ্ঞান । মুক্তি । জীবের নিত্যত্ব সংস্থাপন । সাকারো-

পাসনার আবশ্যিকতা । দৃষ্টান্ত দ্বিষ্টান্ত বিচার । যথা

সৌম্যৈকেন যৎপিণ্ডেন যথা নদ্যাঃ সান্ন্যমানাঃ সমুদ্রে

ইত্যাদি দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা । ন্যায়ের বিরোধে

আপত্তি । তাহার খণ্ডন । ব্রহ্মে ‘জ্ঞান’

‘বিজ্ঞান’ ও ‘আনন্দ’ শব্দ প্রয়োগের

তাৎপর্য । ন্যায়মত-সমর্থন ।

শিষ্য । মুক্তির পূর্বে ব্রহ্মরূপে সকল বস্তুর জ্ঞান একটি কারণ,  
ইহা কতিপয় শ্লোকে বুঝিয়াছি । অপর কতিপয় শ্লোকে বুঝা গিয়াছে,  
সকল বস্তুতে ‘ব্রহ্মজ্ঞান’ হইবার পর অন্তরূপেও ব্রহ্মজ্ঞান হইবে ।  
আবার এক্ষেপে বুঝিলাম ‘দেহীর জ্ঞানও’ মুক্তির পূর্বে আবশ্যিক ।  
এই জ্ঞান গুলির মধ্যে কোন্টী পূর্বে কোন্টী পরে হইবে, এবং আর  
কোনও জ্ঞানাদি হইবে কি না, এই গুলি কিরূপে জানিব ? আর,  
‘ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞান’ দ্বিবিধ ইহা প্রতিপন্ন হইল । তন্মধ্যে ‘দেহি



‘ঘটিতজ্ঞান’ যদি ‘সর্বজঘটিতজ্ঞানের’ পরে হয়, তবেই নৈমিত্তিকগণের সিদ্ধান্ত প্রকৃত, ইহা বুঝা যাইবে। ‘জীব-ঘটিত-বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞান’ পরে হইবে কে বলিল?

শুধু। ব্রহ্মভেদ জ্ঞানের পর কতগুলি অবস্থা হইবে, এবং ‘দেহ-দেহীর জ্ঞান’ সর্বশেষে হইবে কিনা নিম্ন-লিখিত ভগবদ্-বাক্যে তাহা বুঝা যায়। যথা,

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বৈষু ভূতেষু মদভক্তিং লভতে পরাং ॥

ভক্ত্যা মামভিজানন্তি যাবান্ বশচাম্মি তদ্বতঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং ॥

অর্থাৎ, ‘তদ্বমসি খেতকেতো’ ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ ইত্যাদি শ্রুতি মত জীবাত্মা ব্রহ্মরূপে জ্ঞানে ভাসিলে ‘অহং সুখী’ ‘অহং হৃদয়ী’ ‘অহমাকাঙ্ক্ষাবান্’ ইত্যাদি বুদ্ধি তিরোহিত হওয়ার শোক ও আকাঙ্ক্ষা দি রহিত হওয়া যায়। “সর্বং ধ্বংসং ব্রহ্ম” “একমেবাদ্বিতীয়ং” “বাসুদেবঃ সর্বমিতি” ইত্যাদি বাক্যমত নিখিল বস্তুতে ‘ব্রহ্মত্ব প্রকারে’ অভেদ-বুদ্ধি হওয়ার সর্বভূতে সমদর্শী হওয়া যায়। এইরূপে প্রসন্নাত্মা হইলে পর, জীব পরাভক্তি লাভ করে। পরা-ভক্তি লাভের পর, প্রকৃত ‘ব্রহ্মতত্ত্বের’ সাক্ষাৎকার হয়। ‘ভোক্তারং বজ্র-তপসাং সর্বলোক-মহেশ্বরং’ ইত্যাদি বাক্যে এবং ‘কেত্রজ্ঞ-কপি মাং বিজি’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের কোনও কোনও তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। অতএব পূর্বোক্ত “সর্বলোক-মহেশ্বর” ‘সর্বজ্ঞ’ ইত্যাদি রূপে সাক্ষাৎকার হইবার সময় সর্বপদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎ-কারও স্মরণ ঘটিয়া থাকে। এইহেতু এই অবস্থানটি সর্বজ্ঞ যোগীর

অবস্থা। সর্বজ্ঞযোগী পুরুষেরই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, এ বিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্তও নারদাদিতে বিদ্যমান। সে বাহ্য হউক, ব্রহ্মবিষয়ে টাই চরম জ্ঞান। এইরূপে ‘ব্রহ্মগত অসাধারণ যাবৎ ধর্ম পুরস্বারে’ ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পর, তদনন্তরবর্ত্তি উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা, ততঃ অর্থাৎ তৎপশ্চাৎ। তদনন্তরং বিশেষে, অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তিনমুপায়ং লভতে।)

শিষ্য। তৎপরবর্ত্তি উপায় কি ?

গুরু। ‘জ্ঞান’ শব্দে ‘সর্বসর্বজ্ঞজ্ঞান’ ও ‘দেহদেহিজ্ঞান’ বুঝাইয়া থাকে ইহা ‘ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং’ ইত্যাদি বাক্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ বাক্যান্তর্গত একটীর জ্ঞান হইয়া গেল, ‘পরবর্ত্তি জ্ঞান’ শব্দে ‘দেহ দেহীর তত্ত্ব সাক্ষাৎকারই’ বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। এত গুলি জ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্মরূপে নিখিল বস্তুর যে জ্ঞান, সেটাকেই ‘মিথ্যা’ বলা হইল কেন ? পরবর্ত্তী জ্ঞান গুলিকেই ‘তত্ত্বজ্ঞান’ না বলিয়া ‘মিথ্যা জ্ঞান’ বলা যায় না কি ?

গুরু। ভগবদ্-বাক্যের দিকে চাহিয়া দেখ। ব্রহ্মভূতজ্ঞানের পর পরাভক্তি। পরাভক্তির পর ‘তত্ত্বতো’ ব্রহ্মজ্ঞান। অতএব ‘ব্রহ্মভূত’ জ্ঞান ‘তত্ত্বতো’ ব্রহ্মজ্ঞান নহে। শেষের ব্রহ্মজ্ঞানই ‘তত্ত্বতো’ ব্রহ্মজ্ঞান।

শিষ্য। এই সকল বাক্যের কি অদ্বৈত-পক্ষে ব্যাখ্যা নাই ?

গুরু। না থাকিবে কেন ? পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবাদ আছে যে, পরম ভক্ত গোরাক্ষ বলিয়াছিলেন “গীতা বুঝা যায়, কিন্তু ইহার অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যা বুঝা যায় না।” অদ্বৈত-পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া তত্ত্বলোপ করিবার প্রয়োজন কিছুই নাই। ‘পরমং নামামুপৈতি’ ‘মম সাধন্য-মাগতাঃ’ ইত্যাদি বাক্যে পূর্বেই জানা গিয়াছে, মুক্তি হইলে

ব্রহ্মের সমান হওয়া যায়। এ সকল বাক্য কতদূর ভেদ-সাধক তাহা পূর্বেই বুঝান হইয়াছে। ‘অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যসৌক্তাঃ শরীরিণঃ’ এই সকল বাক্যের দ্বারাও সুস্পষ্ট ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা পরে লিখিত হইবে।

শিষ্য। অভেদ-বোধক ঋতিসকল কেবল ভাবনাপর, আচার অনুষ্ঠানের দ্বারাও কি তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ?

গুরু। সে নীতির পরিচয় সর্বত্রই। প্রাতঃকালে দেখ, প্রথমেই অভেদ চিন্তার বিধান। যথা

অহং দেবো নচান্যোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্ ।

সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥

পরেই ভক্তির বিধান। যথা

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব

শ্রীকান্ত বিশেষা ভবদাজ্ঞয়ৈব ।

প্রাতঃ সমুথ্য তব প্রিয়ার্থং

সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে ॥

পূজাকালেও দেখ, প্রথমেই অভেদ ভাবনা “অহং দেবোহহং নৈবেদ্যাং পুষ্পগন্ধাদিকঞ্চ যৎ। দেবাধারো হহং দেবো দেবং দেবার যোজয়েৎ ॥” শাস্ত্র রহিয়াছে “না দেবো দেবমর্চয়েৎ ॥” পরেই ভক্তিযোগে উপচারদান, স্তবপাঠ, প্রণাম প্রভৃতির বিধান। এইভাবে যথাপদ্ধতি উপাসনা করিতে করিতে, যতদিন ব্রহ্ম-ভেদজ্ঞান দৃঢ় না হয়, ততদিন শাস্ত্রনীতিই পূরমাস্থার পার্থক্য রক্ষা করিয়া ভক্তির ক্রমোন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। ব্রহ্মাভেদ-

জ্ঞান দূত হইলে, শাস্ত্রাদেশ আর কার্য্যকারী হয় না। অর্থাৎ সাকারোপাসনার আর প্রয়োজন থাকে না।

শিষ্য। ‘পরাত্ত্বি’ ‘প্রকৃতব্রহ্মজ্ঞান’ ‘দেহ দেহীর জ্ঞান’ প্রভৃতির জন্ত ব্রহ্মভেদজ্ঞানেরই যদি এইরূপ প্রয়োজনীয়তা হয়, তবে পূর্বোক্ত বিধানমত সাকারোপাসনাদি না করিয়া ব্রহ্মভেদ চিন্তা করিলেও ত হয়।

গুরু। ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ ইহা উচ্চারণ করিলেই ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ এ জ্ঞান দূত হয় না। শ্রুতি রহিয়াছে, বিবিদ্যিষন্তি যজ্ঞেন, অর্থাৎ যজ্ঞাদির অমুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানেচ্ছা করিতে হয়। ভগবান্ও তাহাই বলিতেছেন। যথা,

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তুঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্প্যথ ॥

অর্থাৎ ‘কথিত নিয়মে তোমরা দেবতাপণকে ভাবিতে থাক। দেবতারাও তোমাদিগকে ভাবিতে থাকুন। এইরূপে পরস্পরে পরস্পরকে চিন্তা কর, তাহাতেই তোমাদের মুক্তি হইবে।’ অতএব বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্মভেদজ্ঞানাদি যাহা আবশ্যক স্ব স্ব অমুষ্ঠানে থাকিলে, তাহা আপনিই হইবে। নিজ চেষ্টায় সে জ্ঞান আনিতে হইলে, কলিকাতার ব্রহ্মজ্ঞানী সাজা মাত্র ফল দাঁড়াইবে।

শিষ্য। অদ্বৈতপন্থীয় শ্রুতির মীমাংসা, আপনি পূর্ব্বেই বৈভূতপক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ সুস্পষ্ট অভেদ-সাধক কতিপয় দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। সেগুলিরও মীমাংসা করা প্রয়োজন। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,

যথা সোমৈম্যেকেন মৃত্তপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং

বিজ্ঞাতং স্মাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং

মৃত্তিকেত্যেব সত্যং ।

এই দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্টই তো বুঝা যাইতেছে, সমুদয় বিকার।  
একই অবিকৃত বীজ ।

গুরু। বীজ নিরূপণ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। বীজ জ্ঞানে  
অথবা অবিকৃত মূল পদার্থের জ্ঞানে কি অজ্ঞাত বিকৃত বস্তুর জ্ঞান  
অন্বে? তুগ্ৰোধ বৃক্ষ না দেখিলে কি বীজ দেখিয়া তুগ্ৰোধ বৃক্ষের  
জ্ঞান হয়? গুরু-দর্শনে কি শরীর-জ্ঞান সম্ভবে? অবিকৃত পদা-  
র্থের দ্বারা তদ্বিকারের জ্ঞান সম্ভব পায় না। গ্রন্থের উদ্দেশ্য  
লক্ষ কর। দৃষ্টান্ত গুলির পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, “সোম্য গুরু  
নিকট এমন কি আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, যদ্বারা অশ্রুত অসম্মত  
অবিদিত সকল পদার্থের জ্ঞানই তোমার হইতে পারিবে? অর্থাৎ  
গুরু কি এমন কোনও একটা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে  
উপদেশ সর্ব পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইবার কারণীভূত?” তৎপরে  
আশঙ্কা উঠিতেছে, একের দ্বারা এক বিষয়েই জ্ঞান হইবে,  
তদতিরিক্ত বস্তু যাহার বিষয় জ্ঞাত নহি, তৎসম্বন্ধে কিরূপে জ্ঞান  
হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখান  
হইতেছে যে, একটা জ্ঞান করিয়া দিলে অবিদিত সামগ্রীর জ্ঞান  
হওয়াও অসম্ভব নহে। একটা মৃত্তিকার সামগ্রী দেখাইয়া যদি  
তোমাকে মৃত্তিকার জ্ঞান করিয়া দিতে পারি, তুমি মৃত্তিকার  
অজ্ঞাত সামগ্রী দেখিলেও মৃত্তিকার সামগ্রী বলিয়া বুঝিতে পারিবে।  
কারণ, সে সমুদয় মৃত্তিকা তো সত্যই, কেবল নামধের বিকার

মাত্র। এইরূপে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রতিপাদন করিলেন, একটা জ্ঞানের দ্বারা পরে অবিদিত সামগ্রীরও জ্ঞান হয়। দৃষ্টান্ত-বাক্যের দ্বারা এইটুকু মাত্র কল এখানে গ্রহণ করা চলিবে। দৃষ্টান্তটিতে যেক্রমে যে হেতু-নিবন্ধন অবিদিত সামগ্রীর জ্ঞান হয়, দার্ষ্টান্তেও যে, সেইক্রমে সেই হেতু নিবন্ধন অবিদিত সামগ্রীর জ্ঞান হইবে, তাহা নহে। দৃষ্টান্ত-বাক্যে দৃষ্টান্তের হেতু কার্য্যকারী। দার্ষ্টান্তে অত্র হেতু কার্য্যকারী হইবে। দার্ষ্টান্তে যে অংশে বিভিন্নতা সিদ্ধ আছে, দৃষ্টান্ত সে অংশের উপর কোনও ক্ষমতা দেখাইতে পারে না। এবিধে বিশেষ বিচার জানিতে হইলে, মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ উক্ত হইল। যথা,

পাণ্ডুপুত্রো যথা ভীমো ভীমঃ কৰ্ণস্তথাহবে ।

দ্বয়োঃ সম্মুখযুদ্ধেযু ন জানে কিং ভবিষ্যতি ॥

যথা ভীম-স্কুলগদা সংঘাতয়তি বৈরিণং ।

দুর্য্যোধন-সহায়স্য কৰ্ণস্ত শায়কস্তথা ॥

হরিণেব ক্ষুধার্ত্তেন লক্ষ্যঃ ভীমেন লক্ষ্যতে ।

কর্ণো বিরাজতে যুদ্ধে মদক্ষরকরীন্দ্রবৎ ॥

এই কারিকার প্রথম কিরদংশের অর্থ এই ‘পাণ্ডুপুত্র ভীম যেমন যুদ্ধে ভয়ঙ্কর, কৰ্ণও তদ্রূপ। তাহাদের সম্মুখ-যুদ্ধে অদ্য যে কি কল হইবে জানি না।’ ‘কৰ্ণও তদ্রূপ’, এই দার্ষ্টান্তে বুঝিতে হইবে, ‘কৰ্ণও যুদ্ধে তদ্রূপ হৃদ্বর্ষ।’ দৃষ্টান্তে অর্থাৎ ভীমে ‘পাণ্ডুপুত্র’ প্রবেশ আছে বলিয়া, দার্ষ্টান্তে অর্থাৎ কৰ্ণে ‘পাণ্ডুপুত্র’ সিদ্ধ করা যাইবে না। কারণ, কৰ্ণ পাণ্ডুপুত্র নহে তাহা সিদ্ধ আছে। পূর্বেবক্ত কারিকাটির মধ্যাংশের অর্থ এইরূপ ‘ভীমের স্কুলগদা

যেমন শত্রু নির্মূল করে, হুযোথন-পক্ষীয় কর্ণের শায়কও তজ্জপ। ‘কর্ণের শায়কও তজ্জপ’ এই দাষ্টান্তে বুঝিতে হইবে ‘কর্ণের শায়কও তজ্জপ শত্রু নির্মূল করে।’ ‘কর্ণের শায়কও তজ্জপ হুল ও শত্রু-নাশ করে’ এতটা অর্থ আনা চলিবে না। গদায় ‘হুল’ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, গদারই শত্রু-নাশকতা শক্তির উৎকর্ষ প্রকাশ করিবার জন্ত। শায়কের হুলতা শত্রু-নাশকতা শক্তির উৎকর্ষ-ব্যাঞ্জক নহে। কারিকাদ্বীপে তৎপরে উক্ত হইয়াছে ‘ভীম ক্ষুধার্ত হরিষ ভায় লক্ষ্য বস্তুর উপর লক্ষ করিতেছেন।’ লক্ষ্য বস্তুর উপর লক্ষই মাত্র, দৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তে বিশেষ ধর্ম বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত-বাক্যে রহিয়াছে বলিয়া ভীমকে যুদ্ধকালে ক্ষুধার্ত বলিয়া স্থির করিতে হইবে না। ‘ক্ষুধার্ত’ বিশেষণ সিংহেরই উৎকৃষ্ট লক্ষ্যাক্স-সন্ধানের ব্যাঞ্জক। কারিকায় সর্বশেষে বলা হইয়াছে ‘কর্ণ মদক্ষর করীন্দ্রের জায় যুদ্ধে বিরাজ করিতেছেন।’ ‘মদক্ষর’ বিশেষণ দৃষ্টান্ত-হলাভিভূত করীন্দ্রেরই দুর্দ্ধর্ষতা-ব্যাঞ্জক, কর্ণের দুর্দ্ধর্ষতা সিদ্ধ করিবার জন্ত মদক্ষরণ রূপ হেতু কর্ণে টানিয়া আনিতে হইবে না। সর্ববস্ত্র ব্রহ্ম নহে ও ব্রহ্মের বিকার নহে, ইহা সিদ্ধ আছে। ‘নামধেয় বিকারের’ দোহাই দিয়া, এবং ‘মুক্তিকেতোব-সত্যঃ’ এই সকল উল্লেখ করিয়া দৃষ্টান্তটিকে মাত্র সূক্ষ্মত করিতে পারিয়াছেন। দাষ্টান্তে ওই সকল হইতে কিছু অনুমান করা চলিবে না। একটা মৃত্তিকা-দ্রব্য বুঝাইয়া দিলে, যাহা বুঝান হয় নাই, এমন মৃদবস্ত্রও পরে মৃদবস্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারিবে ; মাত্র সেই পক্ষেই হেতু হইতেছে, ‘সকল গুলিই তো মৃত্তিকা বটে, নামধেয় বিকার মাত্র বিশেষ।’ ‘ঐতদাভ্যামিনং সর্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি স্বেতকেতো’ এই জ্ঞানের পর অবিনশিত অশ্রুত

সকল পদার্থের জ্ঞান হইবে, এপক্ষে হেতু এই যে, ভগবৎ কৃপায় ঐ আত্মজ্ঞান ভাসিয়া গিয়া পরাভক্তি বলে সর্বজ্ঞ হওয়া যাইবে। এ বিষয় ইতি পূর্বে প্রমাণ সহ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সে যাহা হউক, একটা জ্ঞানের পর অবিদিত বস্তুর জ্ঞান হওয়া অসম্ভব নহে, দৃষ্টান্ত-বাক্যে ইহাই মাত্র বুঝান হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে বাসদেবও এই মীমাংসাই করিয়াছেন, পরে ইহা পাঠক জ্ঞাত হইতে পারিবেন। লোকের আগ্রহ-মোহকর এইরূপ আরো কয়েকটা দৃষ্টান্ত অষ্টমতবাদিগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে

যথা নদাঃ স্তান্দমানাঃ সমুদ্রে-

হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ

পরং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥

অষ্টমতবাদিগণ এই সকল দৃষ্টান্ত আপনাদের মনের মত করিয়া ব্যাখ্যা করেন। ফলে, এই জাতীয় সকল দৃষ্টান্তের অর্থই পূর্ব-প্রদর্শিত নিয়মে করিতে হইবে। “যথা হসন্ স্বং লভতে দরিদ্রঃ। দদাত্তি কর্ণো দ্রবিণং তথা হসন্” অর্থাৎ দরিদ্র যেমন হাসিতে হাসিতে অর্থ গ্রহণ করে, কর্ণ তেমনি হাসিতে হাসিতে ধন দান করিয়া থাকেন। এখানে পূর্বোক্তের সমাপিকা ক্রিয়া ‘গ্রহণ করা।’ পরোক্ষে সমাপিকা ক্রিয়া ‘দানকরা।’ সুতরাং এ অংশ দৃষ্টান্তে দার্ঢ্যে সাধারণ-ধর্ম নহে। ‘হসন্’ এই অসমাপিকা ক্রিয়াটাই উক্ত-সাধারণ ধর্ম বুঝিতে হইবে। “যথা নদাঃ স্তান্দমানাঃ সমুদ্রে-” ইত্যাদি প্রতি-বাক্যটিও ঠিক এইরূপ। নদী সমুদ্রে মিশ্রিত হয়, জীবাশ্মা ব্রহ্মের



সমান হন । সুতরাং সমাপিকা ক্রিয়ার ঐক্য নাই । তবে উভয়েই নাম রূপ পরিত্যাগ করে বটে । অতএব ‘নামরূপে বিহার’ এই অসমাপিকা ক্রিয়াই দৃষ্টান্তে দাষ্টান্তে ‘অজুগত ধর্ম’ বৃত্তিতে হইবে । মুণ্ডকোপনিষৎ যে ভগবদ্ গীতার সহিত অবিরোধী অগ্রে এ বিষয়ের আভাস দেওয়া হইবে । অনন্তশাস্ত্ররাশি হইতে যদি পাঁচ সাতটি জটিলার্থক দৃষ্টান্ত মিলিয়া থাকে, প্রতিশ্রুতিপুরাণেতিহাসের যাবৎ বাক্যদ্বারা উপপন্ন এবং প্রত্যক্ষাদি যাবৎ উপায়-লব্ধ পদার্থসমূহ, তদ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না । উর্ণনাভ হইতে যেমন জল নির্গত হয়, পুরুষ হইতে যেমন কেশ-লোম নির্গত হয়, অগ্নি হইতে যেমন ফুলিঙ্গ নির্গত হয়’ এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা বৃত্তিতে হইবে যে, জালের প্রতি, কেশলোমের প্রতি এবং ফুলিঙ্গের প্রতি যথাক্রমে উর্ণনাভ, পুরুষ এবং অগ্নি যেমন অপ্রধান কারণ মাত্র, প্রধান কারণ যেমন ব্রহ্ম, সেইরূপ নিখিল বস্তুর প্রতি আর যে যে কারণ থাকিতে পারে সকলেই অপ্রধান কারণ, প্রধান কারণ একমাত্র ব্রহ্ম । দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে উর্ণনাভ-ঘটিত এবং কেশলোম-ঘটিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের দ্বারা ইহাও বুঝা যাইতেছে, জালে ও উর্ণনাভে, কেশলোমে ও পুরুষে যেমন ভেদ সিদ্ধ, নিখিল বস্তুতে ও ব্রহ্মে সেইরূপ ভেদ সিদ্ধ । দৃষ্টান্তের দ্বারা এইরূপ আংশিক বিষয় মাত্র দাষ্টান্তে সিদ্ধ হইবে ।

শিষ্ট । একের দ্বারা অজ্ঞাত সামগ্রীরও জ্ঞান হইতে পারে, ইহাই মাত্র পূর্বোক্ত মৃত্তিকা-ঘটিত দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য আপনি বলিতেছেন । একের দ্বারা যে সকল পদার্থের জ্ঞান হইতেছে, সে পদার্থ গুলি তাহার বিকার নহে. একরূপ দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যাইত না ? অতএব মৃত্তিকা-ঘটিত দৃষ্টান্ত না দিয়া সেইরূপ দৃষ্টান্ত দিলেন না কেন ?

শ্রব । সেরূপ দৃষ্টান্ত কি গ্রহে নাই ? পাছে পদার্থ-নির্ণয়ে

লোকের কোনও ভয় ভয়ে, একারণ সৃষ্টিকা-বচিৎ কল্প ত্যাগ করিয়া  
কিরূপ করে উঠিয়াছেন দেখ,

যথা সৌম্যৈকেন লোহণিনা সর্বং

লোহময়ং বিজ্ঞাতং শ্রাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো

নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যং ।

এই দৃষ্টান্তে স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি, অমরসাস্তমণির সাহায্যে  
সকল লোহময় পদার্থের জ্ঞান হয়। অথচ সে সকল পদার্থ লোহের  
বিকার, অমরসাস্তমণির বিকার নহে। আরও দৃষ্টান্ত দেখ,

যথা সৌম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং

কার্ষ্যায়সং বিজ্ঞাতং শ্রাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো

নামধেয়ং কার্ষ্যায়সমিত্যেব সত্যং ।

নখনিকৃন্তনযন্ত্র কার্ষ্যায়স-বিকাশের হেতু হইলেও, উপাদান বিধায়  
হেতু মূল-কার্ষ্যায়স; নখনিকৃন্তন-যন্ত্র উপাদান-বিধায় হেতু নহে,  
ইহাই এই দৃষ্টান্তে বুঝান হইয়াছে। দার্ষ্টান্তেও বুঝিতে হইবে  
যে, ব্রহ্ম জগতের হেতু হইলেও, উপাদান-বিধায় হেতু মূল-পদার্থ,  
অর্থাৎ পরমাণু; ব্রহ্ম উপাদান বিধায় হেতু নহেন ।

শিষ্য। দৃষ্টান্ত গুলি জ্ঞানপর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল কই ?

গুরু। কি গুরুতর দোষারোপ ! দৃষ্টান্তগুলি জ্ঞানপর বলিয়া  
ব্যাখ্যা করিতে হইবে, মাথার দিব্য আছে নাকি ? এক বস্তুর দ্বারা  
অজ্ঞাত সামগ্রীর জ্ঞান হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তে সেই এক বস্তু ‘লোহমণি’  
‘নখনিকৃন্তন।’ দার্ষ্টান্তে সেই এক বস্তু ‘ব্রহ্মভেদজ্ঞান।’ তুমি  
দৃষ্টান্ত গুলিকে জ্ঞানপর বলিয়াছ বলিয়া আমাকেও কদর্থ করিয়া

সেইরূপ ব্যাখ্যাই রাখিতে হইবে নাকি? অদ্বৈতবাদিগণ যেখানেই শ্রুতি সাধক দিয়াছেন, পূর্বাপর পরিত্যাগ করিয়া লোকের নিকট প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, শ্রুতি গুলি সকলই অদ্বৈত-পর। সমগ্র গ্রন্থ আলোচনা করিলে কোন শ্রুতিই অদ্বৈতপর বলিয়া বোধ হয় না, ইহাই পরিতাপের বিষয়?

শিষ্য। আপনি অদ্বৈতবাদই না হয় খণ্ডন করিতেছেন, কিন্তু জ্ঞানের মতই কি ইহাতে সম্পূর্ণ সংস্থাপিত হইল? ‘ত্রীণি রূপা-  
নীত্যোব সত্যং’ এই সকল শ্রুতির দ্বারা পূর্বে পরমাণু সিদ্ধ করিয়া-  
ছেন। তাহা করিলে পরমাণুর রূপ রোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ হওয়া  
উচিত। যেহেতু, আপনার শ্রুতি রহিয়াছে, “যদ্রোহিতং রূপং  
তদগ্নেঃ, যচ্চক্লং তদপাং, বংকৃষ্ণং তদন্নস্য।” “অজামেকাং রোহিত  
শুক্লকৃষ্ণাং” ইত্যাদি বাক্যেও ঐপ্রকার রূপই সিদ্ধ হয়। জ্ঞান  
শাস্ত্রের কি তাহাই মত? আকাশ জন্মিয়াছে বলিয়া শ্রুতি প্রমাণ  
দেওয়া যায়। জ্ঞানশাস্ত্রের কি তাহাই মত? ব্রহ্ম সম্বন্ধে  
উক্ত হইয়াছে নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। জ্ঞানশাস্ত্রের কি ব্রহ্ম  
বিষয়ে ইহাই মত? অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া ‘মুরারে  
স্বতীরঃ পদ্মঃ’ না দাঁড়াইয়া যায়।

গুরু। তৈজস, জলীয়, পার্থিব পরমাণু যে রূপবৎ, ইহা শ্রুতির  
তুল্য জ্ঞান শাস্ত্রেরও মত। প্রমাণাদির দ্বারা সেই সেই পরমাণুর  
রূপ বাহ্য সিদ্ধ হইবে, তাহাই প্রকৃতরূপ। যদি সেই প্রমাণ-সিদ্ধ  
রূপের বিষয় উল্লেখ না থাকিয়া, অন্তরূপের প্রকাশক বাক্য কোথায়ও  
উল্লেখ থাকে, তবে তাহা পরিত্যাগের বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে  
হইবে। বাক্য দেখিয়া অজ্ঞান হইতে হয় না। সিদ্ধ পদার্থের  
সহিত বিরোধ-তর্জন করিবার জন্য ‘শক্তি’ ‘লক্ষণা’ প্রভৃতি বিবিধ

উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ‘আকাশ জন্মিয়াছে’ এইরূপ বাক্য পাইলে, অজ্ঞান হইতে হয় না। ‘যথা সর্বগতং সৌন্দর্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে’ এই বাক্যের দ্বারা কি আকাশের হৃদয় সিদ্ধ হইতে পারে? অতএব ‘সৌন্দর্য’ ইহার লাক্ষণিক অর্থ করিতে হইবে। শব্দ দেখিলেই অজ্ঞান হইতে হয় না। “ততো রাত্ৰ্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্গবঃ সমুদ্রাদর্গবাদধিসম্বৎসরোহজায়ত অহো রাত্ৰাণি—” এই শ্রুতির মধ্যে দেখা যায়, দিন, রাত্রি, সম্বৎসর সকলই জন্মিল। তা-বলিয়া ‘মহাকাল’ ‘জগৎ’ নহে। যেহেতু প্রমাণ রহিয়াছে, ‘অনাদি নিধনঃ কালঃ।’ ‘কালের বিভাগ জন্মিল’ এইরূপ অর্থই করিতে হইবে। পূর্বোক্ত শ্রুতির ভিতরই, ‘রাত্রি জন্মিল’ এ সম্বন্ধে হইবার উল্লেখ, ‘সমুদ্র জন্মিল’ উল্লেখ করিয়া আবার ‘অর্গব জন্মিল’ উল্লেখ। অতএব অর্থ-সঙ্কোচ করিয়া সিদ্ধ পদাথের অবি-রোধী করিয়া লইতে হইবে। আকাশের নিত্যত্ব-সাপেক্ষ প্রমাণ থাকিলে ‘আকাশ জন্মিল’ এই সকল কথারও মীমাংসা হইতে পারে জানিবে। ব্যাসসূত্র ব্যাখ্যা কালে এ বিষয় সপ্রমাণ করা হইবে। তুমি শ্রুতিগুলির স্থূল অর্থই বুঝিতে পার। দার্শনিক পদাথ-সাপেক্ষ অস্থান্য প্রমাণ তোমার বোধগম্য হইবে না। সকল প্রমাণ বঙ্গভাষায় প্রকাশেরও উপায় নাই। তবে একটা কথা ইহা জানিবে, আখ্যানদর্শনকারেরা কেহই শ্রুতি-বিরুদ্ধ দর্শন করেন নাই। শ্রুতি নানাদিকে লাগান যায় বলিয়া, শ্রুতার্থ স্থিরীকরণের জন্য এক-মাত্র নৈয়ামিকেরাই বিবিধ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। নিতাং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম এই প্রমাণ-বাক্য ন্যায়শাস্ত্রের বিরোধী নহে। কারণ এই বাক্যে জানা যায়, ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ নহেন। তিনি আনন্দ-স্বরূপ হইলে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগ

না করিয়া, প্রচলিত পুংলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগেই সে অর্থ আসিতে পারিত। প্রচলিত ‘আনন্দ’ শব্দ যে পুংলিঙ্গ ইহার প্রমাণ যথা, ‘স্তাদানন্দথুরানন্দঃশর্দ্বশাতস্থানি চ।’ ইত্যমরঃ। বিশেষ তাৎপর্য্যে প্রচলিত ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন বলিতে হইবে। (আনন্দস্বতীতি) ‘আনন্দঃ’ সিন্ধু কর্ণিবার জন্ত (আ + নন্দ + গিঙ + ড এইরূপে) ব্যুৎপত্তি করিতে হইবে। অতএব উহার অর্থ ‘আনন্দ-জনক’ বুঝিতে হইবে। (আ = সম্যক্, নন্দঃ = হর্ষঃ, যন্মাৎ, এইরূপে) বহুব্রীহি সমাস করিলেও ক্লীবলিঙ্গ থাকিতে পারে। সেরূপ করিলেও ‘আনন্দজনক’ অর্থ আসিবে। ব্রহ্ম যে আনন্দজনক, প্রবাদিতে তাহার প্রমাণ। ‘বিজ্ঞানঃ’ এই শব্দেরও অর্থ করিতে হইবে, (বিশিষ্টঃ জ্ঞানঃ যন্মাৎ অর্থাৎ) জ্ঞানজনক। অদ্বৈত-বাদি পক্ষীয় ব্যাখ্যা কোনও রূপে সম্ভব নহে। ‘জ্ঞানঃ’ বলিলেই ‘জ্ঞান-স্বরূপ’ বুঝিতে পারা যাইত, ‘বি’ উপসর্গের প্রয়োগ কেন? সকল জ্ঞানের স্বরূপ নহে, ব্রহ্ম বিশেষ-জ্ঞানের স্বরূপ এই হেতু নিবন্ধন উপসর্গটি প্রদান করা হইয়াছে, এ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নহে। ‘বি’ উপসর্গের সাহায্যে অপরাপর জ্ঞান বাবর্তন করিতে হইলে, ‘স্বপ্রকাশ-বোধ’ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া যায়। ব্রহ্ম ‘শির-শাস্ত্র-বোধ-স্বরূপ’ ইহাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। কোষ রহিয়াছে ‘মোক্ষার্থী জ্ঞানমন্ত্রা বিজ্ঞানঃ শিরশাস্ত্রয়োঃ’। অতএব এক তুচ্ছ আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে গিয়া, গুরুতর আশঙ্কার সৃষ্টির জন্য ‘বি’ উপসর্গ লক্ষণে প্রবিষ্ট নহে। বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে ‘জ্ঞানজনক’ অর্থ করিবার জন্তই ‘বি’ উপসর্গটি প্রদান করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ শরীর পরিগ্রহ করিয়া, ব্রহ্ম যে জ্ঞানযাতা হন, এ বিষয়ে প্রমাণ যথা, ‘জ্ঞানক শব্দাদিচ্ছং’

ইত্যাদি। অতএব পূর্বোক্ত বাক্যে বুঝা গেল, ব্রহ্মই ঐহিকে আনন্দদাতা ও মুক্তির জন্ত জ্ঞানদাতা। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ নহেন তাহাও ঐ বচনে সুস্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। সুতরাং ‘জ্ঞান’ বা তদ্ব্যচক ‘চিৎ’ ‘চৈতন্ত্য’ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এবং ‘আনন্দ’ বা তদ্ব্যধক কোনও শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দেশ থাকিলে অন্ততঃ ‘লক্ষণায়’ দ্বারা ‘জ্ঞান-জনক’ ‘আনন্দ-জনক’ এই অর্থ করিতে হইবে। ব্যাসসূত্র দৃষ্টে পাঠক অগ্রেই জ্ঞাত হইতে পারিবেন, বিনা লক্ষণায়ও ঐ অর্থ সিদ্ধ হইবে। জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক্ সামগ্রী। ব্রহ্ম-রূপক সাজাইবার প্রয়োজন কি? যদি দুইটা শব্দই এক সামগ্রীর বোধক হয়, তবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে হয় না। যদি অমরকোষাদির দ্বারা অভিধান করা প্রয়োজন হয়, তবে জ্ঞান-বাচক আর যে যে শব্দ আছে, আনন্দ-বাচক আর যে যে শব্দ আছে, সেগুলিরও কিছু কিছু উল্লেখ থাকিত। ঐ দুইটা সামগ্রীই ব্যবহারিক কোষে পৃথক্, পারমাণবিক হিসাবে এক, ইহা বুঝাইবার জন্ত ঐ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, এমীমাংসাও যুক্তিবৃত্ত নহে। ব্যাকহারিক-কোষে পাঠক্য থাকিলেই, তদ্বিরোধ-বেদকে লক্ষণাপর বলিতে হয়। নচেৎ ‘আয়ুর্দ্ব্যতং’ ‘স্বতমমৃতং’ ইত্যাদি শ্রুতি-বলে আয়ুঃ, স্বত ও অমৃত একই পদার্থ হইয়া যায়। এইরূপ বিবিধ স্বরস থাকার ব্রহ্ম, জ্ঞান, আনন্দ সকলই পৃথক্ সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ‘আয়ুর্দ্ব্যতং’ ‘স্বতমমৃতং’ ইত্যাদি শ্রুতি-মত ‘আনন্দজনক’ ‘জ্ঞানজনক’ ইত্যাদি অর্থ করিতে হইবে।

নিতাঃ বিজ্ঞানমানন্দঃ ব্রহ্ম এই প্রকার শ্রুতির কোনও কোনও অস্তিত্ব সস্তাদায় আর এক কোশলে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ‘অধম্যাদ্ জায়তে দুঃখং ধর্মাদুৎপদ্যতে সুখং’ ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে তাঁহার

বলেন, যখন ‘সুভাদৃষ্টজন্মতাবচ্ছেদকত্বে’ ‘আনন্দ’ জাতি সিদ্ধ, তখন নিত্য-ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ হইতেই পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মে যে ‘আনন্দ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা পারিভাষিক, অর্থাৎ ব্রহ্মের ‘আনন্দ’ একটি নাম মাত্র। সর্বনামের মধ্যে ‘সর্ব’ শব্দ ধৃত হইয়াছে। শিবেরও একটি নাম ‘সর্ব’। উভয়েই কি সাজাতা আছে বুঝিতে হইবে? সর্বনাম-বাচক-শব্দের মধ্যে ‘তৎ’ শব্দ ধৃত, ব্রহ্মেরও একটি নাম ‘তৎ’। তা বলিয়া কি পরস্পরে একই বস্তু? উক্ত অভিজ্ঞ সম্প্রদায় আরো বলেন ‘সুখ’ ‘আনন্দ’ প্রভৃতি যে কয়েকটি নামের দ্বারা ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, আমরাও তদ্বারাই ব্রহ্মকে অভিহিত করিতে পারিব। নিত্যাং বিজ্ঞান-মানন্দং ব্রহ্ম এই জাতীয় প্রয়োগ পাইয়াছি বলিয়া, নিত্যং বিজ্ঞান-মামোদং ব্রহ্ম, নিত্যং বিজ্ঞানং মুদ ব্রহ্ম, নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দধুব্রহ্ম ইত্যাদি প্রয়োগ যদৃচ্ছাক্রমে করিতে পারিব না। ঐ সকল শব্দের মধ্যে যেগুলির দ্বারা ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, সেই গুলিই মাত্র ব্রহ্মের নাম। যখন সংজ্ঞাস্তর হইল তখন ‘আনন্দং’ এইরূপ ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগেরও স্বারসিকতা রহিল। ‘জ্ঞান’ ‘বিজ্ঞান’ ‘চিং’ ‘চৈতন্য’ ‘বোধ’ ইত্যাদি প্রয়োগ সম্বন্ধেও ঐ অভিজ্ঞ সম্প্রদায় এই ভাবেরই মীমাংসা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম এইরূপ প্রয়োগ পাইয়াছি বলিয়া, সত্যং বুদ্ধিরনস্তং ব্রহ্ম, সত্যমুপলব্ধিরনস্তং ব্রহ্ম, সত্যং শেমুখী অনস্তং ব্রহ্ম, এই সকল প্রয়োগ যদৃচ্ছা ক্রমে কেহ করিতে পারিবে না। এই সকল শব্দের মধ্যে যে যে শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, তদ্বারাই ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতে হইবে। বেহেতু এইগুলি ব্রহ্মের নামমাত্র, সেইহেতু নিত্যাং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম এই প্রতিবলে ব্রহ্ম শিরশাস্ত্রবোধস্বরূপ হইতে পাইলেন না। এই

সকল বিবিধ যুক্তি নিবন্ধন জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, আনন্দ, সুখ, চিং, চৈতন্য, বোধ ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মের নাম মাত্র। ইহাদের স্বরূপ তিনি নহেন। এ সকল যুক্তিও ভাবিবার বিষয়। যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদু এই সকল শ্রুতিবাক্যই মাত্র ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দেশক। ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব-সাধক বহু যুক্তিই নৈয়ায়িকেরাও প্রদর্শন করাইয়াছেন। ফলতঃ ত্রায়শাস্ত্রের সর্বাংশ সংস্থাপন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। ত্রায়শাস্ত্রের পদার্থ সাধক প্রমাণ সকল দৃষ্টি করিতে হইলে, ত্রায়শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন কর। এখানে এইটুকু মাত্র জ্ঞানিবে, যাঁহা ভিন্ন বলিয়া দেখিতেছি, ব্যবহার করিতেছি, ইহারা কেহই ব্রহ্ম নহে। বিভিন্ন 'সত্য', অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয়ীভূত সামগ্রী। তন্মধ্যে কেহ 'জ্ঞাত', কেহ 'নিত্য', ইহাই অশেষ ধীশক্তি-সম্পন্ন নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গীতায় পঞ্চদশাধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিতেছেন। যথা,

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরচ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥

উভয়ঃ পুরুষস্তনুঃ পরমাত্ত্বোভ্যুদাস্ততঃ ।

যৌ লোকত্রয়মাবিশ্চ বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

‘জ্ঞাত’ ও ‘নিত্য’ ভেদে দুইপ্রকার পদার্থ ভগবদ্বাক্যের দ্বারা ই প্রাপ্তি পন্ন হইতেছে। অধিক প্রমাণ দেওয়া নিম্নয়োজন।

শিষ্য। ‘পুরুষ’ শব্দে ‘পদার্থ’ বোধ হয় নাকি ?

গুরু। ‘পুরুষ’ এইশব্দ এস্থলে পরিভাষাপরমাত্র। স্ত্রীপুরুষের পুরুষ নহে। পদার্থকেই ‘পুরুষ’ সংজ্ঞা বা পরিভাষা প্রদান করা হইয়াছে। অতএব ঐ ভগবদ্বাক্যে বুঝা যাইতেছে যে, সমুদয় বস্তুই ক্ষর অর্থাৎ



অন্ত। কেবল কতিপয় বিশেষ সামগ্রী মাত্র নিত্য। কূটস্থ অর্থাৎ শরীরস্থ (জীবাশ্ম), অক্ষর অর্থাৎ নিত্য। অন্ত যে পুরুষ, অর্থাৎ ক্ষর ও কূটস্থ অক্ষর ভিন্ন যে পুরুষ, তিনি উত্তম অর্থাৎ উত্তমাক্ষর।

শিষ্য। জীবাশ্ম ও পরমাত্মাকে নিত্য বলা হইল। পরমাণু প্রভৃতিকে লক্ষণে ধরা হইল না কেন ?

গুরু। ‘ক্ষর’ ‘কূটস্থাক্ষর’ ও ‘উত্তমাক্ষর’ এই কয়েকটি পদার্থকে মাত্র ‘পুরুষ’ পরিভাষা প্রদান করিয়া লক্ষণ করা হইয়াছে। তদতিরিক্ত পদার্থও আছে বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। কেন তাহা বুঝিব ?

গুরু। লক্ষণ কয়েকটির মধ্যে উত্তমাক্ষরের লক্ষণটি নিপুণতার সহিত দৃষ্টি কর। লক্ষণ করা হইয়াছে উত্তমঃ পুরুষত্বতঃ। ‘অন্তঃ’ এই পদের অর্থ করা হইয়াছে ‘ক্ষর ও কূটস্থাক্ষর ভিন্ন।’ অতএব সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ, একমাত্র ‘অন্ত’ শব্দের দ্বারাই উত্তমের অর্থাৎ উত্তমাক্ষরের লক্ষণ নির্বাহ পাইত। লক্ষণে ‘পুরুষ’ শব্দটি প্রবেশ করাইবার আবশ্যক হইত না। কূটস্থাক্ষর ভিন্ন ও ক্ষর ভিন্ন আরও পদার্থ থাকার, লক্ষণ পাছে সেই সকল পদার্থে যায় সেই বাস্তিচার বারণ করিবার আশায় লক্ষণে ‘পুরুষ’ শব্দটি প্রবেশ করান হইয়াছে। আরও যদি নিত্যবস্তু না থাকে তবে লক্ষণে ‘পুরুষ’ শব্দ প্রবেশ করায় ব্যর্থ বিশেষণ ঘটিত লক্ষণ দাঁড়াইয়া যায়। ইহাতেই বুঝিয়া লও, ‘পুরুষ’ সংজ্ঞা প্রদান করিয়া সকল পদার্থের লক্ষণ করেন নাই। আরও নিত্য পদার্থ আছে।





## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

স আত্মা তত্ত্বমসি ইত্যাদি প্রতিতির প্রদর্শিত ব্যাখ্যায় অধৈতপক্ষ হইতে  
 দোষাশঙ্কা। নবীন ভাবে বিবিধ ব্যাখ্যা প্রদর্শন। বিবিধ সামগ্রীর  
 সত্য সংস্থাপন। অব্যাখ্যাত প্রতিতির ব্যাখ্যায় জ্ঞান বিশেষ  
 উপদেশ। গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ ইত্যাদি  
 প্রতিতির ব্যাখ্যা ও বিরোধী প্রতিতি প্রদর্শন। জ্ঞান  
 বা তর্কশাস্ত্রের বিস্তৃত পরিচয়। কৃতর্কে দোষ-  
 প্রতিতি। জ্ঞানদর্শন-নির্গত মুক্তির  
 লোভনীয়তা। বিবিধ দর্শনোক্ত  
 মুক্তির স্বরূপ। উদয়নাচার্য্য  
 কর্তৃক বৌদ্ধনিরাস।

শিষ্য। আপনি অধৈতবোধক প্রতিগুলিকে জ্ঞানপর বলিয়া  
 ব্যাখ্যা করিতেছেন। সেরূপ জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে, ইহাও  
 প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স  
 আত্মা” ইত্যাদি প্রতিটিকে জ্ঞানপর বলিলে আপনার উদ্দেশ্য কই  
 সিদ্ধ হইতেছে? কারণ, ঐ প্রতিবলে পরমাণু-প্রযোজক বস্তুসমূহকে,  
 এবং “তত্ত্বমসি” এই অংশের দ্বারা জীবকেই যাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান  
 করা যাইতে পারে। তদতিরিক্ত পদার্থে কি ব্রহ্মজ্ঞান করিতে  
 হইবে না?

গুরু। সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় পরমাণু-প্রযোজকত্ব জন্তবস্তুমাত্রই বিদ্যমান। অতএব সকল জন্তু-পদার্থই ধরা পড়িতেছে। কেবল পরমাণুদি কতিপয় নিত্যবস্তু ধরা পড়িতেছে না। ত্রুটিভেদ চিন্তা করিবার যে আবশ্যকতা পূর্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, সমুদয় ব্যক্ত বস্তুতে এবং জীবাশ্মায় সে চিন্তা করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অব্যক্ত বস্তু সকল ধরা না পড়িলে কোনই হানি নাই। অদ্বৈতপক্ষীয় ব্যাখ্যায়ই বরং দোষ ঘটিয়াছে। কারণ, “ঐতদাত্মমিদং সৰ্বং” এইরূপ উল্লেখ থাকিলেও অবিদ্যাকে তো এই শ্রুতি হইতে বাহিরে রাখিতে হইবে। অতএব দ্বৈতপক্ষীয় ব্যাখ্যাই নির্দোষ। সাধনাস্থের সকল অবস্থা তোমাকে বিশদরূপে বুঝাইয়াছি। এই সকল শ্রুতি কোন্ অঙ্গে সাধক, কোন্ অঙ্গে বাধক, যথাশাস্ত্র তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তথাপি জ্ঞানপর বলিলে যদি তোমার তৃপ্তি না হয়, তবে অন্তরূপেও অর্থ করা যাইতে পারে। কিন্তু সিদ্ধ-পদার্থের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া, অথবা অস্বাভাবিকভাবে, কোনও রূপ ব্যাখ্যা করা চলিতে পারে না।

শিষ্য। জ্ঞানপর রূপে মীমাংসা না করিয়া অন্তরূপেও কি আপনি মীমাংসা করিতে পারেন?

গুরু। কেন পারিব না? তুমি পদার্থসাধক বলিতেছ, আমিও পদার্থসাধক বলিব। পরমাণু-সংস্থাপনের পরেই উক্ত হইয়াছে, ঐতদাত্মমিদং সৰ্বং অর্থাৎ এই সমুদয় বস্তু পরমাণু-জন্তু এবং আত্ম-জন্তু। তাৎপর্য্য এই, এই সকল সৃষ্টবস্তুর কর্তা আত্মা, এবং উপাদান অথবা পরম্পরা-প্রযোজক পরমাণু। “ঐতদমিদং সৰ্বং” অথবা “আত্মমিদং সৰ্বং” একরূপ উল্লেখ করিলেন না কেন, ইহা অদ্বৈতবাদ-গণের উপর জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের উপর এক্ষণে আর

জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে না। ঐতদং = এতদজ্ঞতং। এই 'এতৎ' শব্দের দ্বারা অব্যবহিত পূর্বে সংস্থাপিত পরমাণু বাত্ন করা বাইতেছে।  
আত্মাং = আত্মজ্ঞতং। "এষ ইদং সর্বং" "আত্মা ইদং সর্বং" এ সকল উল্লেখ করার পরিবর্তে, যে ভাবে শ্রুতিটী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রদর্শিত ব্যাখ্যাই সঙ্গত।

শিষ্য। উপক্রম উপসংহারে ঐক্য হইল কই ?

গুরু। এক জ্ঞানের দ্বারা অবিদিত সকল বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্ত উপক্রম করিলেন। উপসংহারে বুঝাইয়া দিলেন "পরমাণু-প্রযোজক যাবতীর সৃষ্টবস্তুর জনক ব্রহ্ম।" অতএব, ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে বৈশিষ্ট্য-মূদ্রায় যাবতীর সৃষ্টবস্তুর তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্ভব পাইবে। এক জ্ঞানের (অর্থাৎ এক ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের) অবলম্বনে সর্ববস্তুর জ্ঞান (অর্থাৎ সর্ববস্তুর তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার) হইতে পারে, ইহা উপক্রমে লিখিত হইয়াছিল, উপসংহারে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। বৈশিষ্ট্যমূদ্রা কিরূপ? রূপবৎ ঘটের প্রত্যক্ষ কালে যেমন রূপের প্রত্যক্ষ অবশ্যসম্ভাবী, সেইরূপ সর্ববস্তুর কর্তৃরূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কালে সর্ববস্তুর সাক্ষাৎকার অবশ্যসম্ভাবী। যোগজ-সন্নিবর্ত-বলে এইরূপ সাক্ষাৎকার যে হইতে পারে, "যাবান্ যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" "সর্বজ্ঞাণ্যপি মাং বিদ্ধি" "সর্বলোক মহেশ্বরং" প্রভৃতি বাক্যের ব্যাখ্যা কালেও তাহা বিবৃত করা হইয়াছে।

শিষ্য। আহার্যাজ্ঞানপর বলিয়া ব্যাখ্যা না করিলে তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো এ অংশের সহিত 'ঐতদাত্মামিদং সর্বং' এই বাক্যের সর্বত্র যোগাযোগ থাকে কই ?

গুরু। যোগাযোগ আছে। 'ঐতদাত্মামিদং সর্বং' এই বাক্যের দ্বারা উপাদানরূপে যে পরমাণু সিদ্ধ হইতেছে, তাহার পরিচয় অব্যবহিত

পূর্বেই আছে। ঐ বাক্যে জগৎকর্তারূপে যে আত্মার উল্লেখ করা হইল, সে আত্মা কে? এই প্রশ্নের নিরাকরণার্থ বলা হইয়াছে তৎ সত্যং স আত্মা। অর্থাৎ “সদেব সোম্যোদমগ্রা আসীৎ” ইত্যাদি প্রতিবাক্যে পূর্বে যে সত্য-পদার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনিই সেই (জগৎকর্তা) আত্মা। ‘তৎ সত্যং স আত্মা’ ইহা বিভিন্ন বাক্য নহে, একই বাক্য। তৎ সত্যং স আত্মা এই ভাবের প্রয়োগের দ্বারা ছলতঃ ইহাও বুঝা যাইতেছে, সত্যও বিবিধ, আত্মাও বিবিধ। “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং সত্যং আত্মা” অথবা “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং আত্মা” এ ভাবের প্রয়োগ করা না হইল কেন, অদ্বৈতবাদীর নিকট এ জিজ্ঞাস্ত সঙ্গত হইলেও, বর্তমান দ্বৈতব্যাখ্যার বিরুদ্ধে জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে না। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো এই অংশের সার্থক্য এক্ষণে বিচার করা যাউক। একবস্ত্র অবলম্বনে সকল বস্তুর জ্ঞান কিরূপে নির্বাহ পায়, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উপক্রম উপসংহারে অনৈক্য নাই। উপক্রম দৃষ্টে আরও জানা যায়, আকৃণির কুলে বৃথা চিন্তায় কেহ কালক্ষেপ করেন নাই। পুত্র শ্বেতকেতুও বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ করেন, ইহা পিতার অভিপ্রেত নহে। অতএব যাহার জ্ঞান, প্রকৃত “জ্ঞান” পদবাচ্য, তাহাও উপসংহারে প্রসঙ্গাধীন পুত্রকে উপদেশ করা পিতার উচিত। “ইদং শরীরং কোন্তেয়—” ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যা কালে, পূর্বে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও জীবজ্ঞানই শ্রেষ্ঠজ্ঞান। আকৃণিও সেইজন্তই ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করিয়া সর্বশেষে তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো এই বাক্যের দ্বারা জীবজ্ঞানের (অর্থাৎ “জীব শরীর ভিন্ন” এই জ্ঞানেরও) আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেন। কিরূপে বুঝা গেল, জীব শরীর ভিন্ন? উত্তর এই, যেহেতু তাহাকে সত্য (অর্থাৎ নিত্য) বলিয়া নির্দেশ করা হইল। কোন্

বাক্যের দ্বারা সত্য বলিয়া নির্দেশ করা হইল ? উত্তর এই, “তব্বমসি  
 খেতকেতো” এই বাক্যের “তৎ” শব্দটী পূর্বোপক্রান্ত “সত্যোঃ”  
 পরিবর্তে ব্যবহৃত। “তৎ” শব্দটী অব্যয় হওয়ার পূর্বোপক্রান্ত ‘সত্য’  
 ও ‘আত্মা’ এই উভয়ের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব। “তৎ”  
 শব্দের একদেশ-গ্রাহিতার প্রমাণ যথা, “পটোলপত্রং পিতৃনং নাড়ী  
 তন্ত কফাপহা।” বিশেষ বিচার মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। কলিতার্থ এই,  
 খেতকেতুকে পিতা বলিতেছেন “অহং স্থলঃ” “অহং সূক্ষ্মঃ” ইত্যাদি  
 জ্ঞান যতদিন জন্মিবে ততদিন তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই বুদ্ধিতে হইবে।  
 যেহেতু, আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন। কেননা শরীর জন্ত। কিন্তু হে  
 খেতকেতো! তুমি সত্য (অর্থাৎ নিত্য)। এই উদ্দেশ্যেই তব্বমসি  
খেতকেতো এই বাক্য উক্ত হইয়াছে। “স আত্মা ব্রহ্মসি” “স আত্মা  
 স ব্রহ্মসি” এরূপ ভাবে প্রতিটি উল্লিখিত ব্রহ্ম নাই কেন, এ জিজ্ঞাসা  
 অদ্বৈতবাদিগণের নিকট করা যাইতে পারে, আমাদের নিকট করা  
 যায় না।

শিষ্য। “ঐতদাত্মামিদং সর্বং” এই বাক্যের বৈকল্প তাৎপর্য  
 আপনি বাহির করিতেছেন, তাহাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে সৃষ্টবস্তুর  
 মধ্যে পরমাণুর জ্ঞানই সম্ভব পাইবে। দিক্, গগন, কাল প্রভৃতি আর  
 বাহ্য যাহা অবশিষ্ট রহিল, সর্বজ্ঞাবস্থায় তাহাদের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার কি  
 ঘটিবে না ?

গুরু। জনকতা-জ্ঞান কালে “অন্তথা সিক্তিমুদ্রায়” আর আর  
 সকল বস্তুর সাক্ষাৎকারও সম্ভব পাইবে। এ বিষয়ের পরিপাটী মূল-  
 গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এখানে এইটী মাত্র বলা যাইতে পারে, গগন, দিক্,  
 কাল, ব্রহ্ম এ সকল পৃথক্ নহে, নৈরায়িক-আচার্য্যেরা কেহ কেহ এরূপও  
 সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ফলকথা, আমাদের ব্যাখ্যায় কোনই

অনিষ্ট-সম্ভাবনা নাই। অদ্বৈতপন্থীর ব্যাখ্যাই বরং অনেক জটিল। কারণ, সে ব্যাখ্যায় উপক্রম উপসংহারে সুস্পষ্ট ঐক্য নাই। উপসংহারে পিতা আরুণি পুত্র ষ্ঠেতকেতুকে একাকার-বুদ্ধি করাইতে চাহিতেছেন ইহা যদি তাঁহাদের ব্যাখ্যা হয়, তবে তো তাঁহাদের মতে বলিতে হইবে যে, ষ্ঠেতকেতুর অবিজ্ঞা দূরীভূত করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু পুত্রের অবিদ্যা দূরীভূত করিবেন বলিয়া উপক্রম করেন নাই। অবিজ্ঞাত বস্তু কিরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই পুত্রকে বুঝাইবেন বলিয়া উপক্রম করিয়াছিলেন। যথা, “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যামতং মতম-বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি।” অতএব বুঝাইতেছে, অশ্রুত, অসম্মত, অবিজ্ঞাত সকল বস্তু কিরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যাইবে তাহাই পুত্রকে ব্যক্ত করা তাৎপর্য। অশ্রুত, অসম্মত, অবিজ্ঞাত সকল বস্তু কিরূপে এক হইয়া যাইবে, তাহা আদেশ করা পিতার তাৎপর্য নহে। উপক্রমোক্ত দৃষ্টান্তগুলিও অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, বিজ্ঞাতত্ব সিদ্ধি করাই তাৎপর্য। দৃষ্টান্তগুলি এই “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃগ্ময়ং বিজ্ঞাতং জ্ঞাৎ” “যথা সৌম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং জ্ঞাৎ” “যথা সৌম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং কাষ্ঠায়সং বিজ্ঞাতং জ্ঞাৎ” ইত্যাদি। যেরূপ অবিদ্যা-সাহায্যে তোমরা “সর্বজ্ঞ” “প্রাজ্ঞ” প্রভৃতির উপপত্তি কর, পুত্রের সেইরূপ অবিদ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন বলিয়াই উপক্রম করা হইল। তবে উপসংহারের সহিত উপক্রমের ঐক্য হইল কৈ? উপসংহারকে যদি ভাবনাপূর্ণ বল, তবে আমরা প্রথমে যে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহারই সহিত প্রকারান্তরে একমত হওয়া হইল। উপক্রম উপসংহারে অদ্বৈতব্যাখ্যায় ঐক্য নাই বলিতেছি, তাহার আরো হেতু আছে। “তদৈক্যত” “তদনুজ্ঞাত” ইত্যাদি বাক্য দৃষ্টে জানা যায় যে, উপক্রমে নিগূর্ণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত

হয় নাই। সংগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ জৈবের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। “তদ্ব্যসি” বাক্যাদির দ্বারা পুত্রকে তবে কি ব্রহ্মের সহিত অভেদ না বুঝাইয়া জৈবের সহিত জীবের অভেদ বুঝান তাৎপর্য্য? অতএব অদ্বৈত-পক্ষীয় ব্যাখ্যায় উপক্রম উপসংহারে সুস্পষ্ট ঐক্য নাই। এতদ্ব্যতীত অদ্বৈতবাদিগণ ভূরি-লক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। সেক্ষেপে ব্যাখ্যা করা কি স্বাভাবিক? অদ্বৈতবাদিগণের মতে নারদ শুকদেবাদি পর্য্যন্ত জ্ঞানী নহেন। অধিকন্তু তাঁহারা সমষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন। যেহেতু তাঁহারা সর্বজ্ঞ। অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তমত জ্ঞান যে কাহারও কল্পিনকালে হইয়াছিল, পুরাণেতিহাসে তাহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তাতাব। অতএব, জ্ঞানপর বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হউক, অথবা অন্ত্যস্ত উপায়েরই ব্যাখ্যা করা হোক, শ্রুতি-ব্যাখ্যা এক্ষেপে করিতে হইবে, বাহাতে পদার্থ-তত্ত্বের অপলাপ না হয়।

শিষ্য। সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এই সকল শ্রুতিকেও জ্ঞানপর না বলিয়া অন্তরূপে ব্যাখ্যা করা যায় কি?

গুরু। আমি সাধনাদির সকল অবস্থা বিশদ ভাবে বর্ণন করিয়া সকল প্রকার শ্রুতিরই যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছি। তথাপি যদি এই ভাবে পুনঃ পুনঃ আপত্তি কর, সরল পথে তোমাকে রাখা যাইবে না। ভাল ভূমিও বেক্রপ নীমাংসা করিতেছে, আমিও সেইরূপই করিলাম। সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ইত্যাকার শ্রুতিসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হউক ‘জগৎ ব্রহ্মময়’। জগৎ যে ক্রিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, বোম, এই পঞ্চভূতময়, এ বিষয়েও আমার বিশেষ প্রমাণ আছে। তত্পরি তোমার প্রদর্শিত শ্রুতিসমূহকে বল করিয়া সিদ্ধ করা গেল, জগৎ ব্রহ্মময়ও বটে।

শিষ্য। ইহা আবার কি নীমাংসা হইল? পারমাণ্বিক হিসাবে



ধরিলে সকল পদার্থ ব্রহ্মময়ই মাত্র। পঞ্চভূতময়ই লৌকিক ব্যবহার মাত্র।

শ্রুত। ইহা আবার কি মীমাংসা হইল? পারমার্থিক হিসাবে ধরিলে সকল পদার্থ ব্রহ্মময়ও বটে, অর্থাৎ ষট্‌পদার্থময়। পঞ্চভূতময়ই লৌকিক ব্যবহার মাত্র। উপহাসের কপায় বাদি-নিরাস হয় না। তোমার দীর্ঘকালের সংস্কার নিবন্ধন ব্যাখ্যা-বিশেষের উপর মনের অহুরাগ আছে, এবং সেইহেতু চোখ-মুখ-মাক মাত্র বাঁকাও তাহাতে বাদি-নিরাস হইবে না।

শিষ্য। সকল পদার্থ পঞ্চভূতময় ইহার প্রমাণ কি?

শ্রুত। পঞ্চভূতের সর্কোশ সংস্থাপন করা এ স্থানে অনাবশ্যক। প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুতে রূপবৎ তিনটি ভূত বিদ্যমান; তাহা ত্রিবল্লিবিদে-কৈকাং করবাণি ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ছান্দোগ্যেই সিদ্ধ। ত্রীনি-রূপাণীতোব সত্যং ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা সেই সকল ভূতের সত্য সংস্থাপনও করা হইয়াছে। এই সকল শ্রুতিতে যত 'সত্য' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সকলগুলি কাঁচা ঘুঁটী; কেবল মাত্র ঐতদাত্ম্যমিদং\*সত্যং এই শ্রুতির 'সত্য' শব্দটি পাকা ঘুঁটী, এরূপ নিয়ম অভিধানে লেখে না। পারমার্থিক হিসাবে লক্ষণা করিয়া কতকগুলি 'সত্যকে' 'মিথ্যার' দাঁড় করাইতে হইবে, মনের মত কয়েকটি 'সত্যের' অর্থ 'সত্যই' থাকিবে, এ আদেশ শ্রুতির মধ্যেও নাই। অতএব সৃষ্টবস্তু যেমন পঞ্চভূতাত্মক অথবা পূরোক্ত রূপবৎ-ভূতত্রিতাত্মক, সেইরূপ ব্রহ্মাত্মকও বটে। পারমার্থিক হিসাবে ধরিলে ব্রহ্ম বলিঙ্গ ব্যবহার করা যাইবে, লৌকিক হিসাবে ব্যবহার করিলে যে ভূতের আধিক্য থাকিবে, সেই ভূতান্তর্গত করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। শ্রুতি প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহারই তাহার সাধক। এ ভাবে শ্রুতি ব্যাখ্যা

করিতে হইলে আরও একটা তাৎপর্য্য বাহির করা যায়। ছান্দোগ্যে আকাশকেই ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, দেখা যায়। যথা, 'ইমানি ক্ষুত্ৰাস্থাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যন্তং যন্তি।' ব্রহ্ম-সূত্রে ব্যাসদেবও মহাকাশকে স্বতন্ত্র সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যথা, 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ'। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িক আচার্য্যগণের মতেও দিক্ কাল গগনে ব্রহ্মের অতিব্রতা সিদ্ধ। অতএব 'সৰ্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই শ্রুতির দ্বারা সৃষ্টবস্তুর গগনময়ত্বই সিদ্ধ হইতেছে। 'ত্রিবৃজিবৃদেকৈকাং করবাণি' 'ত্রীণিরূপাণীতোষ সন্তাৎ' এই সকল শ্রুতির দ্বারা রূপবৎ-ভূতত্রিতরময়ত্ব সিদ্ধ। কেবল বায়ুময়ত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য প্রমাণান্তর বা যুক্ত্যন্তরের অপেক্ষা রহিল। স য এষোহশিমা এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মসিদ্ধি করা যদি তোমার অভিলাষ হয়, তাহাতেও আর আমার আপত্তি নাই। দিক্, কাল, গগন ও ব্রহ্ম একই হওয়ায়, সকল পদার্থের নাশ কালিকসম্বন্ধে ব্রহ্মেই থাকে, ইহা পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িকগণের মত। পঞ্চধর মিশ্রাদির মতে স্বরূপ লব্ধক্বে যেমন পরমাখাদিতে নাশ থাকে, সেইরূপ মহাকাশেও স্বরূপ সম্বন্ধেই নাশ থাকে। ব্রহ্মে ও কালে ঐক্যবোধক প্রমাণ যথা, 'কাল-স্বরূপং রূপং তদ্ বিষ্ণো মৈত্রৈয় বর্ন্ততে' ইত্যাদি।

শিষ্য। পরমাণুর নিত্যত্ব স্বীকার যদি আপনার থাকে, তবে তাহাকে ভো ব্রহ্মমূলক বলা যাইবে না। অতএব 'সৰ্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' লাগে কই ?

গুরু। 'ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং' এই বাক্যস্থ 'সৰ্ব' শব্দের সহিত 'সৰ্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই সকল বাক্যের 'সৰ্ব' শব্দের একার্থ করিতে হইবে। সকল বস্তুই যদি ব্রহ্মাত্ম্য হইত, তবে 'ঐতদাত্ম্যামিদং সৰ্বং' দিতে হইত না, 'ঐতদাত্ম্যং সৰ্বং' বলিলেই চলিত। সৰ্ব শব্দের অর্থ-

সঙ্ঘোচ উভয়বাদিসম্মত। কারণ অদ্বৈতবাদিগণের 'অবিদ্যা' ভো ব্রহ্ম নহে।

শিষ্য। আপনি যে সকল বাক্যের অর্থ করিলেন, উদ্ভতিরিক্ত বাক্য পাওয়া গেলে তাহার উপপত্তি কিরূপে করিব ?

গুরু। যে জাতীয় প্রতিবাক্যাদির উপপত্তি এই গ্রন্থে করা হইল, সে জাতীয় প্রতি-বাক্য বড় অধিক আর মিলিবে না। ত্রিশ বত্রিশটি বাক্যের অধিক সম্বল, অদ্বৈতবাদিগণের নাই। প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং অনন্তশাস্ত্রের যাবৎ বাক্য দ্বারা উপপন্ন পদার্থসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য অদ্বৈতবাদীরা এই ত্রিশ বত্রিশটি মাত্র প্রতিবাক্যকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সাধক দিয়া থাকেন এবং গালগল্প ও কল্পিত দৃষ্টান্ত দ্বারা নবীন ভাবে পদার্থের উপপত্তি করিয়া থাকেন। এই জন্যই মূল অপেক্ষা তাঁহাদের টীকা ভয়ঙ্কর, গীতা অপেক্ষা ভাষ্য ভয়ঙ্কর। মুক্তির পূর্বসঙ্গীভূত সকল অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। কোন্ উপনিষদের কোন্ অতি কোন্ অবস্থাপর তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই এক্ষণে বিচার করিয়া আবশ্যকীয় শক্তি ও লক্ষণাদির দ্বারা তাহার সমন্বয় করিতে পারিবেন। ব্রহ্মত্বপ্রকারে নিখিল বস্তুর আহার্য্য জ্ঞান হইলে জীবের যে অবস্থা হয়, তাহাকে অনেক সময় 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্মনির্বাণ' 'ব্রহ্মধামপ্রাপ্তি' 'ব্রহ্মভূত' ইত্যাদি ব্রহ্মত্বটিত সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করা হয়। ভগবদ্গীতায় সেই অবস্থা-ব্যাঞ্জক বাক্য যথা,

ব্রহ্মভূতঃ প্রসমাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

ঈশোপনিষদে সেই অবস্থা-ব্যাঞ্জক বাক্য যথা,

যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতান্যাতৈত্বাভূদ্ বিজানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

মুণ্ডকোপনিষদে ঐ অবহা-বাক্যক বাক্য যথা,

এতৈরুপায়ৈর্যততে যন্ত বিদ্বাং  
স্তুস্তৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

ঐ অবহা প্রকৃত জ্ঞানপর অবস্থা নহে । উহার পর পরাভক্তি বলে  
সর্বজ্ঞ ও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায় । ভগবদ্ গীতার এই অবহা-বাক্যক  
বাক্য যথা,

ভক্ত্যা সামভিজানন্তি যাবান্ যশ্চাস্মি তদ্বতঃ ।

মুণ্ডকোপনিষদে এই অবহা-বাক্যক বাক্য যথা,

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ  
কৃতাজ্ঞানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ ।  
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা  
যুক্তাজ্ঞানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥

ঈশোপনিষদে এই অবহা-বাক্যক বাক্য যথা,

স পর্য্যগাচ্ছুক্রেমকায়মব্রণ-  
মস্রাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং  
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ন্তু  
যাধাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাস্তীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

সর্বশেষাবস্থার অর্থাৎ মুক্তির পরিচয়,

মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ॥

( ভগবদ্গীতা । )

ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সৰ্বৈ ।

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ।)

‘পরমং ব্রহ্মবেদব্রহ্মৈব ভবতি ॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ।)

পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ।)

সিদ্ধ পদার্থের বিরোধী হয়, এমন কোনও বাক্য যদি পাওয়া যায়, তাহা লক্ষণাপন্ন । ‘পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’ এই বাক্যের দ্বারা ( এবং পূর্বপ্রদর্শিত “দে ব্রহ্মণী বেদিতব্যো” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ) জানিতে পারি পরম ব্রহ্ম ও জীব ব্রহ্ম পৃথক্ সামগ্রী । নচেৎ ‘ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’ এইরূপ বাক্য উক্ত হইত, অথবা ‘পরমং ব্রহ্মবেদ পরমং ব্রহ্মৈব ভবতি’ এইরূপ বাক্য থাকিত । ‘পরমং সাম্যমুপৈতি’ এই বাক্যস্থ ‘সাম্য’ পদও ভেদ-সাধক । ইহাদের সহিত নিম্নলিখিত মুক্তি-বোধক শ্রুতির একবাক্যতা করিতে হইবে । যথা,

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা

দেবাশ্চ সৰ্বৈ প্রতিদেবতাসু ।

কস্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা

পরেহব্যয়ে সৰ্ব্ব একীভবন্তি ॥

শিষ্ট । ইহার অর্থ কিরূপ হইবে ?

গুরু । কলা, প্রতিষ্ঠা সকলই নষ্ট হইয়া যায় । শরীরারম্ভক ক্রিয়াপূর্তজ্যোতি-দেবতাগণ তত্তৎপরমাণুতে লীন হন । বিজ্ঞান এবং আত্মগত অপরাপর বস্তু আত্মায় লীন হয় ।

শিষ্য। ‘একীভবন্তি’ ইহার অর্থ ‘বিনষ্টা ভবন্তি’ ইহা কিরূপে সিদ্ধ করিলেন?

গুরু। ‘এক’ এই শব্দের অর্থ সময়ে সময়ে ‘একজাতীয়’ এইরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা, ‘ঐ পাঁচটা কটের একই রূপ’, ‘তোমাদের সকলের একই অবস্থা ঘটিবে’ ইত্যাদি। অতএব ‘একীভবন্তি’ ইহার অর্থ ‘একজাতীয়া ভবন্তি’ করা অসঙ্গত নহে। এই সাজাত্য লয়-ঘটিত হওয়ায় ‘একীভবন্তি’ ইহার অর্থ ‘বিনষ্টা ভবন্তি’ এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে। সিদ্ধপদার্থসমূহের সহিত একবাক্যতা করিবর জন্ত এই লক্ষণা দোষাবহ নহে।

শিষ্য। ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের অর্থ ‘বিজ্ঞান’ করিলেন কিরূপে?

গুরু। ঘটাত্মক, পটাত্মক, মঠাত্মক ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্টে জানা যায়, ‘আত্মা’ সংজ্ঞা সকল সামগ্রীকেই প্রদান করা বাইতে পারে। অতএব বিজ্ঞানময় আত্মা শব্দে বিজ্ঞানাত্মক সামগ্রী। জলময় পদার্থ শব্দে জলাত্মক পদার্থই বোধ হইয়া থাকে। ক্ষতিগ্র ‘পরে’ এই শব্দের দ্বারা জীবাণুগত অপরাপর ধর্ম পাওয়া যাইতেছে। অথবা, ‘বিজ্ঞানময়’ এই শব্দের দ্বারা বিজ্ঞানাত্মক সামগ্রী গ্রহণ করিয়া, ‘আত্মা-হপরে’ এই শব্দের দ্বারা আত্মানিষ্ঠ অপরাপর ধর্ম গ্রহণ করিলাম। পূর্ব-লিখিত ‘কর্ম’ শব্দের দ্বারা ‘পাপপুণ্য’ বা ‘অদৃষ্ট’ অর্থ আসিতেছে। মুক্তি হইলে এ সকলই ‘অব্যয়ে’ অর্থাৎ জীবাণুয় লীন হয়। কর্মাদি পরম ব্রহ্ম হয় না, লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্তবাক্যে স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা,

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাৎপরো ॥

পরমাচার সাক্ষাৎকার হইলে অর্থাৎ জীবাশ্মা মুক্ত হইলে হৃদয়গ্রাহি, সংশয়, কৰ্ম সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই বচনের সহিত একবাক্যতা করিবার জন্য পূর্বে ‘একীভবন্তি’ ইহার অর্থ ‘বিনষ্টা ভবন্তি’ করা হইয়াছে। কৰ্মাদি সমুদয় সামগ্রী যদি পরমাশ্মা হইয়া যাওয়া শাস্ত্রের আদেশ হইত, তবে ‘সর্বো পরাবায়ো ভবন্তি’ এইরূপ প্রয়োগই থাকিত। ‘পরেহ্বায়ে একীভবন্তি’ এরূপ ঘুরাইয়া প্রয়োগ করিতে হইত না। ‘পঞ্চবৃক্ষা নোকা ভবন্তি’ ‘কাষ্ঠং ভস্ম ভবতি’ এইরূপ প্রয়োগই স্বাভাবিক। ‘পঞ্চবৃক্ষা নোকায়ঃ একীভবন্তি’ ‘কাষ্ঠং ভস্মনি একীভবন্তি’ এরূপ প্রয়োগ অপ্রচলিত। ‘ষটপটমঠা মৃত্তিকায়ঃ একীভবন্তি’ এরূপ প্রয়োগ যদি সিদ্ধ হয়, তাহা লাক্ষণিক। অতএব যথোচিত লক্ষণা এইরূপ প্রত্যেক স্থলেই করিতে হইবে।

শিষ্য। আপনি পারমার্থিক পদার্থের বিরুদ্ধে তর্ক করিতেছেন। অতএব ইহা কুতর্ক। তর্কের দ্বারা পদার্থ নির্ণয় হয় না। বাসদেব সূত্র করিয়াছেন ‘তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ’।

গুরু। এবার রাগিয়াছ। রাগের কথার উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নহি। তবে এইটুকু বলিতে পারি ‘বস্তুর্কোণাভিসন্ধতে স ধর্মঃ বেদ নেতরঃ’ এই আদেশ যে বাসদেব করিয়াছেন, সে বাসদেব ‘তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ’ এমন কথা লিখিতে পারেন না। যদি তিনিই সত্য সত্য লিখিয়া থাকেন, তবে ‘তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ’ এই সূত্রের মীমাংসা করিয়া দেই শিষ্যিা রাখ। ‘বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নানৌ মুনির্যত্র মতং ন ভিন্নং। ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহ্যায়ঃ মহাজনো যেন গতঃ স পদ্মঃ’ ॥ এইরূপ বচন থাকিলেও বেদ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অপ্রামাণিক, স্মৃতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অপ্রামাণিক, ঋষির ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া অপ্রামাণিক এরূপ অর্থ বুঝিলে চলিবে না। বেদ ভিন্ন ভিন্ন,

স্মৃতি ভিন্ন ভিন্ন, ঋষিমত ভিন্ন ভিন্ন, অতএব যাঁহারা শাস্ত্রার্থ মীমাংসা করিতে অক্ষম, অথচ সাধিক তাঁহারা মহাজনের আচরিত নিয়মালুসারেই চলিবেন, পূর্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যের ইহাই অর্থ করিতে হইবে । ‘তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ’ এই বাক্য সেইরূপ । তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে তর্কের বিবিধ পথ জানা যায় । কুতর্কিকগণ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে সহজেই কুপথে আনিতে পারেন । যেহেতু ঐ সকল অনভিজ্ঞব্যক্তি তর্কের দোষগুণ বিচারে সমর্থ হন না । সেই সকল অনভিজ্ঞব্যক্তি যাহাতে তর্কের মোহে পড়িয়া পথচ্যুত না হন, এই উদ্দেশ্যে কেবল তাঁহাদেরই জন্ত বলা হইয়াছে, ‘তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ’ । তর্কশাস্ত্রের বিরুদ্ধে যে কোনও উক্তি থাকিবে শাস্ত্রের প্রতিকূল তর্ক পরিহার করানই তৎসমুদয়ের উদ্দেশ্য । যেহেতু মুণ্ডকোপনিষদে জানিতে পাই ‘নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়ান বহনা শ্রুতেন’ ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাণাৎ তপসো বাপালিঙ্গাৎ ।’ অর্থাৎ কেবলমাত্র বচনের দ্বারা আত্ম-জ্ঞান হয় না । শ্রুতি দেখাইয়া বুঝা কচাল পাড়িলে আত্ম-জ্ঞান হয় না । কঠোর ব্রত সকল অবলম্বন করিয়া বলহীন হইলেই আত্ম-জ্ঞান হয় না । এমন কি অলিঙ্গ-তপস্তা অর্থাৎ সদহুমান-বিরহিত সন্ন্যাসাদির দ্বারা পর্য্যাপ্ত আত্ম-জ্ঞান হয় না । শ্রুতির প্রামাণ্য অপেক্ষা সদহুমানের প্রামাণ্য এই স্থানে অধিক পরিমাণে পরিষ্কৃত । ‘শ্রোতব্যাঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ’ এই ঋষিবাক্যের দ্বারা, ‘শ্রোতবো মন্তব্যঃ’ ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা, ‘বস্তুর্কোণাতিসঙ্কতে’ ইত্যাদি ব্যাসবাক্যের দ্বারা তর্কেরই অধিক প্রামাণ্য প্রকটিত হইতেছে । তর্কশাস্ত্রের মীমাংসার সহিত ঐক্য করিয়া উপনিষদ্ অধ্যয়ন না করিলে তাহা অধ্যয়নের মধ্যেই গ্রাহ্য নহে । কারণ ঋষিরা সেইরূপই করিতেন ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । মহাত্ম্যতে



প্রমাণ যথা, “তত্রোপনিষদং তাত পরিশেষন্ত পার্থিব। মথামি মনসা  
তাত দৃষ্ট্বা চাত্মীক্ষিকীং পরাং।” পূর্ণব্রহ্মও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া  
গুরুর নিকটে আত্মীক্ষিকী বিজ্ঞা শিক্ষা করেন। ভাগবতে ১০ স্কন্ধে  
৪৫ অধ্যায়ে প্রমাণ যথা,

সরহস্ত্রং ধনুর্বেদং ধর্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।

তথাচাত্মীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ যজ্ঞবিধাং ॥

ইত্যাদি।

আত্মীক্ষিকী বিদ্যা বেদের ত্রায় অনাদি। জগৎকর্তা ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টি  
করিয়া লোকের উপকারার্থ চারিটি অনাদি শাস্ত্র ব্যক্ত করিলেন।  
ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ১২শ অধ্যায়ে প্রমাণ যথা,

আত্মীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।

এবং ব্যাছতয়শ্চাসন্ প্রণবোহস্ত দহৃতঃ ॥

আত্মীক্ষিকী শাস্ত্র তর্কশাস্ত্র কি না, এ বিষয়ে প্রমাণ যথা “আত্মীক্ষিকী  
দণ্ডনীতৌ তর্কবিদ্যার্থশাস্ত্রয়োঃ।” ইত্যমরঃ। যে চারিটি বিদ্যা  
ব্রহ্মা ব্যক্ত করিলেন, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তর্ক অর্থাৎ ত্রায়শাস্ত্র মুক্তি  
প্রবোজক। ত্রয়ী অর্থাৎ ঋগ্, যজুঃ, সামবেদ ধর্ম প্রযোজক। বার্তা  
অর্থাৎ উপাখ্যান (উপনিষদাদি) বৈধকার্য্যে ইচ্ছার দার্টোর প্রযোজক।  
দণ্ডনীতি = অর্থবিদ্যা। টীকাকার শ্রীধরস্বামী উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা  
লিখিতেছেন,

ন্যায়াদীনাং পূর্বাদিক্রমেণোৎপত্তির্মাহ আত্মীক্ষিকীতি।

আত্মীক্ষিক্যাদ্যা মোক্ষধর্মকামার্থবিদ্যাঃ।

দহৃতঃ হৃদয়াকাশাৎ।

টীকাকার বিশ্বনাথ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন,

ন্যায়াদীনাং পূর্বাদিবক্তৃক্রমেণোৎপত্তিমাহ । আত্মী-  
ক্ষিক্যাদ্যা মোক্ষধর্ম্যকামার্থবিন্যাঃ ।

অনাদি সকল বিদ্যার মধ্যে আত্মীক্ষিকী বিদ্যাই মোক্ষপ্রযোজক ।  
সুতরাং ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা । একারণ অদ্যাপি বিদ্যৎ-পরম্পরায়  
বিদ্যৎসমাজে এই শাস্ত্রের প্রাধান্যই চলিয়া আসিতেছে । আত্মীক্ষিকী  
ভিন্ন কোনও বিদ্যাই যে মোক্ষপ্রযোজক নহে, তাহাষ্যে আরও  
প্রমাণ যথা, “বিদ্যামাত্মীক্ষিকীং হিহ্মা তিত্তীর্ষন্তি ভবাব্ধবঃ ।”  
ইত্যাদি । ন্যায়শাস্ত্রই যে মুক্তিপ্রযোজক, পূর্বকালে আস্তিক আচার্য্য  
মাত্রেরই ইহা দৃঢ় ধারণা ছিল । এই কারণেই বোধ হয় এই শাস্ত্রের  
বিবিধ অংশ গ্রহণ করিয়া গৌতম কণাদাদি মহর্ষিগণ এবং মিথিলা  
বঙ্গদেশ প্রভৃতি প্রাচীন সমাজের সুধী আচার্য্যেরা আমাদের উপকারার্থ  
উৎকট শ্রম করিয়া গিয়াছেন । সর্বজনপ্রসিদ্ধ শ্রীহর্ষ আপন বুদ্ধিমত্তার  
পরিচয় দিবার জন্ত সকল দর্শনের খণ্ডন-কোশল প্রদর্শন করাইয়াছেন ।  
কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র যে মুক্তিপ্রযোজক একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার  
করিয়া গিয়াছেন । নৈষধের একাদশ সর্গে প্রমাণ যথা,

উদ্দেশ-পর্বণ্যথ লক্ষণেহপি  
দ্বিধোদিতৈঃ ষোড়শাভিঃ পদার্থৈঃ ।  
আত্মীক্ষিকীং যদ্ দর্শনদ্বিমালীং  
তাং মুক্তিকামাকলিতাং প্রতীমঃ ॥  
তর্কী রদা যদ্ বদনশ্চ তর্ক্যা  
বাদেষু শক্তিঃ ক তথানুথাভূৎ ।

পত্রং ক দাতুং গুণশালিপূগং

কবাদতঃ খণ্ডয়িতুং প্রভুত্বং ॥

শিষ্য । তর্কশাস্ত্র যদি প্রকৃতই এরূপ গৌরবের শাস্ত্র হয়, তবে গৌতমসূত্রাদিই মাত্র সেই গৌরব পাইবার অধিকারী । গৌতমসূত্রাদির আলোচনা ব্যাঘ্র পদার্থ-তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া উপনিষদাদি বাখ্যা ও ধর্মমীমাংসা অনায়াসেই তো চলিতে পারে । গদ্যেশোপাধ্যায়, পক্ষ-ধর্মমিশ্র, রঘুনাথশিরোমণি, মথুরানাথ, গদাধর প্রভৃতি কোন্ কার্যে আসিলেন ? ইহাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া কালক্ষেপ করা কেন ?

গুরু । সমাজে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে যে সব ঘোর মূর্খ আবির্ভূত হইতেছেন, তাহাদের আপত্তির স্মার এবার তুমি আপত্তি করিয়াছ । গৌতমসূত্রাদিই প্রকৃত শাস্ত্র বটে, কিন্তু অগ্রেই তাহার আলোচনা করিলে তুমি কি কিছু বৃদ্ধিতে সক্ষম হইবে ? মনে কর সূত্র রহিয়াছে, “প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।” ঐ অনুমান প্রভৃতির যে কি তাৎপর্য এবং কত চেষ্টায় তাহা সাধন করিতে হয়, তাহা উক্ত আচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থ না অমূল্য লবণ করিয়া কিকিঙ্করাত্মক বুঝা যায় না । মাত্র গৌতমসূত্রাদি পড়িয়া অনুমান, তর্ক, হেতুভাসাদির তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন বলিয়া বাহ্যিক অভিমান রাখেন, আমাদের বিশ্বাস এই, তাঁহারা ( “অহু” পূর্বক “মা” ধাতু “টন” করিয়া “অনুমান” পদ সিদ্ধ, “তর্ক” ধাতু হইতে “তর্ক” পদ নিষ্পন্ন, “হেতুভাসাঃ” এই অর্থে “হেতুভাসাঃ”, এইরূপে ) দর্শনশাস্ত্রের পদ সাধিতে শিখিয়াছেন মাত্র । কল কথা এই, প্রকৃতের অধিতীর উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই নৈরাসিক সমাজে প্রাপ্তক গদ্যেশোপাধ্যায় প্রভৃতির পুস্তক-সমূহের এত গৌরব । বৈয়াকরণও আছে, ব্যাকরণও আছে, সাহিত্যও

আছে, শব্দও আছে। তথাপি শক্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ, শব্দশক্তি-প্রকাশিকা প্রভৃতির এত গৌরব অধ্যাপকেরা কেন করেন বল দেখি ।

শিষ্য । ইহাদের গ্রন্থ যখন হয় নাই, তখন কি কেহ তবে ভায়-শাস্ত্রে পণ্ডিত হইত না ?

গুরু । হইবে না কেন ? গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পূর্বে ঐ সকল উপদেশ অতিসুন্দরিশি-গুরুর মুখে থাকিত। বুদ্ধিমান্ ছাত্রগণ গুরু-সকাশে ঐ সকল উপদেশ শিক্ষা করিয়া অভিজ্ঞ হইত। তখন লোকের এমন স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি ছিল যে, ঐ সকল উপদেশ গুরুর নিকট মুখে মুখে শিক্ষা করিয়া ধারণা করিতে পারিত। কিন্তু কালক্রমে সে শক্তি লোপ পাইতে থাকায় পরবর্ত্তিগণের জ্ঞান প্রাপ্তকৃত মহাত্মারা বহু আয়াসে সকল সার-কথা সংগ্রহপূর্বক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কি তাঁহারা দোষী ? অথবা তাঁহাদের গ্রন্থ দুষ্ট ?

শিষ্য । যাহাই বলুন, ভায়শাস্ত্রে একটি দোষ ঘটিয়াছে। পদার্থ-উপপত্তির জ্ঞান পরমাধাদি সহকারী কল্পাইলে ব্রহ্মের ক্ষমতাকে লঘু করা হয়। তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত ঘটে। ভায় শাস্ত্রের মীমাংসায় সেই দোষটী ঘটিয়াছে।

গুরু । এইবার বিষয় দোষারোপ করা হইয়াছে। তুমিও প্রতি পদার্থের উপপত্তির জ্ঞান ব্রহ্মাতিরিক্ত অগণন অনাদি ও সাদি অবিস্তা কল্পাইতেছ, তাহাতে ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত করা হইতেছে না কি ? ফলে, আমি পরমাধাদি কল্পাইতেছি বলিয়া ব্রহ্মকে কিছুমাত্র লঘু করা হয় নাই জানিবে। অনাদি অবিনশ্বর রাজার অনাদি অবিনশ্বর সম্পত্তি কল্পাইলে তাঁহার রাজত্বের ব্যাঘাত করা হয় না।

কোন রাজার অক্ষয়-সম্পত্তি তাঁহার লঘুতার হেতু হইয়াছে। ইহাতে যদি ব্রহ্ম লঘু হন, তোমার মীমাংসায়ও লঘু। শ্রুতিই ব্রহ্মকে লঘু করিয়াছেন বলিতে হইবে।

শিষ্য। এ বিষয় যাহাই হোক, ত্রায়শাস্ত্রে নির্ণীত মুক্তি একটা হাসির বস্তু। সত্যই উক্ত হইয়াছে ‘বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং ন চ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন।’ মুক্তজীব যদি ব্রহ্মই না হইল, অর্থাৎ শরীর-পরিগ্রহ বিরহিত হইয়া সুখ দুঃখাদি অনিত্য সামগ্রী বিবর্জিত জীবই রহিয়া গেল, তবে সে মুক্তিতে লোকের প্রলোভন হইবে কেন ?

গুরু। বিরোধী সম্প্রদায়ের উপহাসে মহর্ষি-কণাদাদির কিছুই আসে যায় না। তুমি নিশ্চয় ব্রহ্মকে স্বপ্রকাশ-বোধস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ বলিতেছ বলিয়া ব্রহ্ম হইবার জন্তই বুঝি লোকের লালশয় জলপ্লাবিত হইবে স্থির করিয়াছ ? স্বপ্রকাশবোধের আশ্রয় হইলে বরং কিছু লোভ দাঁড়াইত, বোধের স্বরূপ হইলে লাভ কি ? ‘বোধো বেত্তি’ এরূপ প্রয়োগ কখনও হয় না জানিবে। আনন্দ-ভোগকে যদি তুমি লোভনীয় ভাবিয়া থাক, তবে আনন্দের আশ্রয় হওয়া আবশ্যক। আনন্দের স্বরূপ হইলে তোমার সে লোভ পূর্ণ হইবে না। ক্ষীর, ছানা, মাখমের উপভোগই প্রলোভনের বিষয়। নিজে ক্ষীর, ছানা, মাখম হওয়া প্রলোভনের বিষয় নহে। অতএব এইরূপ মুক্তি তোমার আমার ত্রায় অবিবেকি-ব্যক্তির প্রলোভনের সামগ্রী না হইলেও বিবেকী ব্যক্তির বিশেষ বাঞ্ছনীয়। মুক্তি যে জ্ঞানের স্বরূপ বা আনন্দের স্বরূপ বেদের উপনিষদ্বা অর্থাৎ বেদ-ব্যাখ্যাকর্তা মহর্ষিরা কুত্রাপি একথা বলেন নাই। ঐ ব্যাখ্যা আধুনিক কল্পনা মাত্র। বিবেকী ব্যক্তির বুদ্ধিয়া থাকেন “অস্মিন্ সংসার-কাস্তারে কিমস্তি

দুঃখ-দুর্দিনানি, কিস্তী বা সুখ-খণ্ডোতিকা।” তাঁহারা জানেন, সংসার একটা অরণ্যবিশেষ। তাহা আবার দুঃখ-দুর্দিন নিবন্ধন প্রায়শঃই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এক আধটা সুখ-খণ্ডোতিকা বাহা আছে, তাহা সেই অন্ধকারকে অন্তরিত করিতে পারে না। সুখ দুঃখকে চিরকালের জন্য অন্তরিত করিতে পারে না, কিন্তু মুক্তি তাহা পারে। একারণ মুক্তি বিবেকি-ব্যক্তির পরম প্রলোভনের সামগ্রী। জ্ঞী-পুত্রাদির নিধনজন্তু লোকে অসহ্য ক্লেশ পাইলে, কখনও কখনও আত্মহত্যা করিয়া থাকে। ক্লেশ-নিবারণই তখন একমাত্র লক্ষ্য থাকে। অতএব ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ক্লেশ-নিবারণ যে প্রলোভনের সামগ্রী নহে, এমন বিবেচনা করিও না। এতদ্ব্যতীত, দুঃখাভাব যে একটা শাস্তিকর সামগ্রী নহে, এমনও বিবেচনা করা উচিত নহে। ভারাক্রান্ত ব্যক্তির ভার নাশ হইলে বলিয়া থাকে “আঃ বাঁচিলাম।” ইহা কি শাস্তির পরিচায়ক নহে? ‘সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যাধস্তি চ’ এই বাক্যে ভগবান্ ও বুঝাইয়াছেন, অদৃষ্টের ও আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি জীবের একান্ত ইষ্ট সামগ্রী। পুরীততি নাড়ীতে মনঃসংযোগ নিবন্ধন যে সময় জীব গভীর নিদ্রা যায়, সেই সময় তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না, দুঃখপ্ৰসূত কিছুই হয় না, সুখ দুঃখ থাকে না, ইহা নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সেই অবস্থাটি এতই শাস্তিকর যে, সেই শাস্তি অহুমান করিয়া নিদ্রোখিত ব্যক্তি কখনও কখনও বলিয়া থাকেন “কি সুখেই নিদ্রা ঘাইতেছিলাম।” ঋতিও রহিয়াছে “সুখমহমস্বাস্যাম্।” এই ‘সুখ’ শব্দ অবশ্য লাক্ষণিক, কিন্তু শাস্তির পরিচায়ক নহে কি? মুক্ত পুরুষের সেই শাস্তি নিরবচ্ছিন্ন থাকিবে। একারণ ভগবান্ ও সেই শাস্তিকে লাক্ষণিক “সুখ” রূপে ভগবদ্গীতার উল্লেখ করিয়াছেন, দেখা যায়। যথা,

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা ।

নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ স্বখং ॥

এই বাক্যে আমরা জানিতে পারি, আমরা যাহাকে সুখ-সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি, তাহা সুখের মধ্যেই নহে । মুক্তির পরে যাহা ঘটবে তাহাই সুখ-পরিভাষা পাইবার যোগ্য, অর্থাৎ তাহাই চিরশাস্তিকর সামগ্রী \* । যে মীমাংসা করা হইল, ইহাতে যদি লোভ পরিতৃপ্ত না হয়, তবে তোমার নির্ণীত মুক্তিতেও লোভ মিটিবে না । কারণ তোমার মতেও দুঃখাভাবই চরম ইষ্টে দাঁড়াইতেছে । শুধু তোমার মতে কেন, বহু-মতেই ঐক্য সিদ্ধ । কোন্ কোন্ দার্শনিক-সম্প্রদায় কোন্ কোন্ প্রকার মুক্তি নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক কারিকা মূল ‘অদ্বৈত-বাদখণ্ডন’ গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল । বিশেষ-মীমাংসা ঐ মূলগ্রন্থেই দ্রষ্টব্য ।

দুঃখস্তাত্যন্তনিমুক্তিং গোতমো মুক্তিমুক্তবান্ ।

নিবৃত্তির্দূরদৃষ্টানাং জগৌ কশ্চন তার্কিকঃ ॥ ১ ॥

\* । কেহ কেহ বলেন, যে নিম্নায় পুরীততি নাড়ীতে মনঃসংযোগ না হয়, সুখকর স্বপ্ন প্রভৃতি নিবন্ধন প্রীতির উদয় হয়, সেই নিম্না তাৎপৰ্য্যেই বলা হইয়াছে সুখমহমস্বাপ্নাম্ । পুরীততিত মনঃসংযোগ হইলে সে অবস্থাকে সুষুপ্তি বলে । সুপ্তি ও সুষুপ্তিতে প্রভেদ আছে । সুষুপ্তি কালে সুখ দুঃখ জ্ঞান সম্ভবে না । সুখমহমস্বাপ্নাম্ এরূপ না থাকিয়া যদি থাকিত “সুখমহং স্বস্বাপ্নাম্” তাহা হইলেই স্রুতিগী কিরোধী হইত এবং লক্ষণারও আবশ্যক হইত । “জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তাবস্থান্” ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্টে জানা যায়, কেবল “স্বপ্ন” ধাতুর দ্বারা সুষুপ্তি বুঝায় না । অতএব, ন কিঞ্চিদবেদিস্বম্ ইহার অর্থ “(সেই নিম্নাকালে) দুঃখকর কোনও বিষয়েরই আমার জ্ঞান ছিল না ।” এ মীমাংসাও বিবেচ্য ।

নিত্যানন্দস্য সম্ভোগো মুক্তিৰ্ভট্টস্য সম্মতা ।

মীমাংসকোক্তা দুঃখানাং প্রাগভাবানিবৰ্ত্তনং ॥ ২ ॥

একদণ্ডিমতে মুক্তিরবিদ্যায়া বিমোচনং ।

লিঙ্গবিগ্রহবিধ্বংসঃ সা নির্দিষ্টা ত্রিদণ্ডিনা ॥ ৩ ॥

উপরাগস্ত মহতো বিরতিঃ সাংখ্য-সম্মতা ।

যতন্তুপরাগস্ত কূটস্থস্থৈব বন্ধনং ॥ ৪ ॥

শিষ্য । যে শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ-সাহায্যে বৌদ্ধ নিরাস করিয়া-  
ছিলেন, সেই শঙ্করাচার্য্য কি তবে ক্ষুদ্র ব্যক্তি ? এবং সেই অদ্বৈতবাদ  
কি তবে শ্রুতি সম্মত নহে ?

গুরু । শঙ্করাচার্য্য ক্ষুদ্র ইউন আর বড়ই হোন সে কথার উত্থাপন  
করা কেন ? তবে, এক মতের দ্বারা অশ্রুত নিরাকরণ করিলেই যে  
তাহা শ্রুতি সম্মত হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই । উদয়নাচার্য্যাদি  
নৈয়ায়িকেরাই মাত্র, তর্কশাস্ত্রের দ্বারা বৌদ্ধ-নিরাস করিয়াছেন।  
বৌদ্ধাধিকারে এ বিষয়ের প্রকৃষ্টপ্রমাণ । “ঐশ্বর্য্য মদমন্তো হি মামনা-  
দৃত্য তিষ্ঠসি । আগতে চ পুনর্বৌদ্ধে মদধীনা তব স্থিতিঃ ।” এই  
সকল কবিতা এবং এতদ্-ঘটিত যত কিছু ইতিবৃত্ত অত্য়াপি অধ্যাপক-  
সমাজে জাজ্জল্যমান থাকিয়া উদয়নাচার্য্যের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা  
করিতেছে । যাগ যজ্ঞ কেন মানিতে হইবে কুসুমাজ্জলিতে তাহার  
প্রকৃষ্ট তর্কানুমান প্রদর্শিত । শঙ্করাচার্য্য তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার  
করেন না । শ্রুতিই তাঁহার বল । বৌদ্ধেরা যাগ যজ্ঞ বা তদ্-ঘটিত  
শ্রুতির প্রামাণ্যই স্বীকার করে না । অতএব বৌদ্ধ-বিদ্‌গ্‌গণের নিরাস  
তিনি কতদূর পরিমাণে করিতে পারিয়াছিলেন তাহাও ভাবিবাক



বস্তু। এতদ্ব্যতীত নৈসারিকগণই বৌদ্ধনিরাসক-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের সেরূপ পুস্তক একখানিও নাই। ফলকথা এই, শাস্ত্র-মীমাংসা কালে লৌকিক-কথার অবতারণা দ্বারা নিগ্রহ করা বিদ্বৎগণের কর্তব্য কার্যের মধ্যেই নহে।





## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ব্যাসহৃত্ত্ব। ব্যাসহৃত্ত্বে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন। ঋষিগণের মীমাংসা  
পরম্পরের সহিত ঐক্য হইলে প্রামাণ্যের আধিক্য।  
অদ্বৈতবাদিগণের যাবতীয় অনুমান হ্রিবার  
দার্শনিক-কোশল প্রদর্শন।

অদ্বৈতবাদী প্রাচীন আচার্যগণ যে সকল প্রমাণ আপনাদের  
মতের সাধকরূপে সর্বদা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, প্রায় তৎসমু-  
দয়েরই ব্যাখ্যা আমরা প্রদর্শন করাইলাম। অদ্বৈতবাদীদিগের  
স্ব-রচিত বলিয়া যে সকল বচন অনুমিত হয়, অথবা অপ্রামাণিক বিধায়  
যে সকল বচন স্বয়ং অদ্বৈতপক্ষীয় আচার্যেরাও কৃত্রাপি উদ্ধৃত  
করিতে সাহস করেন নাই, আমরাও তাহা ব্যাখ্যা করিবার বিশেষ  
কিছু আবশ্যক বোধ করিলাম না। কারণ, কি নিয়ম অবলম্বনে  
কোন জাতীয় প্রতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে, সে বিষয় আমরা বিশদ-  
রূপে বিবৃত করিয়াছি। তবে অদ্বৈতবাদী প্রামাণিক আচার্যেরা  
ব্যাসহৃত্ত্বেরও অনেকহৃত্ত্বের দ্বারা পর-মত খণ্ডন পূর্বক স্বমত সংস্থাপন  
করিতে চাহিয়াছেন। সেই হৃত্ত্বগুলির দ্বারা পরমত নিরাকৃত হয় অথবা  
অদ্বৈতবাদ নিরাকৃত হয়, তাহা সূত্রমাণ করিবার জন্য নিম্নে তর্ক-  
শোধিত পথে ব্যাস-কৃত সেই সকল হৃত্ত্বেরও ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইল।

উদয়নাচাৰ্য্যাদি যে সম্প্রদায়ের পরিপোষ্টা, জ্ঞায়রত্ন মহাশয় সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত, মহর্ষিগণ-কৃত মীমাংসার তাঁহার প্রবল বিশ্বাস, ইহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। জ্ঞায়রত্ন মহাশয় শ্রুতি সমন্বয়কালে সর্ব প্রথমেই লিখিয়াছেন,

কণাদস্যাক্ষপাদস্য যদজ্ঞানমসম্মতং ।

মহর্ষিমতবিশ্বাসাৎ কা ভীতিস্তস্য খণ্ডনে ॥

অর্থাৎ যে প্রকার অবিজ্ঞা গৌতম কণাদ-কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই, মহর্ষিমতে বিশ্বাস থাকায় আমি তাহা খণ্ডন করিতেছি। অতএব আমার ভয় কি ?

ব্রহ্মসূত্রে অদ্বৈতবাদখণ্ডন ।

(২য় অধ্যায় । ১ম পাদ হইতে ।)

তর্কী প্রতিষ্ঠানাদপ্যনুমানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষ-  
দোষপ্রসঙ্গঃ । তর্কস্থির করিয়া ব্যাপ্তি-নিশ্চয় পূর্বক অনুমান  
করা হুইবে। অতঃ উপায়ে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-সহচার যোগে যদি অনু-  
মান করা যায়, তবে সে অনুমানের প্রামাণ্য আছে কি না ? এই  
আশঙ্কা নিবারণার্থ ব্যাসদেব বলিতেছেন, “না তাহার প্রামাণ্য নাই।  
সে ভাবে অনুমান করিলেও দোষের মুক্তি হয় না। অর্থাৎ শ্রুতাদির  
স্থূল মীমাংসার দ্বারা যেমন নির্দোষ সিদ্ধান্ত হয় না, ঐ ভাবের  
অনুমানেও সেইরূপ নির্দোষ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।” ব্যাসদেবের  
এই সূত্রের দ্বারা আমরা কি বুঝিতে পারি ? বুঝিতে পারি, তর্ক-  
সাহায্যে ব্যাপ্তি স্থির না করিয়া, কেবল দৃষ্টান্ত-সহচার যোগে অনুমান  
করিতে যাওয়ার অদ্বৈতবাদ প্রধানবাদ প্রভৃতির অনুমানের প্রামাণ্য

নাই। ঐ সকল দর্শনকার বলিতে পারেন, “সূত্রটির দ্বারা তাঁহাদের অনুমান নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু তর্ক-সহযোগে যাহারা অনুমান করেন তাঁহারা কি রক্ষা পাইলেন? সূত্রস্থ ‘তর্কপ্রতিষ্ঠানাং’ এই অংশের দ্বারা তাঁহাদেরও অনুমানের অপ্রামাণ্য নির্দ্ধারিত হইল।” আমরা বলি, এই আপত্তি আপত্তিই নহে। সকল অনুমানকে অপ্রামাণিক বলা যদি ব্যাসের অভিপ্রায় হইত, তবে সূত্রের পূর্বাংশ না দিয়া ‘অনুমেরমিতিচেদেবমপ্যাবিমোক্ষদোষপ্রসঙ্গঃ’ এই অংশ টুকু দিলেই চলিত। তর্কসাহায্য না লইয়া যাহারা অন্তপ্রকারে অনুমান করিয়াছেন ‘তর্কপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্তথানুমেরং’ ইহা তাঁহাদেরই পূর্বপক্ষ। ‘তর্কপ্রতিষ্ঠানাং’ ইহা উত্তরপক্ষের কথা নহে। কারণ ‘যন্তর্কেণাভিসম্বন্ধে স ধর্ম্যং বেদ নেতরঃ’ ইহা যে ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ‘তর্কপ্রতিষ্ঠানাং’ এ অংশ সে ব্যাসদেবের মীমাংসা হইতে পারে না। তর্ক ভিন্ন অন্ত কোনও উপায়ে সর্বাংশের সামঞ্জস্য হইতে পারে না, ইহা আমরা পূর্বে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি। এবং সূত্রেও অন্ত উপায়ে মীমাংসা করিতে করিতে ব্যাসদেব “কৃত্ত্বপ্রসক্তির্নিরবয়বশব্দকোপো বা” এবং “দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানেন” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তর্কের প্রতিষ্ঠা এবং অনুমানের প্রামাণ্য নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা অগ্রে প্রতিপন্ন হইবে। অতএব তর্কপ্রতিষ্ঠিত করিয়া অনুমান করিতে না পারিলে সে অনুমানের প্রামাণ্য নাই; তর্কপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই মাত্র অনুমানের প্রামাণ্য আছে ইহাই বর্তমান সূত্রের মীমাংসা।

এতেন শিক্তাপরিগৃহীতা অপি ব্যাখ্যাতা। এই সূত্রটির দ্বারা শিষ্টের অপরিগৃহীত বস্তু নিরাকরণ করা হইয়াছে।

এইবার ব্রহ্মের সহিত ভেদ-সাধক সূত্র করা হইয়াছে, ভোক্তা-

পত্তেরবিভ্রাশেৎ । বিষয়ের সহিত ব্রহ্মের অভেদ বিদ্যমান ইহা যদি বল তবে ভোগ্যের ভোক্তৃত্বাপত্তি । ভেদ নির্দ্বারগের জন্ত পরেই স্বতন্ত্র সূত্র করিতেছেন, স্মার্লোকবৎ । লোকবৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে । অর্থাৎ পরিমাণ-পার্থক্যাদি বিভিন্ন-ধর্ম নিবন্ধন সর্ষপ-পর্বতাদির ভেদ তুমি লোকে প্রত্যক্ষ করিতেছ, অলৌকিক পদার্থে অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মেও সেইরূপ পরিমাণ পার্থক্যাদি বিভিন্ন ধর্মনিবন্ধন ভেদ আছে জানিবে ।

লোকব্যবহারও নানারূপ আছে, প্রতিও নানারূপ আছে । কিরূপ প্রতির দ্বারা ভেদাভেদ নিশ্চয় করিতে হইবে তাহাও এক্ষণে বলিতেছেন, তদনন্যত্বমারম্ভগণশব্দাদিভ্যঃ । অমুক-বস্তু অমুক-রস্তুক, এইরূপ ব্যবহার যেখানে পাইবে, সেখানে অভেদ কল্পনা করিবে । ‘বাচারম্ভগং বিকারো নামধেয়ং’ এইরূপ শব্দ থাকায় ঘটাদিতে মৃত্তিকার অভেদ নিশ্চয় করা প্রয়োজনীয় । কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে ‘তদৈক্যত’ ‘তদসৃজত’ ইত্যাদি । সকল বস্তু যে ব্রহ্মারম্ভক এরূপ শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই । এ কারণ ব্রহ্মে ও বিষয়ে অভেদ নাই । দৃষ্টান্তে ‘আরম্ভগ’ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া দার্ষ্টান্তে যাহাতে অভেদ কল্পিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই সূত্রে ব্যাসদেব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন ‘আরম্ভগ’ শব্দের ব্যবহার দেখিয়া অভেদ নিশ্চয় করিবে ।

যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে । ইত্যাদি প্রতি দৃষ্টেও ব্রহ্মকে উপাদান কারণরূপে স্থির করা উচিত হয় না । উপাদান কারণের জ্ঞান নিমিত্ত কারণেও পঞ্চমী প্রয়োগ হইতে পারে । যথা, “ধর্ম্মা-  
হুংপত্ততে সূত্রং” এবং “সঙ্গাং সঙ্গায়তে কামঃ কামাং ক্রোধোক্তি-  
জায়তে” ইত্যাদি । বিশেষতঃ উক্ত প্রতি যে সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তার পরি-

চায়ক, অর্থাৎ সগুণ-ব্রহ্ম-পর তাহা পরবর্তী অংশসমূহ পর্যালোচনা করিলেও জানা যায়। যথা “যেন জাতানি জীবন্তি” ইত্যাদি। ব্যাস-মূত্রেও “অথাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এইরূপে উপক্রম করিয়া পরে সৃষ্টিস্থিতির-কর্তারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যথা “জন্মান্তর যতঃ” ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রহ্ম উপাদান বিধায় কারণ ইহা কুত্ৰাপি দেখা যায় না। অতএব ব্রহ্মে ও বিষয়ে অভেদ নির্ধারণ করা উচিত নহে। এই সকল কারণেই ব্যাসদেব লিখিয়াছেন “তদনন্তত্বমারম্ভণ শব্দাদিত্যঃ” ইত্যাদি।

অভেদ স্থির করিবার উপায়ান্তরও লিখিত হইতেছে, ভাবে চোপলক্ষেঃ। সত্ত্বাচ্চাবরম্ভ। যে দ্রবোর সত্তা পরিলক্ষিত হইলে যে উপাদানের সত্তা নিয়তই পরিলক্ষিত হয়, সেই দ্রবোও, সেই উপাদানের অভেদ বিদ্যমান বুলিতে হইবে। এ কারণ, ঘটে ও কুলালে, ব্রহ্মে ও বিষয়ে অভেদ নাই। কিন্তু ঘটে মৃত্তিকার অভেদ বিদ্যমান।

জগৎ ব্রহ্মোপাদানক নহে ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, উপাদান বিধায় সৃষ্টির পূর্বে কোনও সামগ্রী থাকা উচিত। নচেৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। উপাদান-বিধায় বা কতৃ-বিধায় কোনও সামগ্রী ছিল কি না কে মীমাংসা করে? কারণ শ্রুতি বলিতেছেন ‘অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ’। ভ্রামক অর্থ এই, সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না, শূন্যমাত্র ছিল। ব্যাসদেব বলিতেছেন, ও কিরূপ শ্রুতি-মীমাংসা হইল? অসদ্ব্যপদেশোম্মোত-চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ। অসৎ-ব্যপদেশ থাকিলেই শূন্য-বাদ সৃষ্টি করিতে হইবে না। বাক্য-শেষ অর্থাৎ ‘ততো বৈ সদজারত, ‘তদাঙ্গানং স্বয়মকুরুত’ এই সকল অংশ অনুশীলন করিলে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্বে ‘অত্র ধর্ম্ম পুরদারে’ ‘অসৎ’ থাকে। অত্র ধর্ম্ম কিরূপ? ‘অসৎ’ শব্দের অর্থ সং ভিন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন। অতএব পরমাধাদি

পাওয়া গেল। সুতরাং “অব্যাক্তাদি-ধর্মাস্তর-রূপে” ভূতের অবস্থান সৃষ্টির পূর্বেও থাকে। ভগবদ্গীতারও প্রমাণ যথা, ‘অব্যাক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।’ এ বিষয়ের বিশেষ বিচার পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

উপাদান-বিধায় পরমাধাদি ছিল, ইহা সংস্থাপিত হইল। কিন্তু কর্তৃবিধায় ব্রহ্ম ছিলেন ইহার সংস্থাপন হইল কই? এই আশয়ে ব্যাসদেব বলিতেছেন, যুক্তোঃ শব্দান্তরাচ্চ। যুক্তিও আছে, অন্তঃশ্রুতিও আছে।

বিভিন্ন পদার্থ সিদ্ধ হইল। কোন স্থলে অভেদ নির্ধারণ করিতে হইবে, তাহাও সামান্যাকারে বুঝান হইয়াছে। কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়া অভেদ বুঝান এখনও হয় নাই। তাই ব্যাসদেব সূত্র করিতেছেন, পটবচ্চ। অর্থাৎ সূত্র ও পটের দৃষ্টান্তে অভেদ স্থির করিতে হয়। ব্যাসদেবের এই দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কাশ-কটে অভেদ বিদ্যমান। কিন্তু ব্রহ্মে ও বিষয়ে অভেদ স্থির করিতে পারা যায় না।

অদ্বৈতবাদি-পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থিত হইতেছে, ভেদ-ব্যবহারের উপপত্তির জন্য ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করিব কেন? উপাধিভেদে ব্রহ্মেই লাবণ্যভেদ স্বীকার করিব। ইহাতে ব্যাসদেব বলিতেছেন, ইতরব্যাপদেশাঙ্কিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ। অর্থাৎ ব্রহ্মেই উপাধিবশে ভেদ স্বীকার করিলে, বলিতে হইবে ব্রহ্ম সুধ-দুঃখ-নরকাদি-সৃষ্টির দ্বারা আপনারই অহিত করিয়াছেন। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে ভেদ সিদ্ধি এই সূত্রের দ্বারা হইল।

এই দোষ দিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ হইল না। সে কারণে দোষান্তর দিতেছেন, অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ। অশ্মবচ্চা-

নুপপত্তেঃ । অর্থাৎ বিশেষভাবে ভেদ-নির্দেশ আছে। প্রত্যয়কে বিভিন্ন ভাবে গঠিত করিলে, তাহাতে প্রত্যয়-ভেদ সংস্থাপন করা চলে না ।

‘অসহ্য ইদমগ্র আসীৎ’ ইত্যাদি শ্রুতির উপসংহার দৃষ্টে আশ্রয় স্থির করিয়া থাকি, কি ঘট পটাদি লৌকিক পদার্থ, কি শিবভূগাদি ব্রহ্ম পদার্থ সমুদয়ই পরমাণু-মূলক ও ব্রহ্ম-কর্তৃক । কিন্তু, উপসংহারে ব্রহ্মের হস্তপদাদি করণের সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই । অদ্বৈতবাদী আপত্তি করিতে পারেন, পরমাণু যোজিত হয় কিরূপে ? অর্থাৎ উপসংহার দৃষ্টি করিলে ইহাই স্থির করা উচিত যে, ব্রহ্ম-কর্তৃক সৃষ্টি নির্বাহ পায় না । এই পূর্বপক্ষের মীমাংসা বাসদেব এই ভাবে করিতেছেন, উপসংহারান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবৎ । অর্থাৎ উপসংহার দৃষ্টে স্থির করিও না যে সৃষ্টি অসম্ভব । দুগ্ধ দধি-হিমাত্ররূপে পরিণত হইবার কালে তৈজস পরমাণুদি দেখরেচ্ছাধীন আপনা আপনি যোজিত হয় । হস্তপদের অপেক্ষা করে না ।

এই দৃষ্টান্তে বাসদেবের পরিতোষ না হওয়ায়, অল্প দৃষ্টান্ত দিতে-ছেন, দেবাদিবদপি লোকে । দেবতারা ইচ্ছা করিলেই লৌকিক বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন । তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে উপাদান যোজিত হয়, হস্তপদাদি করণের যেমন অপেক্ষা থাকে না, ব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেইরূপই জানিবে ।

‘তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ’ এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া মাত্র লৌকিক নিয়মে এতক্ষণ বাদীর আপত্তি খণ্ডন করা হইল । এইবার তর্ক-সিদ্ধ দোষ প্রদর্শন করান হইতেছে, কুস্প্রসক্তির্নিরবয়বত্ব শব্দ-কোপো বা । অর্থাৎ ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিলে তাঁহাতে রূপ, রস, গন্ধাদির আপত্তি । অথবা ব্রহ্মোপাদানক দ্রব্যের নিরবয়বত্ব



আপত্তি। প্রথম আপত্তির তর্কের আকার, “(রূপহীনং) ত্রক্ষ যদি রূপবদারম্ভকং স্তাৎ তদা রূপহীনং ন স্তাৎ। (রসহীনং) ত্রক্ষ যদি রসবদারম্ভকং স্তাৎ তদা রসহীনং ন স্তাৎ। ইত্যাদি।” দৃষ্টান্ত, জল মৃত্তিকাদি। দ্বিতীয় আপত্তির তর্কের আকার, “যদি ঘটাদিকং সর্বং (সাবয়বং) দ্রবাং একমাত্রোপাদানকং স্তাৎ তদা সাবয়বং ন স্তাৎ। দৃষ্টান্তঃ, ঘটাদীনাং রূপরসাদয়ঃ, আকাশস্ত শব্দাঃ, জীবানং সুখ-দুঃখাদয়ঃ। ইত্যাদি।”

ভেদ সাধনের জন্ত তর্কসম্মত দোষ অদ্বৈতবাদিগণের মীমাংসার উপর ব্যাসদেব অর্পণ করিলেন। এক্ষণে আশঙ্কা উঠিতেছে ঐ তর্ক সৎতর্ক হইয়াছে বলিল কে? ব্যবহার নাই, শ্রুতি নাই, এমন বিষয়ে তর্ক দেখাইলেও কি তাহাকে সৎতর্ক বলিতে হইবে? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ব্যাসদেব বলিতেছেন, শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ। ভেদ-সংস্থাপনে যে তর্কসিদ্ধ দোষ প্রদর্শন করাষ্টলাম, তদ্বিষয়ে শ্রুতিমূলক ব্যবহার আছে। তাৎপর্যা এই, শ্রুতি নানাবিধ। ব্যাক-হারও নানাবিধ। এ ক্ষেত্রে শ্রুতানুকূল তর্ক যে পক্ষে পাওয়া যাইবে, সেই পক্ষই প্রকৃত শ্রুতার্থ অবধারণ করিতে পারিয়াছেন বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রুতানুকূল তর্ক, কুতর্ক হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদিগণের পুস্তকগুলি লইয়া ত্রায়পক্ষে ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য কি? সে গুলির অদ্বৈতপক্ষে যেমন ব্যাখ্যা রহিয়াছে, ত্রায় পক্ষেও সেইরূপ একটা ব্যাখ্যা থাকুক, ইহা ত্রায়রত্ন মহাশয়ের উদ্দেশ্য নহে। অদ্বৈত-ব্যাখ্যায় পুস্তকগুলির কদর্থ করা হইয়াছে কি না এবং দ্বৈতব্যাখ্যায় প্রত্যেক স্থানে কত স্বরস আছে তাহাই অভিজ্ঞগণের নিকট প্রদর্শন করান ত্রায়রত্ন মহাশয়ের মুখা উদ্দেশ্য। ব্যাসসূত্রের যে অংশের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইল, অদ্বৈতবাদীরা কি তাহার ব্যাখ্যা

করেন নাই? করিয়াছেন সত্য। সূত্রগ্রন্থ সমূহ এতই জটিল-ভাবে লিখিত থাকে যে, পূৰ্ণাপর দুই চারি পৃষ্ঠা করিয়া ভাবপূরণ না করিলে তাহাদের ব্যাখ্যা হয় না। কাযেই শুধু অদ্বৈতবাদ-সমর্থন কেন, ব্যাসসূত্রের অনেক সূত্র লইয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞা, অস্ত্র-বিজ্ঞা, খগোল-বিজ্ঞা প্রভৃতিরও সমর্থন করা যাইতে পারে। এ কারণ সূত্রাবলম্বনে পদার্থ নির্ণয় করিতে হইলে, গভীর অনুভব আবশ্যক। ভ্রামরত্ন মহাশয় কিরূপ অনুভবের বশবর্তী হইয়া উক্ত সূত্রগুলির ভ্রামরপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিচক্ষণগণের চিন্তা করিবার বস্তু।

ভ্রামরত্ন মহাশয় বলেন, ভাব-পূরণ করিয়া ব্যাখ্যা করা চলে বলিয়াই অদ্বৈতবাদীরা অনেক সূত্র স্বপক্ষে টানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু যে যে সূত্রে ভাব-পূরণ করিয়াও নিস্তার পাইবার উপায় নাই, অদ্বৈতবাদিগণের হস্তে সেই সূত্রগুলির দুর্গাতর একশেষ হইয়াছে। ‘ক্লৎস প্রসক্তির্নিরবয়বত্ব শব্দ কোপো বা’ এই সূত্রের দ্বারা ব্যাসদেব অদ্বৈতবাদে তর্ক-সিদ্ধ দোষ অর্পণ করিয়াছেন। মন্তকের উপর বজ্র-লেপবৎ দোষ পোছিয়াছে বলিয়া, শঙ্করাচার্য্যাদি ঐ সূত্রে পূর্বপক্ষীয় সূত্ররূপে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সূত্রটি কি অপরাধ করিয়াছে বুঝি না। ঐ সূত্রটিতে প্রথমাস্ত্র এবং পরবর্তী সূত্রে পঞ্চমাস্ত্র প্রয়োগ দেখিয়া কি এই সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে? সেরূপ হইলে, অবিমোক্ষ-দোষ প্রসঙ্গঃ, তদনন্তরভ্রামরভ্রামর শব্দাদিভাঃ, অগ্ন্যবচ্ছাদনপপত্তিঃ, লোক-বতুলীলাটকবল্যঃ ইত্যাদি সহস্র সহস্র সূত্রের সেরূপ দুর্গতি না করা হইল কেন? ফলে, সাধ্য হেতুর স্থলে প্রথমাস্ত্র ও পঞ্চমাস্ত্রের প্রয়োগ দোষাবহ নহে। তদ্ব্যতীত, পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কা উত্থাপন করিতে হইলে নঙাদির ব্যবহারই দার্শনিকগণ করিয়া থাকেন। তদনুসারে ব্যাসসূত্রে ‘চেৎ’ ‘চেন্ন’ ‘ইতি ন’ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ যে যে স্থলে

পরিদৃষ্ট হয়, সেই সেই অংশকেই পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কা বিবেচনা করা উচিত হয়। সম্পূর্ণ বিধি রহিয়াছে, তুমি তাহাতে ‘নঙ্’ অধ্যাহার করিয়া নিষেধ-রূপে পর্যাবসান করিতে পার না। সূত্র রহিয়াছে ‘অয়ং বিষধরঃ’, হেতু দেখাইতেছেন ‘হরিহাং’। ‘হরি’ শব্দের অর্থ সর্পও হয়, বিষ্ণুও হয়। কিন্তু ‘সর্প’ অর্থ গ্রহণ করিলে তোমার ইষ্টসিদ্ধি হয় না। কাষেই ‘বিষ্ণু’ অর্থ তুমি গ্রহণ করিলে, এবং ‘অয়ং বিষধরঃ’ এই অংশকে পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কা নির্দেশ করতঃ, ‘অয়ং বিষধর ইতিচেন্ন’ এইরূপ গঠন করিয়া লইলে। ইহা কি শাস্ত্রীয় মীমাংসা? ‘দেবদত্তঃ পচতি’ এইরূপ প্রয়োগ পাইলে ‘ওদনং’ এই কর্ণের অধ্যাহার করিয়া লইতে পার বটে, কিন্তু ‘দেবদত্তঃ পচতি’ এই বাক্যকে ‘দেবদত্তো ন পচতি’ এই বাক্যরূপে পরিণত করিতে পার না। ‘আয়ুষ্মতং’ এই ঋতি পাইলে, ‘স্বত আয়ুঃ নহে’, এ মীমাংসা করিবার তোমার উপায় নাই। স্বত আয়ুঃ নহে বলিয়া, স্বত আয়ু-ভ্রনক এইরূপ লক্ষণা তোমাকে করিতে হইবে। নঙ্ পূরণ করিয়া লইয়া, কুত্রাপি বিধিকে নিষেধরূপে পরিণত করা বৈধ নহে। বিশেষতঃ যদি ‘নঙ্’ পূরণ না করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তো ঐ কার্যটি একেবারেই অকর্তব্য। সূত্র-বাক্য অতীব জটিল। ভাবপূরণ করিতে করিতে ব্যাখ্যা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অতএব উহারই মধ্য হইতে অব্যভিচারী সূত্র যাহা কিছু বাহির করা যাইবে, তদনুকূলেই অগ্রাশ্রয় সূত্রের ভাব-পূরণ আবশ্যক। আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে একটা মাত্র সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। এইরূপ বহুসূত্রেরই ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া সঙ্গ্রহণ করা যায় যে, ব্যাসসূত্রকে অতি দুর্বল ভাবে অদ্বৈত-পক্ষে টানিয়া লওয়া হইয়াছে।

ভাস্কর্য্য মহাশয় আরো বলেন, ব্যাসদেবও যেমন মহর্ষি, গৌতমও

সেইরূপ মহর্ষি, কণাদও সেইরূপ মহর্ষি। কোনও নূতন মত সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইলে অগত্যা আবশ্যকমতে স্বপক্ষোপযোগি-ব্যাখ্যা প্রদর্শন করাইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি ঋষি-মীমাংসা পরস্পরে ঐক্য করিয়া ব্যাখ্যা করিবার উপায় থাকে, প্রামাণিকতা হিসাবে তাহাই সৰ্বাগ্রে সাধুগণের গ্রাহ্য। বিশেষতঃ গৌতম কণাদের সিদ্ধান্ত যেরূপ তর্কীবলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সে রূপ তর্ক আর কোনও সিদ্ধান্তে প্রদর্শিত হইতে পারে না।

শ্রুতিসমূহের নানারূপ অর্থ করা বাইতে পারে, বিভিন্ন আখ্যানদর্শন সৃষ্টিই তাহার প্রমাণ। ব্যাসসূত্রাদি গ্রন্থও সকল দিকে লাগিতে পারে। তবে অবাভিচারী এমন কি নিয়ম অদ্বৈতবাদী প্রদর্শন করাইতে পারেন, যদ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্তে প্রামাণ্য-সংস্থাপন করা যায়? অদ্বৈত-বাদীর অনুমানের প্রামাণ্য নাই, তাহা পূর্বোক্ত ব্যাসসূত্রের দ্বারা অগ্রেই জ্ঞায়িত মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জ্ঞায়িত মহাশয় কি ঐ ব্যাখ্যায় ভ্রম করিয়াছেন? না, তিনি ভ্রম করেন নাই, ইহাও সঙ্গ সঙ্গ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, অতীন্দ্রিয়-বিষয় অনুমান করা দূরের কথা, ‘পর্যন্তো বহিমান্ ধুমাৎ’ ইহাই সদানুমান কি না অদ্বৈতবাদীরা তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন না। পর্যন্তে বহিসংশয়। কাষেই পর্যন্তটী বাদ রাখিয়া, তাঁহাদিগকে সহচার বা দৃষ্টান্ত খুজিতে হইবে। অর্থাৎ খুজিয়া দেখিতে হইবে, পর্যন্ত বাতীত অস্ত্রান্ত যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সেই স্থানে বহি থাকে কি না? একরূপ অবেষণ করিলে যদি অনুমান সিদ্ধ হয় বল, তবে তুমি যে সময় ধূম দেখিয়া বহির অনুমিতি করিতে চাহিবে, আমি অস্ত্র সামগ্রী দেখা-ইয়া পর্যন্তে বহ্যভাবে অনুমান করাইয়া দিতে পারিব। আমি বলিব

## পৰ্বতোবহ্যভাবাতিরিক্তপক্ষবৃত্তি-

ধৰ্ম্মাতিরিক্ত-ধৰ্ম্মবান্ প্রমেয়ত্বাৎ ।

তুমি পৰ্বতটী বাদ রাখিয়া খুজিয়া দেখ, যেখানে যেখানে আমার হেতু বিদ্যমান, সেই সেই স্থানেই আমার সাধ্য আছে। অতএব তুমি বহি অনুমান করিতে গেলে আমি তোমাকে প্রকারান্তরে বহ্যভাবও অনুমান করাইয়া দিতে পারি। অতএব ‘বহিমান্ ধূমাৎ’ ইহা সন্দেহ কি না, তুমি যখন বুঝাইতে পার না, অতীন্দ্রিয় বিষয় কিরূপে অনুমান করিবে? যে ‘পক্ষে’ যে ‘সাধ্য’ তুমি অনুমান করিতে যাইবে, আমি ‘প্রমেয়ত্বাদি’ হেতু দেখাইয়া সেই ‘পক্ষে’ তৎসাধ্যভাবাতিরিক্ত-পক্ষবৃত্তিধৰ্ম্মাতিরিক্ত-ধৰ্ম্ম সিদ্ধ করিয়া তোমার অনুমানে দোষ দিব। এই এক নিয়মে অদ্বৈতবাদ-সমূহে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্তু অনুমান আছে, সকল অনুমান ছুট হইয়া যাইবে। এ কারণ লৌকিক নানা উপায়ে ভেদ সিদ্ধ করিয়া ব্যাসদেবও অবশেষে তর্কসিদ্ধ আপত্তিই অদ্বৈতবাদিগণের উপর আরোপ করিয়াছেন, ইহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এখন বোধ হয় দার্শনিকেরা বুঝিলেন পূর্বোক্ত ব্যাসসূত্রগুলির ব্যাখ্যা ভ্রামররত্ন মহাশয় যাহা করিয়াছেন, তাহাই বিদ্বৎ। অতএব সেই বিদ্বৎ ব্যাখ্যার অনুকূলে ব্যাসসূত্রের অন্ত্যন্ত স্থলেরও কিরূপ ব্যাখ্যা করা উচিত হয়, তাহা পর পর পরিচ্ছেদে কতক প্রদর্শন করান হইতেছে।





## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

ব্যাসসূত্রে পরমাণু । অদ্বৈতবাদ-সাধক যাবতীয়  
দৃষ্টান্ত দৃষিবার কোশল । ব্যাসসূত্রে আকাশ ।  
ব্যাসসূত্রে জীবাত্মা । ব্যাসসূত্রে  
ব্রহ্মের স্বরূপ ।

ব্যাসসূত্রে পরমাণুসংস্থাপন ।

( ২য় অধ্যায় । ২য় পাদ হইতে । )

মহদীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং । অর্থাৎ মহৎ ও দীর্ঘ  
পরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ, হ্রস্ব ও পরমাণুযোগে উদ্ভূত । এই সূত্রস্থ  
‘মহৎ’ ও ‘দীর্ঘ’ শব্দ ভাবে নির্দেশ । যথা ভাষা পরিচ্ছেদে, “কাল  
খাদ্বাদিশাং সর্বগতং পরমং মহৎ ।”

উভয়থাপি ন কস্মীতস্তদভাবঃ । অর্থাৎ কি অদ্বৈতবাদ,  
কি প্রধানবাদ কোনও মতেই ব্রহ্মে বা প্রধানের আরম্ভক ক্রিয়া স্বীকৃত  
হইতে পারে না । উত্তরোত্তর মহৎ ও দীর্ঘ দ্রব্য হইতে হইলে উপা-  
দানের ক্রিয়া আবশ্যক । এ কারণ ব্রহ্মে বা প্রধানের তদুপাদানের  
অভাবই আছে । পরমাণু ও হ্রস্ব দ্রব্যের দ্বারা মহৎ ও দীর্ঘ দ্রব্য

সৃষ্ট হইতেছে, এ সূত্র সঙ্গত। কারণ ইহার পরিচ্ছিন্ন হওয়ার ইহা-  
দিগের ক্রিয়া সম্ভবে।

সমবায়্যভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ। অর্থাৎ মহৎ বা  
দীর্ঘ হইতে হইলে উপাদানে উপাদেয় ক্রমশঃ সমবেত হইতে থাকে।  
'সমবায়' স্বীকার করায় সে কার্যের উপপত্তি হইল।

নিত্যমেব চ ভাবাৎ। সমবায় ও পরমাণুকে নিত্য বলিয়া  
জানিবে। তাহার হেতু এই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে 'ন কৰ্ম্ম-  
বিভাগাদিত্তিচেন্নানাদিত্বাৎ' এই সূত্রের দ্বারা সৃষ্টি-ধারার অনাদিত্ব  
পরিকল্পিত হইয়াছে। সুতরাং পরমাণু ও সমবায়ের অনাদিত্ব সিদ্ধ।  
নচেৎ সৃষ্টি সম্ভব পায় না। তত্স্থপরি, এই সূত্রে হেতু দর্শাইলেন  
'ভাবাৎ'। ভাব-পদার্থ অনাদি হইলে তাহার নাশও নাই। জ্ঞান-  
শাস্ত্রের ইহাই মীমাংসা।

রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ। সৃষ্টবস্তুতে কতই বিপ-  
র্য্য সাধিত হইতেছে। ইহাতে 'না' বলিবার উপায় নাই, যেহেতু  
আমরা চোখে দেখিতেছি। পরমাণুতে পাকাধীন-রূপরসাদি স্বীকৃত  
আছে বলিয়াই রূপরসাদির একরূপ বিপর্য্যয় পরিদৃষ্ট হয়।

উভয়থা চ দোষাৎ। প্রধানবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয় মতেই  
দোষ ঘটিয়া যায়। অর্থাৎ সমবেত দ্রব্যের রূপরসাদির প্রতি সমবায়ি-  
দ্রব্যের রূপরসাদির কারণতা। ইহার বিচার জ্ঞানশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।  
ঈশ্বর ও প্রধানের রূপরসাদি না থাকায় উভয়মতেই সৃষ্টবস্তুতে রূপরসাদি  
বিষয়ে বিপর্য্যয় সাধিত হইতে পারে না।

তবে কি প্রধানবাদে বা অদ্বৈতবাদে সৃষ্টবস্তুর উপপত্তি করা  
হয় না? ব্যাসদেব বলিতেছেন, হইবে না কেন? অপরিগ্রহাচ্চা-  
ত্যন্তমনপেক্ষা। যে ভাবে (গরু সহযোগে) উপপত্তি করা হয়,

তাহা বেদপুরাণে কুত্রাপি নাই। এ কারণ তাহা অত্যন্ত অগ্রাহ্য। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়, তাহাতে পরস্পরে সৌসাদৃশ্য আছে। নিরাকার বিশ্ববাপী ব্রহ্মে সকলেরই চিরকাল সমান ভ্রম চলিয়াছে, এ বিষয়ে সৌসাদৃশ্য কি? রজ্জুতে সর্প ভিন্ন মহিব ভ্রম হয় না জানিবে \*।

\* ভ্রম সম্বন্ধে আর একটা বিশেষ নিয়ম এই, ধর্ম ধর্মী উভয়েই একেশ্বর-গ্রাহ্য না হইলে (মানস ভ্রম সম্ভব পার পাউক, কিন্তু) লৌকিক ভ্রম হইতেই পারে না। আকাশে নীলিমার ভ্রম হইতেছে, এই আপত্তি আপত্তিই নহে। সুদূরবর্তি আলোকাদিতে ঐরূপ নীলিমাদির ভ্রম হইয়া থাকে। স্তনের গুহের পান লইয়া ‘পীতঃ স্তনঃ’ এইরূপ ব্যবহার যেমন সিদ্ধ হয়, পুষ্পের গন্ধের ভ্রাণ লইয়া ‘আত্মেরঃ পুষ্পঃ’ এইরূপ ব্যবহার যেমন সিদ্ধ হয়, জলে কর্পূরাদির গন্ধ লইয়া যেমন ‘ভ্রগন্ধি জলঃ’ এই ব্যবহার সিদ্ধ হয়, সেইরূপ আকাশের পূর্কোক্ত আলোকাদির নীলিমাজান লইয়া ‘নীলঃ নভঃ’ এই ব্যবহার সিদ্ধ হয় মাত্র। ‘অহং হৃদয়ঃ’ এই প্রয়োগ সম্বন্ধেও কিছুই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। ‘অহং হৃদয়ঃ’ ‘অহং হৃদী’ ইত্যাদি পৃথক পৃথক প্রয়োগ দৃষ্টে জানা যায়, দেহ এবং তদধিষ্ঠাতা উভয়ই ‘অস্মৎ’ শব্দের শক্তি। (শক্তিবাদ গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশেষ বিচার দ্রষ্টব্য।) ‘হৃদয়োহহং হৃদী’ এই জাতীয় প্রয়োগ করিলে সঙ্গত হয়, তাহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। ‘সমসার’ সম্বন্ধে হৃথ যেমন আশ্চর্য থাকে, ‘অবচ্ছেদকত্ব’ সম্বন্ধে হৃথ সেইরূপ শরীরেও থাকে। ‘অস্মৎ’ শব্দের শরীরেও ‘শক্তি’, ইহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। অতএব ‘হৃদয়োহহং হৃদী’ এরূপ জ্ঞান ভ্রম নহে। বেদ পুরাণেও একত্র ঐরূপ ব্যবহার সকল দৃষ্ট হয়। শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানে, ‘রাসং’, এই শব্দের উপর ‘নীলাভোদরকান্তিকান্তঃ’ সীতাং পশুত্বং’ এই উক্তর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। বাসদেবের ধ্যানে, ‘বাসং’ এই শব্দের উপর ‘বেদশাস্ত্রপরিমিতশুদ্ধবুদ্ধিঃ’ এবং ‘কৃকষিৎ’ এই উক্তর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। বজীর ধ্যানে, ‘বজীং’ এই শব্দের উপর ‘সৌর্যবর্ণঃ’ ‘হৃত-প্রদাং’ এই উক্তর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। বহুলেই এইরূপ আছে। জ্ঞান, দানকর্তৃক প্রভৃতি সমসার সম্বন্ধে আশ্চর্য ধর্ম হইলেও ‘অবচ্ছেদকত্ব’ সম্বন্ধে ঐগুলি



বিশেষতঃ ভ্রমের একটী বিশেষ নিয়ম এই, যে বস্তুতে যে বস্তুর ভ্রম হইবে, সেই উভয় বস্তুই সিদ্ধ থাকা প্রয়োজন। স্বপ্নেরও সেই নিয়ম। অতএব স্বপ্নের সহিতও জাগতিক বস্তুর তুলনা হইতে পারে না। লাল-নীল-সবুজ-বর্ণের মনুষ্য চতুষ্পদ-বিশিষ্ট-ডিঘ প্রসব করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন তুমি দেখিতে পার। তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। কারণ, লাল, নীল, সবুজ, বর্ণ প্রসিদ্ধ, মনুষ্য প্রসিদ্ধ, চতুষ্পদ প্রসিদ্ধ, ডিঘও প্রসিদ্ধ। কেবল, স্বপ্নে প্রসিদ্ধ সামগ্রীগুলির অযথা সমাবেশ পরিদৃষ্ট

শরীরেরই ধর্ম হওয়ায় একত্র দ্বিবিধ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। ‘অবচ্ছেদকত্ব’ সম্বন্ধের ‘বৃত্তিনিয়ামকতা’ বিষয়ে স্মারশাস্ত্রেও প্রমাণ আছে। এই সকল অপ্রাপ্ত বাক্যকে প্রাপ্তবাক্য বলিতে তাহাদের সাহস হয় হৌক, সকলে কিন্তু সে সাহস না করিতে পারে। অতএব ধর্ম ধর্ম উভয়ে এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলে লৌকিক ভ্রম হইতেই পারে না, ইহা ঐ সম্প্রদায়ের মত। সর্পে রজ্জুভ্রম, আলোকা-দ্বিতে নীলমভ্রম, শব্দে পীতভ্রম, মরীচিকার জলভ্রম, এ সকল (চাক্ষুষ ভ্রম) হওয়ায় আশ্চর্য্য কি? বায়ুতে রূপের অথবা ঘটে গুরুত্বের চাক্ষুষ কথনই সম্ভব পায় না। অতএব ব্রহ্মে ঘট পটাদির চাক্ষুষ কিরূপে সম্ভব পাইবে? ফলকথা, এ সকলও চিন্তা করিবার বিষয়। অধিকতর বিস্ময়কর প্রতিবিম্ববাদের দৃষ্টান্ত। স্বর্ঘ্য এক হইলেও বহু প্রতিবিম্বিত হন সত্য, তা বলিয়া ব্রহ্ম কি সেই দৃষ্টান্তে বহু ভাবে প্রতি-বিম্বিত হইতে পারেন? মৌলিক-বস্তু সাকার হইলে সে ভাবে “বহুত্বের” উপপত্তি করা বরং সম্ভব পায়? কিন্তু নিরাকার-মূল অবলম্বনে সে ভাবে “বহুত্ব” উপপত্তি করা যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষতঃ, এক বস্তু বহুরূপে প্রতিভাত হইলে তাহাদের চাক্ষুষ যদি বা সম্ভব পায়, (সীতাকাদি বিভিন্ন ধর্মের) স্পর্শ সম্ভাবনা থাকে না। অতএব জলে বা দর্পণে প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ঘট পটাদির বহুত্বের উপপত্তি করা সম্ভব নহে। এইরূপ বিচারের দ্বারা জানা যায়, কস্মিন্ কালেও বাহ্য সম্ভব হইতে পারে না, প্রতিতির বিরুদ্ধ অর্থ করতঃ তাহাই অদ্বৈতবাদিগণ সিদ্ধ করিতে চাহিয়া-ছেন। এ সকল বিচারও চিন্তনীয়।

হইল। অতএব যদি ঘট, পট, মঠ, তরু, লতা, গিম্বি, কুঞ্জ, নদী, নির্ঝর প্রভৃতি সম্পূর্ণ অলোক পদার্থ হয়, তবে ত্রকে এ সকল বিষয়ের ভ্রম হইবে কিরূপে ? অদ্বৈতবাদিগণের সকল গল্পই এইরূপ। আমরা ঘট-পট-মঠাদি দেখিতেছি, এ সকলই আমাদের ভ্রম হইতেছে। এ ভ্রম অল্পই বলিতে হইবে। কারণ, যদি তপোবলে নারদাদির মত সর্বজ্ঞ হইতে পারি, তখনই সর্বপ্রকার ভ্রমে আচ্ছন্ন হওয়া যাইবে। শিব ভূর্গা বিষ্ণু প্রভৃতি বাহাদিগকেই সর্বজ্ঞ বলা যায়, সকলেই ঐরূপ সর্বপ্রকার ভ্রমে আচ্ছন্ন। অদ্বৈতবাদিরা ‘সর্বজ্ঞ’ শব্দের উপপত্তি করেন নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু সর্বপ্রকার মোহাবৃত হইলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায় ইহা কোন্ বেদ পুরাণে লিখিত ? শুধু বেদ পুরাণে কেন, মুসলমানের কোরাণ, খ্রীষ্টানের বাইবেল, প্রভৃতি যে কোনও জাতির যে কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ অন্বেষণ কর, দেখিতে পাইবে সর্বপ্রকার মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে সর্বজ্ঞ বলে না, প্রকৃষ্টরূপ অজ্ঞকে প্রাজ্ঞ বলে না। তুমি পরিদৃশ্যমান নিখিল বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ। কিন্তু বেদ পুরাণে সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কায়েই মিথ্যাকে প্রাতিভাসিক সত্য, বাবগারিক সত্য প্রভৃতি হরেক রকম সংজ্ঞা প্রদান করিয়া বেদ পুরাণের সহিত মিলাইতে চাও। মিথ্যাকে ‘সত্য’ পরিভাষা, অগ্নিকে ‘জল’ পরিভাষা তুমি দিতে পার। কিন্তু বেদ তাহা করিবেন কেন ? এইরূপ করিয়া কি ঐতি-সম্মত বলিয়া গর্ব করা উচিত হয়। সর্পে রজ্জু বুদ্ধি হইলে তাহা ভ্রম বলিয়াই বেদ পুরাণে প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেও একটা সত্যের মধ্যে ইহা কোন্ ঐতির আদেশ ? ঐতির পনর আনা তিন পাই অগ্রাহ করিয়া, একপাই মাত্র রাখিবার জ্ঞাত এত বিবাদ কেন জানি না। বেদ পুরাণে আধ্যাত্মিক কত গল্পই আছে। কিন্তু পদার্থ উপপত্তি করিবার অগ্রে

ভূমি বেক্সপ গয় গাহিয়া লও, সেরূপ গয় কেহ কখনও শোনে নাই। আমরা ঘট পটাদি চোখে দেখিতেছি। কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত হইল যে, দেখা শুনা একটা কথার কথা মাত্র। অমনি পদার্থগুলি বুঝাইবার অল্প বক্তৃতা আরম্ভ হইল। “ব্রহ্ম চৈতন্তস্বরূপ। বিশেষ কোনও উপাধি-বশে তিনি তোমার নিকট অন্তঃকরণ রূপে প্রতিভাত। চক্ষুঃ কর্ণ পথে সেই অন্তঃকরণ বহির্গত হইয়া ঘট পট মঠাদি বিশেষ বিশেষ উপাধিতে গমন করতঃ তদাকার প্রাপ্ত হইতেছে, অমনি ভূমি বলিতেছ ‘ঘট দেখিতেছি’ ‘পট দেখিতেছি’ ‘মঠ দেখিতেছি’। তোমার অন্তঃকরণ ঘট, পট, মঠ, লাল, নীল, সবুজ, হইয়া যাইতেছে বলিয়া অসম্ভব বিবেচনা করিও না। প্রণালী-পথে জলশ্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রে গমন করিলে তাহা ক্ষেত্রাকারেই পরিণত হয়।” মানিয়া লও, তোমার অন্তঃকরণ জলশ্রোতঃ। মানিয়া লও, তোমার চক্ষুঃ কর্ণ প্রণালী-বিশেষ। তবে আর সিদ্ধান্ত অসঙ্গত রহিল কিরূপে? ঔপন্যাসিক কুহক বিস্তার করিতে হইলে এই সকল অমোঘ হেতু কার্য্যকারী বটে, কিন্তু এই সকল উপায় শ্রুতি-পরিগৃহীত নহে, দার্শনিকতা হিসাবেও ইহাদের স্থান অতি নিম্নে। সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যের দ্ব্যতির হ্রাস হয় না, লোকে তাহার মলিনতা অতুভব করে মাত্র। এ দৃষ্টান্ত ব্রহ্মে খাটিবে কেন? মেঘাবরণ নিবন্ধন সূর্য্যমণ্ডলে কি দ্ব্যতির হ্রাস হয়? বিশেষতঃ ব্রহ্ম নিরবয়ব, অবিশ্বাণ্ড নিরবয়ব। নিরবয়ব বস্তু কেহ কাহারও আবরক হয় না। দিক্ কাল আকাশ প্রত্যেকেই-বিশ্বব্যাপী। কেহ কাহারও আবরক নহে। সর্ব্বত্র বায়ু সবেও, আকাশ তাহার আবরক নহে। পুণ্ড্রের সকল অবয়বাবচ্ছেদে রূপ-রস-গন্ধ বিরাজিত। কেহ কাহারও আবরক নহে। সাবয়ব-বটিত দৃষ্টান্ত নিরবয়ব বস্তুতে খাটিবে কেন? অবিশ্বাণ্ড মোহাই দিয়া অসম্ভব

সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া, উদয়নাচাৰ্য্য প্রমুখ নৈয়ায়িক-আচাৰ্য্যগণ  
অবিজ্ঞান ধৰ্ম্মৰূপ স্বৰূপ নিৰ্ণয় কৰিয়াছেন, তাহাই অশেষণ করা উচিত।  
অপরিগ্রহাচ্ছাত্ত্বমনপেক্ষা এই সূত্রের দ্বারা ব্যাসদেবও এ  
ভাবে পদাৰ্থ-উপপত্তির অতি নিন্দা কৰিয়াছেন।

### ব্যাসসূত্রে আকাশ ।

(২য় অধ্যায় । ৩য় পাদ হইতে ।)

ন বিয়দশ্রুতেঃ । আকাশ জন্ত নহে। যেহেতু তাহার শ্রুতি  
নাই।

অস্তি তু । গোণ্যসম্ভবাৎ । শ্রুতি আছে বটে, তাহা  
গোণাধপৰ ।

শব্দাচ্চ । নিত্যবোধক শ্রুতি আছে বলিয়াই পূৰ্ব্বোক্ত নিয়ম  
করা হইল। নিত্য-বোধক শ্রুতি যথা, ‘আকাশবৎ সৰ্ব্বগতশ্চ নিত্য।’  
‘স যথানন্তোহন্নাকাশ এবমনন্ত আত্মা।’ সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দের দ্বারা  
‘যুক্তি’ এই অর্থও অধ্যাহার করা যায়। যুক্তি এই, ধ্বংস প্রাগভাব  
কল্পনে গোরব। লাঘবতঃ নিত্য-সিদ্ধি।

### ব্যাসসূত্রে জীবাত্মা ।

(২য় অধ্যায় । ৩য় পাদ হইতে ।)

নাত্মাহ শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ । জীবাত্মা কিত্যাদির মত  
সাদি নহে। কারণ শ্রুতিতে তাহার উৎপত্তি উক্ত হয় নাই। শ্রুতি-  
সমূহের দ্বারা তাহার নিত্যত্বই প্রতিপাদিত হয়।

জ্ঞোহিতএব। অত্যাধীনই জানা যায়, আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়। জ্ঞানের (ব্রহ্মের) স্বরূপ নহে। ‘অজ্ঞোহহং’ এই ব্যবহার দর্শাইয়া জীবেরে অদ্বৈতবাদিগণ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম কল্পাইয়াছেন। তাহাও এই সূত্রে ‘জ্ঞ’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্যাসদেব ছলতঃ খণ্ডন করিয়াছেন।

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং। আত্মা নিত্য এ বিষয়ের প্রমাণ এই, শরীর নষ্ট হইতেছে; কিন্তু আত্মার উৎক্রান্তি, স্বর্গগমন, মর্ত্যে আগমন প্রভৃতির ক্ষতি পরিদৃষ্ট হয়।

স্বাত্মনাচোত্তরয়োঃ। বিশ্বব্যাপি আত্মার গতি আগতি কিরূপে সম্ভবে? উত্তর এই, শরীরের গতি আগতি লইয়াই আত্মার গত্যাগতি ব্যবহার। পরকীয় ক্রিয়ায় আত্ম-ক্রিয়া ব্যবহারের প্রমাণ যথা, ‘অশ্বেন গচ্ছতি’, ‘পচামি’ ইত্যাদি। ‘স্বমেবাত্মা অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা যন্ত’ এইরূপে ‘স্বাত্মা’ এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার দ্বারাই ‘শরীর’ এই অর্থ আনিতে পারিয়াছি। এই উদ্দেশ্য প্রস্থের না হইলে ‘স্ব’ বা ‘আত্মা’ এই একটি শব্দ প্রয়োগ করিলেই চলিত। ‘উত্তরয়োঃ’ ইহার অর্থ ‘গত্যাগত্যোঃ’। পূর্বসূত্রস্থ ‘উৎক্রান্তি’ শব্দের অনাবশ্যকতা আমাদের হ্রাস অদ্বৈতবাদীরাও এই সূত্রে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

নাণুরতচ্ছতেঃ। জীব অণু নহে। যেহেতু সে ব্যবহার শোনা যায় না। অতঃপর আশঙ্কা উঠিতেছে, লোক-ব্যবহার শোনা না যাউক, ঋতিতে কখনও ‘অণু’ বলিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা, ‘এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ’ ইত্যাদি। এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্ত পরেই স্বতন্ত্র সূত্রে বলিতেছেন ইতরাধিকারাৎ। অর্থাৎ ইতরকে অধিকার করিয়া আত্মার অণুত্ব ব্যবহার। যেমন ঘটকে অধিকার করিলে ঘটাকাশ, কর্ণ-বিবরকে অধিকার করিলে ঋতি, ইত্যাদি ব্যবহার নিবন্ধন আকাশের অল্পত্ব ব্যবহার হইতে পারে, সেইরূপ অণুতর

কীটাদির শরীর অধিকার করিয়া আত্মার অণু ব্যবহার হইয়া থাকে। আত্মা অণু হইলে সৌভরি, রক্তবীজ প্রভৃতির এককালীন বহু শরীরে যুগপৎ ভোগ হইতে পারিত না। কায়বাহ-ধারণও শাস্ত্রসঙ্গত। সুতরাং আত্মাকে অণু বলিলে চলিবে না। এই ব্যাখ্যা প্রাচীন নৈয়ামিকগণের মতানুযায়িনী। অদ্বৈতবাদীরা এই সূত্র ও শ্রুতি অবলম্বন করিয়া জীবের অণুত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন। ত্রায়রত্ন-মহাশয় সে ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ অননুমোদন করেন না। কারণ তাঁহার স্বীয় অভিপ্রায় এই যে, ত্রায়শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারেও জীবের অণুত্ব সিদ্ধ করা যায়। ‘তত্ত্বসারঃ’ নামক গ্রন্থে ইতিপূর্বে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ঐ ‘তত্ত্বসারঃ’ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

জীবের ত্রায় ‘অংশের’ উল্লেখও ব্রহ্মসূত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যথা, অংশো নানা ব্যাপদেশাদন্যথা চাপি। অর্থাৎ নানা ব্রহ্মাংশের বিষয়েও নির্দেশ পাওয়া যায়। তদ্বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণাদিও আছে। ইহাতে বুঝা গেল, লক্ষণ, বলরাম, পরশুরাম, অনন্তদেব প্রভৃতি রাম-কৃষ্ণ-শিব-হর্গাদির তুল্য পূর্ণব্রহ্ম নহেন। তাঁহার অংশমাত্র। ইহঁরা আমাদের তুল্য জীব নহেন, ইহাই এই সূত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে।

দার্শনিকতাবাদিত্বমধীয়ত ইত্যেকের। কেহ কেহ বলেন যে, অবতার দশটি মাত্র, ইহা বেদাদিতে অধীত হয়। আমরা কিন্তু প্রমাণ পাইয়াছি “অবতারা হসংখ্যাঃ।” ব্যাসদেবও পূর্বসূত্রে বলিয়াছেন “অংশো নানা”। এ কারণ, এই সূত্রের উপর ব্যাসদেব নির্ভর করিলেন না। “একে” এই পদের দ্বারা ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ, ইত্যাদি ব্যাক্যেরও অর্থ এই হই সূত্রের সহিত ঐক্য করিয়া করিতে হইবে।

অতএব, ঐ বাক্যস্থ দ্বিতীয় “জীব” শব্দটির অর্থ জীবনবিশিষ্ট। অর্থ এই, “আমার সনাতন অংশ জীবলোকে গিয়া জীবনসম্বন্ধবিশিষ্ট হয়।” পূরোক্ত লক্ষণ, বলরাম, পরশুরাম প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। অদ্বৈত-বাদীরা অর্থ করিয়া থাকেন, “আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবের স্বরূপ (অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপ) হইয়া থাকে।” এরূপ তাৎপর্য্য হইলে “জীবলোকে” এই অংশটুকু না দিলেও চলিত। “আমার জীবভূত অংশ জীবলোক গঠন করে” এ মীমাংসা উক্ত বাক্য হইতে বাহির করা উচিত নহে। ঐ বাক্যটির দ্বারা অনুভব করা উচিত হয় যে, “জীবলোক” যেন প্রসিদ্ধ আছে। সেই জীবলোকে ব্রহ্মের অংশও জীবনসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদীরা এ সকলের যে ব্যাখ্যা করেন, সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কোনও ক্রমেই চলিতে পারে না। কারণ, অন্ততঃ ভগবান্ স্পষ্ট করিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন যে,

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥

অদ্বৈতবাদিকৃত পূরোক্ত ব্যাখ্যা যদি সাধু হইত, তাহাহইলে ভগবান্ এভাবেই মাত্র আবির্ভাব-তত্ত্ব ব্যক্ত না করিয়া আবির্ভাব সম্বন্ধে ইহাও বলিতেন,

পরদারোপভোগার্থং গৃহীতুং স্বং পরম্ চ ।

চিরং নরক-ভোগার্থং সন্তুভামি ক্রণে ক্রণে ॥

কল, পূরোক্ত প্রমাণ সকল অবলম্বনে জীবে ব্রহ্মে ঐক্যসাধন করা অদ্বৈতবাদিগণের কর্তব্য নহে। কারণ, সুস্পষ্ট ভেদসাধক বহুপ্রমাণ দ্বারা ব্যাখ্যা কালে আমরা দর্শাইয়াছি এবং অতএব সিদ্ধি হইতে

পারে না ইহা সপ্রমাণ করিয়াছি। ব্যাসদেবও সেই মীমাংসা করিয়াছেন, ইহা পরে বিশদরূপে প্রকাশ পাইবে। তৎসমুদয়ের সহিত ঐক্য করিয়া আমরা আমাদের মীমাংসা করিলাম।

### ব্যাসসূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় ।

( ৩য় অধ্যায় । ২য় পাদ হইতে । )

ন স্থানতোহপি পরশ্রোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি । আকার-  
সম্বন্ধ ও নিরাকার-ভাব থাকিলেও, ব্রহ্মে মায়াবস্তু ও মায়াবাহিত্য উভয়  
ধর্ম নাই, ইহাই সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয় ।

ন ভেদাদিত্যেচৎ; ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ । মায়াবস্তু ও  
মায়াবাহিত্য এই উভয় লিঙ্গ না থাকিলেও আকার ভেদ এবং  
সাকার নিরাকার ভেদ বচন করাইতে হইতেছে, তখন অভেদ থাকিতে  
পারে না, ভেদই সিদ্ধ হইতেছে, যদি এই পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হয়,  
তাহার সমাধান এই যে, ভিন্ন ভিন্ন শরীরধারী হইলেও এবং সাকার  
নিরাকার হইলেও ব্রহ্ম প্রত্যেক নহেন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নহেন ।  
কারণ কোনও রূপ ভেদবোধক বচন নাই ।

অপিচৈবমেকৈ । ভেদবোধক বচন তো নাইই, অধিকন্তু  
কোনও কোনও ঋষি ভেদদৃষ্টির স্পষ্টতঃই নিন্দা করিয়াছেন। যথা,  
“শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি । অভেদবুদ্ধ্যা বর্ত্তেত  
ভেদকুরকং ব্রজেৎ ।” “শ্রীরামভারিণী সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপা চ কালিকা ।”  
ইত্যাদি ।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ । ব্রহ্মের রূপ নাই । কারণ,  
তিনি শিব জগাদি ঘেহের অধিষ্ঠাতা মাত্র ।



প্রকাশবচ্যাবৈয়র্থ্যাৎ । ব্রহ্ম মানিবার আবশ্যক কি, একথা বলিতে পার না । সৃষ্টির পূর্বে ভূত সকল পরমাধ্যাদিরূপে অব্যক্ত থাকে । ব্রহ্মই তাহাদিগকে প্রকাশ করেন । ‘প্রকাশবৎ’ এই বাক্যের ‘প্রকাশ’ শব্দ গিজন্ত ভাবে সিদ্ধ । অর্থ ‘প্রকাশনা’ ।

আহ চ তন্মাত্রং । সৃষ্টাদিতে প্রকাশক আর কেহ ছিলেন না । শ্রুতি ইহা বলে । শ্রুতি যথা, ‘সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ’ ‘নাশ্চ কিঞ্চন মিথৎ’ ইত্যাদি ।

অতএব চোপমা সূর্য্যাদিবৎ । ব্রহ্ম যখন নিখিল বস্তু প্রকাশ করেন, তখন সূর্য্যাদির সহিত তাঁহার দৃষ্টান্ত চলে । তাৎপর্য্য এই, অন্ধকারে ভূত সকল অব্যক্ত থাকিলে সূর্য্য তাহাদিগকে প্রকাশ করেন । পরমাধ্যাদিরূপে অব্যক্ত থাকিলে ব্রহ্ম তাহা প্রকাশ করেন ; অর্থাৎ, ভূত সৃষ্টি করিয়া প্রত্যক্ষোপযোগী করেন । সুতরাং প্রকাশকতা-শক্তি দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্ত উভয়ত্রই বিদ্যমান ।

অনুবদগ্রহণাত্মন তথাত্মং । ব্রহ্ম জলাদির মত হইলে উপাধি-ভেদে বিভিন্নাকার ধারণ করিতে পারিতেন । কিন্তু সেরূপ না হওয়ায় ব্রহ্মই সকল বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতে পারেন না । এই স্বত্রেও অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন ।

ব্রহ্ম জলবৎ নহে এবং তাঁহাতে হাস বৃদ্ধিও স্বীকৃত হইল না ; ভবে “হিমালয়ে উমা বাড়িতে লাগিলেন” “তরুণবেশী শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাসলীলা করিলেন” এ সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয় কিরূপে ? এই আশঙ্কা-নিবারণার্থ ব্যাসদেব স্বত্র করিতেছেন, বৃদ্ধিহাসভাক্ত-মন্তুর্ভাবাৎ । অর্থাৎ ব্রহ্মের হাস-বৃদ্ধি-ভাগিহ শরীরান্তর্ভাবে । অতঃপর বলিতেছেন, উভয়সামঞ্জস্যাদেবৎ । সাকার নিরাকার

উভয়রূপী ব্রহ্মে এইরূপ বিচারপূর্বক সামঞ্জস্য করিয়া লইলে সর্বাংশ মির্দোষ হইবে। ‘মহাকাল ক্রোধে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিলেন’ ‘বিবসনা শ্রামা রণোন্মাদিনী হইয়া পতি-বক্ষে নৃত্য করিলেন’ ‘ঋষিশাপে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র মোহাভিভূত হইলেন’ ‘লক্ষ্মী অশোকবনে শোকাকুলা হইলেন’ ‘গোপাল নবনীর লোভে কাঁদিতে লাগিলেন’ এ সকল বাক্যের মীমাংসার জন্ত পূর্ব-পরিচ্ছেদে লোকবত্ত্ব।

কৈবল্যাৎ এই সূত্রের অনুশীলন কর। পূর্ণ ব্রহ্মকে অদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম সাজাইও না।

ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্ত এইবার উপক্রম করা হইতেছে, প্রকৃতেতাবস্ত্বং হি প্রতিষেধতি ত্রবীতি চ ভূয়ঃ। এই পরিদৃষ্টমান বস্তুসমূহ ব্রহ্ম কি না এ বিষয়ে নিষেধও আছে, উল্লেখও আছে।

তবে, ব্রহ্মের স্বরূপ কিরূপে বুঝিব, চারিটা সূত্রের দ্বারা ক্রমশঃ তাহার সমাধান করিতেছেন, তদব্যক্তমাহ হি। ব্রহ্মকে অব্যক্ত বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং। ব্রহ্মের যে তাহাই স্বরূপ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারাও ইহা আরাধনাকালে যোগীরা জানিতে পারেন। কেবল বাক্য দ্বারা স্বরূপ-নির্দেশ হয় না। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারাই যে স্বরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে তাহা এই সূত্রে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এ কারণ ‘শ্রোতব্যঃ’ এই অংশের পর ‘মন্তব্যঃ’ এই অংশ আদিষ্ট হইয়াছে। ‘শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যোভ্যাঃ’ লিখিয়া ‘মন্তব্যঃশোচাপপত্তিভিঃ’ লিখিতে হইয়াছে। ‘যন্তর্কেণাভিসঙ্কতে’ ইত্যাদি এবং ‘দৃষ্টাচারীক্ষিকীং পরাং’ ‘বিনাচারীক্ষিকীং বিদ্যাং তিষ্ঠীর্ষন্তি ভবার্ণবং’ প্রভৃতি বাক্য দ্বারাও পুনঃ পুনঃ তর্কশাস্ত্রেরই প্রামাণ্য

নির্দেশ করিতে হইয়াছে। ‘অজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষভেদে উপাসনা বিবিধ’ এই অর্থও এ সূত্রের করা যাইতে পারে। সে পক্ষে অভেদে তৃতীয়া বিভক্তি বুঝিতে হইবে।

পূর্বোক্ত দুই সূত্রের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে ব্রহ্মে ব্যক্ত সমুদয় সামগ্রীর ভেদই আছে। ব্রহ্ম সমুদয় সামগ্রীর সহিত অভিন্ন একরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়, উপক্রমে ইহা লিখিত হইয়াছে। সে বিষয়ের মীমাংসা হইল কই? এই আশয়ে বলিতেছেন, প্রকাশাদিবজ্জাতৈ-শেষ্যং। প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ। ব্রহ্ম পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহের তুল্য প্রতীয়মান হইলে আর বিশেষ-বুদ্ধি থাকিতে পার না। ব্রহ্ম পরিদৃশ্যমান বস্তুর সহিত অভিন্ন নহেন, কিন্তু তৎতুল্য প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, ইহা ‘প্রকাশাদিবৎ’ এই শব্দের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সাদৃশ্যবোধক শব্দ ভেদ-সাধক, তাহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব বুঝা যাইতেছে ব্রহ্ম কখনও ‘প্রকাশাদিবৎ’ অর্থাৎ প্রকাশমান বস্তু প্রভৃতির তুল্য হন বলিয়াই প্রকাশাদিরূপে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মের সেইরূপ ‘প্রকাশ’ সাধকের আনুষ্ঠানিক অভ্যাস নিবন্ধন হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় অংশেও বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্মের স্বরূপ উহা নহে, সাধকের চেষ্টার ফল মাত্র। কোন্ অবস্থায় ব্রহ্ম ‘প্রকাশাদিবৎ’ হন, তাহা ঐতি-সময়র কালে আমরা বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি।

অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গং। অভ্যাসের দ্বারা কখনও এই অবস্থা হয় বলিয়াই অনন্তরূপে তাহার নির্দেশ করা হয়। উপক্রমে কহিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মে ভেদ অভেদ বিবিধ ব্যবহার আছে। কোনটী স্বরূপ, কোনটী আরোপ, তাহা এক্ষণে প্রতিপাদন করা হইয়া গেল। অতএব কোন্ ঐতি স্বরূপ-বোধক, কোন্ ঐতি অবস্থা-

বিশেষের পরিচায়ক, সুধীষণ যেন বাসসূত্র অমুসারে তাহা বিচার করিয়া লন ।

ব্রহ্ম নিখিল বস্তুর স্বরূপ নহে সত্য, কিন্তু সাকার নিরাকার উভয়রূপে ব্রহ্মের নির্দেশ আছে । ব্রহ্ম কি তবে ভিন্ন ভিন্ন ? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন, উভয়ব্যাপদেশাদহিকুণ্ডলবৎ । অর্থাৎ সাকার নিরাকার উভয় নির্দেশ থাকিলেও ভেদ সিদ্ধ হয় না । অহি কুণ্ডল পাকাইয়া পরিচ্ছিন্ন ভাবেই থাক্, আর তৎপরিবর্তে বিসৃত ভাবেই থাক্, তাহা সেই এক অহি ভিন্ন আর কিছু নহে ।

অগ্নি দৃষ্টান্তও দিতেছেন, প্রকাশপ্রায়বদ্বাতেজস্বাৎ । দীপ্তিও তেজঃ, তদাধার দীপশিখাও তেজঃ । তেজঃ ভিন্ন ইহারা অগ্নি কিছুই নহে । সাকার নিরাকার ব্রহ্মও তদ্রূপ ।

এই সকল দৃষ্টান্তে পরিতোষ না হওয়ায় পূর্ব পূর্ব সূত্র স্মরণ করা-ইবার অভিলাষে লিখিতেছেন, পূর্ববদ্বা । অর্থাৎ “ন ভেদাদিতি চেৎ, ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ” “অপিচৈবমেকৈ” ইত্যাদি পূর্ব পূর্ব সূত্র স্মরণ কর ।





## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

বাসস্থত্রে ‘এষোহণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং’ এই শ্রুতিয়  
পূৰ্বাপর ব্যাখ্যা এবং লয়ের ক্রম । বাসস্থত্রে পর-  
মাণু । দ্বাণুক, পরমাণু সংস্থাপনের দার্শনিক  
তর্ককোশল । বাসস্থত্রে মুক্তজীব ।  
জীবে ও ব্রহ্মে ভেদসাধক বিবিধ  
প্রমাণ ও দার্শনিক  
তর্ককোশল ।

বাসস্থত্রে লয়ের ক্রম-বর্ণন ।

( ৩র্থ অধ্যায় । ২য় পাদ হইতে । )

বাগ্নানসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ । মনঃ বিদ্যমান থাকিতে বাক্য  
ভয় হয়, এইরূপ দেখা যায় এবং শ্রুতিও আছে । শ্রুতি যথা, ‘বাগ্নানসি’ ।

অতএব সৰ্ব্বাণ্যনু । অপরাপর ইন্দ্রিয়ও বাগ্নিভ্রিয়েরই অনু-  
সরণ করে ইহাও বুঝিতে হইবে ।

তন্ময়ঃ প্রাণ উত্তরাৎ । তৎপশ্চাৎ প্রাণ বিদ্যমানে মনোবৃত্তি  
লীন হয়, উত্তরোত্তর পর্যালোচনা করিলে ইহা জানা যায় । শ্রুতি  
যথা ‘মনঃপ্রাণে’ । এই ‘মনঃ’ শব্দ লাক্ষণিক ইহা দৈত-অদৈত উভয়  
বাদীরই সম্ভব । কারণ অদৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন ‘মনঃ’ তৈজস

পদার্থ। কিন্তু এই সূত্রস্থ ‘মনঃ’ তাহা নহে। যেহেতু ঋতিতে অগ্নেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ‘অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ’ ।

সৌহৃদ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ । প্রাণ তদীয় অধ্যক্ষ বিद्यমান থাকিতেই নীল হয়। সৃষ্টি-প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, অগ্নের (ক্ষিতির) অধ্যক্ষ জল। জলের অধ্যক্ষ তেজঃ। অতএব এই সূত্রে বুঝা গেল তেজঃ বিদ্যমান থাকিতে প্রাণ লয় প্রাপ্ত হয়। ঋতিও বলিতেছেন ‘প্রাণন্তেজসি’। ‘প্রাণ’ শব্দে এ স্থানে বায়ু বিশেষ বুঝিতে হইবে না। যেহেতু ঋতিতে অগ্নেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ‘আপোময়ঃ প্রাণঃ’ ।

ভূতেশ্বতঃ শ্রুতেঃ । পরবর্তী লয় ভূতেই হইয়া থাকে। সে সময় অস্ত্র কোনও জন্তু দ্রব্য বিদ্যমান থাকে না ইহাই এই সূত্রের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে তাহাদেরও নাশ লিখিত হইত। পরবর্তী লয় এই বাক্যের দ্বারা তেজোলের বুঝিতে হইবে। ভূত এই শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম ভূত অর্থাৎ পরমাণু বুঝিতে হইবে। ‘তেজঃ পরশ্রাং দেবতায়াং’ এই ঋতিরও ব্যাখ্যা করিবার সময় বুঝাইয়া দিয়াছি, তেজঃ তদীয় পরমাণুতেই পর্যাবসিত হয়। ‘পরদেবতা’ শব্দে ব্রহ্ম নহে, উহা পারিত্যগিকমাত্র। নচেৎ ‘স য এষোহগ্নিমা’ এই অংশ দেওয়া চলিত না। এ বিষয়েরও বিচার ঋতি-সময় কালে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাসসূত্রেও ‘ভূতেশ্বতঃ শ্রুতেঃ’ থাকায় তেজো-লয় যে ব্রহ্মে নহে ইহা আরো স্পষ্টতররূপে জানা যাইতেছে। ‘ভূত’ শব্দে ভৌতিক-পরমাণু ধরা যাইতে পারে।

ক্ষিতি, জল প্রভৃতি কোন্ কোন্ সামগ্রী অগ্নে, কোন্ কোন্ সামগ্রী পশ্চাৎ লয় প্রাপ্ত হয় তাহাই প্রদর্শন করান, এই সকল সূত্রের উদ্দেশ্য। তাহারাও পরমাণুতেই পর্যাবসিত হয় বুঝিতে হইবে। ‘ভূতেশ্বতঃ শ্রুতেঃ’ এই সূত্রের ‘ভূত’ শব্দের অর্থ তৈজস-পরমাণু। সৃষ্টি

সকল ভৃত্যই কি এই তৈজস পরমাণুতেই লীন হয় ? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলা হইতেছে নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি । শ্রুতি ও প্রমাণ উভয়ই প্রতিপন্ন করিয়া থাকে যে, এক জাতীয় ভৌতিক পরমাণুতে সকল প্রকার ভৌতিক জন্তু-পদার্থ লীন হয় না । অবৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, এক ব্রহ্মেই সকল বস্তুর লয় । ইহা তাঁহাদের অতি ভ্রান্তি । যেহেতু বাস এই হুত্রে স্পষ্টই বলিলেন “নৈকস্মিন্ ।” বহুপরমাণুতে পর্যাবসিত হয় ইহাও “ভূতেশু” এই বহুবচনাস্ত শব্দের দ্বারা পূর্বহুত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাণু স্পষ্ট ভাবেই স্বীকৃত হইল । কিন্তু, আশঙ্কা উঠিতেছে, ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব কল্পাই কেন ? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বাসদেব বলিতেছেন, সূক্ষ্মং প্রমাণতস্তথোপলব্ধেঃ । সূক্ষ্ম পদার্থ বিজ্ঞান, অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা এ বিষয়ের উপলব্ধি হয় । সেই প্রমাণ প্রদর্শন করাইতে হইলে, প্রথমতঃ ত্রসরেণুর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত চরম সূক্ষ্ম সামগ্রীর জন্তুত্বানুমান আবশ্যক । তাহার আকার এই,—ত্রসরেণবো জন্তাঃ সাবয়বদ্রব্যাত্মাঃ । তর্ক যথা,—ত্রসরেণবো যদি নিরবয়ব দ্রব্যানি স্যাঃ তদা বাহেল্লিয়-জন্তু প্রত্যক্ষ-বিষয়া ন স্যাঃ । দৃষ্টান্ত—আকাশ, জীবাশ্মা, পরমাশ্মা । ত্রসরেণুর অবয়বের জন্তুত্ব-নির্ণায়ক তর্ক; যথা—ত্রসরেণবো যদি নিত্যমাত্রসম-বেত্তা নিত্যমাত্রোপাদেয়া বা স্যাঃ, তদা শ্রবণানুবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহা ন স্যাঃ । দৃষ্টান্ত—শব্দ, আশ্মবিশেষগুণ । এইরূপে দ্ব্যণ্ডকের জন্তুত্ব সিদ্ধ হওয়ার, তাহার উপাদানকে লাঘবভঃ ‘নিত্য’ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । ধ্বংস প্রাগভাব কল্পাইলে সেই ধ্বংস প্রাগভাবের অনবস্থা দোষ ঘটিয়া যায় । পূর্বোক্ত প্রমাণগুলির দ্বারা যে নিত্য বস্তু সংস্থাপিত হইল তাহা ব্রহ্ম নহে । এ বিষয়ের তর্ক ‘কৃত্বং প্রসক্তি-

নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা' এই সূত্রে ব্যাসদেবই প্রদর্শন করাইয়াছেন ।  
এই সূত্র পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

নোপমর্দেনাতঃ । অজ্ঞ-সামগ্রীর ধ্বংসনিবন্ধন হৃদয়সামগ্রীর  
ধ্বংস হয় না ।

অশ্বেষ চোপপত্তেরেষ উদ্ভা । তৈজস হৃদয় পদার্থই এই  
অজ্ঞ জগতের উপপত্তি করিয়া থাকে । এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা,  
'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং ।' 'ঐতদাত্ম্যঃ' এই শব্দের অর্থ 'তৈজস-পরমাণু  
জন্মঃ' এ বিষয় শ্রুতি-স্মিমাংসা-কালে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।

যে হৃদয় ভূতকে আমরা পরমাণু বলিয়া নির্দেশ করিলাম, অদ্বৈত-  
বাদীরা তাহাকে পরমাণু বলেন না । তাঁহারা বলেন উহার নাশ  
আছে । নোপমর্দেনাতঃ এই সকল সূত্রের অর্থ-সঙ্কোচ করিয়া  
তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন । তাঁহারা বলেন, জীব যতদিন মুক্ত না হইয়া  
শরীরান্তর পরিগ্রহ করেন, ততদিন স্থল-শরীরের ধ্বংসে পঞ্চ-  
ভূতাত্মক-হৃদয়শরীরের ধ্বংস হয় না । এই হৃদয়শরীর অনাদি হইলেও  
প্রলয়ে তাহার নাশ আছে ইহাই তাঁহাদের মত । তাঁহাদের ভ্রম  
নিবারণার্থ ব্যাসদেব বলিতেছেন তানি পরে তথা হ্যাহ । হৃদয়-  
সমূহ পরে অর্থাৎ প্রলয়েও সেইরূপই থাকিবে শাস্ত্র ইহা বলিয়া  
থাকে । অদ্বৈতবাদীরা এই সূত্রের অর্থ স্বতন্ত্র ভাবে করিয়া থাকেন ।  
তাঁহাদের অর্থ এই 'হৃদয়সমূহ পরমব্রহ্মে লীন হয়, শাস্ত্র এইরূপ বলিয়া  
থাকে ।' 'তথা' শব্দের অর্থ 'লীন' এরূপ হইতে পারে না । যেহেতু  
পূর্বে লয়ের কথা উল্লেখ নাই । 'হৃদয় ধ্বংস হয় না' এইরূপই বরং  
পূর্বে লিখিত হইয়াছে । 'তথা' শব্দের দ্বারা তদ্রূপই অর্থ করা উচিত ।  
'হৃদয়' পরমব্রহ্মে লীন হয় এ বিষয়ে বিশেষ কোনও শ্রুতি অদ্বৈতবাদী  
দ্বিতে পারেন নাই । বাহ্য দিয়াছেন, সে শ্রুতির মধ্যে কিরূপ গুঢ়



রহস্ত বিদ্যমান, তাহা শ্রুতিসময়কালে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে । অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত যে ভ্রমপূর্ণ তদ্বিকল্পে অহুমানও আছে । সেই অহুমানের আকার এই,

সূক্ষ্মপদার্থঃ নাশপ্রতিযোগী, অনাদি ভাবত্বাৎ ।

অদ্বৈতবাদীগণ ইহার বিরোধি অহুমান করিতে পারেন । সে অহুমানের আকার এই,

সূক্ষ্মপদার্থঃ নাশপ্রতিযোগী, ব্রহ্মভিন্নত্বাৎ ।

আমরা পূর্বে যে নিয়ম প্রদর্শন করাইয়াছি তদ্বারা পরীক্ষা করিলে দার্শনিকগণ বুঝিতে পারিবেন অদ্বৈতপক্ষীয় অহুমানটির প্রামাণ্য নাই । দ্বৈতপক্ষীয় অহুমানটিরও প্রামাণ্য নাই, এ কথা যেন কেহ না বলেন । যেহেতু দ্বৈতপক্ষে তর্ক আছে । বাধক না থাকিলে সে বস্তুকে নিত্য বলাই উচিত, যেহেতু অনন্ত ধ্বংস প্রাগভাবাদি কল্পাইতে হয় না । এজন্ত অনাদি-ভাব মাঝেই নিত্য, ইহা নৈয়ায়িক আচার্য্য-গণের মধ্যে অনেকেই সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন । দ্বৈতপক্ষে তর্ক থাকায় দ্বৈতপক্ষীয় অহুমানই সূচ্য । এ বিষয়ের বিশেষ বিচার মূল-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । ফলে, পরমাণু যে নিত্য দ্রব্য ইহা ব্রহ্মসূত্রের পরমাণু সংস্থাপন কালে এবং পূর্বে পরিচ্ছেদে শ্রুতিসময়কালে আমরা বিশেষ-রূপে বুঝাইয়া দিয়াছি ।

এক্ষণে আশঙ্কা উঠিতে পারে, যদি পরমাণু স্বীকার করা হইল, তবে মহাপ্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি হইবে না কেন ? সেই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ উক্ত হইয়াছে, অবিভাগোবচনাৎ । অর্থাৎ পরমাণু থাকিলেও সে সময় ক্রিয়া থাকে না, এ বিষয়ে মহাজন-পরম্পরার বাক্য আছে । মহাপ্রলয় যে, “জন্ত ভাবানধিকরণ কালই” এ অংশে

অদ্বৈতবাদীরও বিবাদ-সম্ভাবনা নাই। এই সূত্রস্থ “বিভাগঃ” শব্দটি অপাদান-বাচ্যে সিদ্ধ। এ কারণ, ( বিভজ্যতে যদ্বাৎ, অর্থাৎ ) ‘বাহা হইতে বিভাগ হয় সেই বস্তু এই শব্দের দ্বারা লক্ষ্য হইতেছে। “আদৌ ক্রিয়া ক্রিয়াতো বিভাগঃ” ইত্যাদি ত্রায়শাস্ত্র-সিদ্ধ প্রমাণ দৃষ্টে জানা যায় যে, ক্রিয়া হইতেই বিভাগোৎপত্তি। অতএব পূর্বোক্ত অর্থ অসঙ্গত নহে।

ব্যাসসূত্রে ‘আনন্দ’ শব্দের মীমাংসা ।

( ১ম অধ্যায় । ১ম পাদ হইতে । )

আনন্দময়োহি ভ্যাসাৎ । ব্রহ্ম আনন্দময়, এ বিষয় পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে।

অনেক স্থলে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। যথা মৃত্তিকাময়ো ঘটঃ। ব্রহ্মকে কি আনন্দের বিকার বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে? যদি তাহা হয় তবে ‘নিত্য’ হন কিরূপে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ সূত্র করা হইয়াছে, বিকারশব্দান্মৈতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ। ‘আনন্দময়’ শব্দটি বিকারবোধক, সূত্রবাৎ ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইতে পারে না, এই পূর্ব-পক্ষ করিও না। প্রাচুর্য্যার্থে পূর্বোক্ত ‘ময়ট্’ প্রত্যয় সিদ্ধ। যথা অন্ন-ময়ো যজ্ঞঃ।

ব্রহ্ম প্রচুর আনন্দের স্বরূপ ইহাই কি তবে বুঝিতে হইবে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ ব্যাসদেব সূত্র করিতেছেন, তদ্বৈত-ব্যপদেশাচ্চ। ব্রহ্ম প্রচুর আনন্দের হেতু বলিয়া নির্দেশ আছে। তিনি প্রচুর আনন্দের স্বরূপ নহেন। ‘নিত্যঃ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম’ এই বাক্যের ব্যাখ্যা কালে আমরা পূর্বে বুঝাইয়া দিয়াছি, ব্রহ্মে বত

‘আনন্দ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সে স্থলি গিজন্ত করিয়া তত্বের কৃৎ-প্রত্যয় করতঃ সিদ্ধ। এক্ষণে অভিজ্ঞগণ বুঝিতেছেন, আয়ত্ত্ব মহাশয় যাহা বলিয়াছেন ব্যাসদেবও তাহাই বলিলেন। শ্রুতিও তাহাই আছে। যথা, ‘এষ হেবানন্দয়তি।’

সুখ নিশার ধর্ম নহে। জীবের ধর্ম। কিন্তু নিশা যদি প্রচুর ভাবে তাহা জন্মাইতে পারে, তবে ‘সুখ-নিশা’ ‘সুখময়ী নিশা’ এরূপ প্রয়োগ হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ঠিক ঐ নিয়ম। আনন্দ জীবের ধর্ম। ব্রহ্মের ধর্ম নহে। ব্রহ্ম প্রচুর ভাবে তাহার জনক হন বলিয়া ‘আনন্দো ব্রহ্ম’ ‘আনন্দময়ং ব্রহ্ম’ এই সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত, সুখ ‘জ্ঞাত’ পদার্থ, ইহা ‘ধর্ম্মাৎ সুখং’ ইত্যাদি শ্রুতি বলে জানা যায়। ‘ধর্ম্মাৎ সুখং’ এই শ্রুতির ব্যাখ্যা অদ্বৈতবাদীরা করেন ‘ধর্ম্মাৎ জীব-সুখং।’ এরূপ অর্থ করিলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইল এবং কার্যাকারণ-ভাবে গোরব দাঁড়াইল। ‘আনন্দ’ বা ‘আনন্দময়’ শব্দের ‘আনন্দজনক’ অর্থ দ্বৈতবাদিগণকেও করিতে হইতেছে বটে কিন্তু ঐ অর্থ লাক্ষণিক নহে। আগ্র-বাক্য ও সূত্র-নিষ্পন্ন হওয়ায় উহা শকার্থ। অতএব দ্বৈতব্যাখ্যায়ই স্বরস অধিক। শ্রুতি-সমগ্র কালে এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত বিচার করা হইয়াছে।

ব্যাসসূত্রে মুক্তজীব-বর্ণন।

(৪র্থ অধ্যায়। ৪র্থ পাদ হইতে।)

সম্পাদ্যবিভাবঃ স্মেন শব্দাৎ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মসাক্ষ্যকার হইলে জীব নিজরূপে অধিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ শরীরাদি কোনও রূপ উপাধি-বিশিষ্ট আর থাকেন না। শ্রুতি যথা, “পরং জ্যোতিরূপসম্পাদ্য স্মেনরূপেণাভিসম্পদ্যতে।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ । প্রতিজ্ঞা বাক্যে বলা হইয়াছে ঐরূপ হইলে জীব মুক্ত হয় ।

আত্মাপ্রকরণাৎ । পূর্বোক্ত শ্রুতিস্থ জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ ‘আত্মা’ ।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ । জ্যোতিঃ ও আত্মা একপার্থ্যক ইহা দেখা গিয়াছে । যথা, ‘পুরুষঃ মহাস্তমাদিত্যবর্ণঃ তমসঃ পরস্তাৎ ।’ ‘জীবাশ্বানাং দীপকলিকাকারঃ’ ইত্যাদি ।

চতুর্বিধ মুক্তির মধ্যে যাহা ‘নির্কারণ’ মুক্তি, তাহারই বিষয় এ স্থলে লিখিত হইল । আরও কয়েক প্রকার মুক্তি এবং কয়েক জন মহর্ষির সিদ্ধান্ত ব্যাসমুত্রে কথিত হইয়াছে ।

মুক্তি-বিষয়ক শ্রুতিগুলির অর্থ আমরাও যাহা করিলাম, শারীরক-ভাষ্য ভামতী প্রভৃতি দৃষ্টে জানা যায়, অদ্বৈতবাদীরাও সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । তবে প্রভেদ এই, ‘স্বেন রূপেণাভিসম্পত্ততে’ এই শ্রুতির অর্থ অদ্বৈতবাদীরা করিয়া থাকেন ‘ব্রহ্মরূপেণাভিসম্পত্ততে’ । আমরা তাহা করি নাই । আমরা পূর্বেরই প্রতিপাদন করিয়াছি ‘মম সাধর্ম্যমাগতাঃ’ ‘পরমং সাম্যমুপৈতি’ ইত্যাদি শ্রুতিই মুক্ত-জীবের স্বরূপ-নির্দেশক, অন্ত শ্রুতি লাক্ষণিক । অতএব ঐ সকল শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় মুক্তজীব ব্রহ্মতুল্য হন, কিন্তু ব্রহ্ম হন না । এই সাদৃশ্য কিম্বিধায় তাহাও সবিশেষ প্রমাণীকৃত হইয়াছে । ‘অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যজ্যোত্বাঃ শরীরিণঃ । অনা-শিনোহপ্রমেয়শ্চ তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারতা ।’ এই ভগবদ্-বাক্যে জানা যায়, জীব ও ব্রহ্মে পার্থক্য ব্যবহারিক নহে । কারণ উপাধি-অভিপ্রায়ে ঐ বাক্য উক্ত হইলে, দেহ দেহী উভয়কেই ‘অস্তবস্ত’ বলা হইত । আর ধর্ম্মি-তাৎপর্য্যে ঐ বাক্য উক্ত হইলে উভয়কেই ‘নিত্য’

যদি উচিত ছিল। এ বিচারও পূর্বে বিশদ-ভাবে করা হইয়াছে।  
 ঐ ভগবদ্‌বাক্যটিতে দেহীকে লক্ষ্য করিয়া ‘নিত্যন্ত’ ‘অনাশিনঃ’  
 এই উভয় বিশেষণ যখন প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন ‘জীব’ ও  
 ‘জীবত্ব’ উভয়েরই অনাশিষ্য সিদ্ধ হইতেছে। নচেৎ ‘অনাশিনঃ’  
 এই বিশেষণটি দ্বিবার আবশ্যক ছিল না। নাস্তি নাশো যন্ত তৎ  
 অনাশঃ। ‘অনাশঃ বিজ্ঞতেহন্ত’ এই অর্থে ‘অনাশী’ সিদ্ধ। অত-  
 এব “জীব-পদার্থতাবচ্ছেদকঃ” যে অবিনশ্বর তাহাও উক্ত বাক্যেই  
 সপ্রমাণ হইতেছে। ‘অনাশস্তাপ্রমেরন্ত’ এইরূপ উল্লেখ না করিয়া  
 যখন ‘অনাশিনোহপ্রমেরন্ত’ উল্লেখ রহিয়াছে, তখন দ্বৈতশব্দীর  
 ব্যাখ্যায় স্বরসই দাঁড়াইয়াছে। ‘অব্যয়’ এই কথাটির দ্বারা যদি ইষ্ট  
 সিদ্ধি হয়, তবে অব্যয়ী এরূপ প্রয়োগ করা যুক্তিবৃত্ত নহে। ফলে,  
 ঐরূপ প্রয়োগের স্থলে যদি সদ্ব্যখ্যা না করা যায়, তবে অগত্যা  
 কোনও রূপে ব্যাখ্যা করিতে হয়। কিন্তু যদি উপায় থাকে, তবে  
 সর্বাংশের সার্থক্য দেখান উচিত। সে বাহ্যহউক, ভগবদ্‌বাক্যে  
 ‘নিত্যন্ত’ ‘অনাশিনঃ’ এই দ্বিবিধ প্রয়োগে দ্বিরুক্তি-দোষ পরিহারার্থ  
 লক্ষণা করা অপেক্ষা, যথাক্রম অর্থ আমরা যাহা করিলাম, তাহাই গ্রাহ্য  
 করা কর্তব্য নহে কি? জীব অণুস্বরূপ নহেন, কিন্তু সীমারহিত অর্থাৎ  
 বিশ্বব্যাপী। ‘অপ্রমেরন্ত’ এই বিশেষণের দ্বারা এ বিষয় স্পষ্টই জ্ঞাত  
 হওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদীরা নিশ্চয়ই বলিবেন, গীতার পূর্বোক্ত বাক্যসমূহের  
 লক্ষণা না করিলে, স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। তাহার স্বরূপ-  
 নির্দেশক বাক্যগুলির লক্ষণা করিয়া প্রকৃত লাক্ষণিক বাক্যকে  
 স্বরূপ-নির্দেশক বলিয়া অবধারণ করেন। এ ক্ষেত্রে গোলযোগ  
 ঘোচে কিরূপে? এই প্রশ্ন নিরাকরণার্থ ব্যাসদেব সূত্র করিতেছেন,

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানৈঃ । প্রত্যক্ষ এবং অনুমান নামক  
দ্বিবিধ উপায় এই সকল বস্তুর স্বরূপ এইরূপই প্রদর্শন করাইয়া  
থাকে । সর্বত্র হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এবং তৎসহ নিখিল বস্তুর তৎ-  
সাক্ষাৎকার হয়, এবং তৎপরে পৃথক্ ভাবেও জীব-সাক্ষাৎকার হয়,  
ইহা শ্রুতিসমবয় কালে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।  
প্রত্যক্ষ অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ ঐ সময়ই লোকে  
জানিতে পারে । অতএব প্রত্যক্ষের দ্বারা সকল বস্তুর নির্ধারণ করা  
সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে । এ কারণ, সাধারণের জন্য ‘অনুমান’  
নামক অন্তবিধ উপায় আদিষ্ট হইয়াছে । সে উপায়ে জানা যায়,  
অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত শ্রুত্যর্থ অশুদ্ধ এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত  
ভ্রমজনক, অর্থাৎ জীব উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম নহেন । অনুমানের  
আকার যথা,

জীবত্বং অবিনাশি, অনাদিভাবত্বাৎ ।

অবশ্য ইহার বিরোধি অনুমানও আছে । এ কারণ, তর্কের দ্বারা অনু-  
মানের প্রামাণ্য নির্ধারণ করিতে হইবে । অনাদি-ভাবকে অবিনশী  
বলিলে কতদূর লাঘব আছে, তাহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে । অত-  
এব তর্ক বশতঃ দ্বৈতপক্ষীয় অনুমানেরই প্রামাণ্য, বিরোধি অনুমানের  
প্রামাণ্য নাই বুঝিতে হইবে । জীব উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম নহেন,  
এ বিষয়ে আরো তর্ক যথা,

জীবপদার্থতাবচ্ছেদকং যদি স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠভেদব্যবহার-  
প্রযোজকং স্যাৎ, তদা ব্রাহ্মপ্রলয়বৃত্তিনাশপ্রতিযোগি  
স্যাৎ ।

এই তর্কের আরো কতিপয় প্রকার-ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

জীবপদার্থতাবচ্ছেদকং যদি স্বাবচ্ছিন্নশক্তিমৎপদ-  
প্রতিপাদ্যস্বাশ্রয়নিষ্ঠভেদব্যবহারপ্রযোজকং স্যাৎ,  
তদা ব্রাহ্মপ্রলয়বৃত্তিনাশপ্রতিযোগি স্যাৎ ।

উদাহরণ যথা, কর্ণত্ব, দিগ্‌নিষ্ঠ পূর্বত্ব পশ্চিমত্ব, মহাকালনিষ্ঠ ক্ষণত্ব  
দিনত্ব মাসত্ব বর্ষত্বাদি। কর্ণত্বের আশ্রয় কর্ণ অর্থাৎ গগন। সেই গগন  
‘কর্ণত্বাবচ্ছিন্নশক্তিমৎপদপ্রতিপাত্ত্ব’ বটে। আবার গগন-নিষ্ঠ ভেদ-  
ব্যবহারের প্রযোজকও কর্ণত্ব। তাহার কারণ এই, “তৎকর্ণ এতৎ-  
কর্ণত্বান্ ন” এইরূপ ভেদ-ব্যবহার করা যাইতেছে। যেহেতু ‘কর্ণ-  
বিবরাবচ্ছিন্নত্ব-বিশিষ্ট’ গগনত্বের নাম কর্ণত্ব, সেইহেতু ঋগুপ্রলয়  
অর্থাৎ ব্রাহ্মপ্রলয় প্রভৃতিতে তাহার নাশ আছে। সকল দৃষ্টান্তগুলি এই  
ভাবে লাগাইয়া লইতে হইবে। যদি উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মত্বের নাম  
‘জীবত্ব’ হয়, তবে জীবত্বেরও সেই দশা। অব্যভিচারী নিয়মের  
অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, ঋগুপ্রলয়েই সকল জীব মুক্ত হইতে পারেন। অর্থাৎ  
তৎপরে জীব আর বিद्यমান থাকিতে পারেন না।





## উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

ভ্রায়রত্ন মহাশয়ের সম্প্রদায় কর্তৃক সুধীসমাজে নিবেদন ।  
 স্বাধীন দার্শনিকগণের সহিত ভ্রায়রত্ন মহাশয়ের প্রভেদ  
 ও অদ্বৈতমত খণ্ডনের পবিত্র উদ্দেশ্য বর্ণন । ধর্ম-  
 শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানের মীমাংসাকালে ভ্রায়রত্ন  
 মহাশয়ের সতর্কতা । দার্শনিকতা ও  
 ধার্মিকতার পার্থক্য । ধর্মজীবন  
 গঠন পক্ষে সার উপদেশ ।

প্রায় দেখা যায়, অশাস্ত্রজ্ঞেরাও ঐতিসাহক দেখাইয়া আত্মমত্ত  
 গুটি করিতে চাহেন । তাহা বৈধ নহে । সরল প্রাণে যেক্রপ বুঝ  
 যায়, সেইরূপ একটা ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যাখ্যাকে কথঞ্চিৎ কাব্য-  
 ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে । শাস্ত্রব্যাখ্যা, সকল স্থলে সে নিয়মে হই-  
 না । শাস্ত্রে আছে,

মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেদন্যযোনিষু ।

বল দেখি, সরল ভাবে ইহার বিরূপ অর্থ আসিতেছে ? ঐতি-  
 রহিয়াছে,

অতিরাত্রো ষোড়শীং গৃহাতি নাতিরাত্রো ।



শ্রুতি রহিয়াছে,

উদিতেন্জুহোত্যনুদিতেন্জুহোতি ।

বল দেখি, শাস্ত্র বাক্য পাইবামাত্র কাব্যের ভ্রায় অর্থ করিতে যাওয়া সম্ভব কি না? অতএব শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে পূর্বাঙ্গের মীমাংসা-প্রণালী দৃষ্টি করিতে হয়। এক বিচারের একাংশ স্থূল ভাবে বুঝিয়া অপর্যাংশে অগ্রসর হইতে নাই। কোনও স্থান দুর্য্যোধ হইলে, উপযুক্ত গুরুসাহায্যে অথবা অন্তঃ কোনও উপায়ে মীমাংসকের তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়। ধৈর্য্য-চূড়তি হইলে চিত্তের অগ্রসরতা সম্পাদন করিয়া পরে আবার আলোচনা করিতে হয়। শাস্ত্রবাক্য দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তৎপরে বিবেচনা করা কর্তব্য। এই ভাবে শাস্ত্রবাক্য ব্যবহারে অধিকারী হইয়া যদি ভ্রায়রত্ন মহাশয়ের কৃত বৈতব্যাখ্যায় দোষোদ্ভাবন করতঃ কোনও প্রকৃত অভিজ্ঞ ব্যক্তি মীমাংসিত-প্রমাণগুলির অবৈতব্যাখ্যা প্রদর্শন করান, কেবল তাহাই আমরা শ্রদ্ধা সহ দৃষ্টি করিব। এই প্রসঙ্গে ভ্রায়রত্ন মহাশয়ের স্বরচিত একটি শ্লোক বিনীত ভাবে নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অদ্বৈবাদ্ দৃশ্যতামেষ নীতিজ্ঞৈঃ স্বপ্রণীতবৎ ।

ঐদৃগ্ দৃষ্টেহ দোষশ্চেৎ স মে শিরসি নৃত্যতু ॥

দর্শনিক-জগতের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, অনেক দেশে অনেক দার্শনিক স্বীয় অভিনব দার্শনিক-মত প্রকাশ করিয়া স্বদেশে মানি-ভাজন হইরাছিলেন। তথাপি নিজ সিদ্ধান্ত গোপন করেন নাই। ভ্রায়রত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সেরূপ এক অভিনব সিদ্ধান্ত নহে। বাহা দার্শনিকগণের শীর্ষস্থানীয় গৌতম-কণাদাদির মত, তাহাই তাঁহার

মত। ঐ অবিভীষ দার্শনিকগণের মতের সুব্যাখ্যায় অসীম নৈপুণ্য দেখাইয়া জায়রত্ন মহাশয় দার্শনিকগণের মধ্যে আমাদের চক্ষে ধস্ত হইয়াছেন। আর শ্রুতিসমূহের সদ্ব্যাখ্যা করন্তঃ তদর্থ লোক-জন্মে সম্যক্ সন্নিবেশিত করিয়া, এবং ব্যাসহুজাদি লইয়া বাহাতে যথেষ্ট ভাবে মীমাংসা না হয় তদ্বিষয়ে যত্ন দেখাইয়া, আমাদের চক্ষে বিশেষ গৌরবের দার্শনিক হইয়াছেন ও জগতের নিতান্ত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন গ্রন্থের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বুঝাইতে যাইয়া তিনি নিজেই যে কয়েকটা কারিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,

ইতঃ শ্রাত্ত্বকবিদ্যায়ামনুরাগবিবৰ্দ্ধনং ।

অদ্বৈতবাদিগৰ্ব্বস্য ভবেদেতেন মর্দনং ॥

ইতো ব্রহ্মাণি সাকারে পরা ভক্তিরূপদেহ্যতি ।

শিবাди-পঞ্চদেবেষু ভেদবুদ্ধির্বিনষ্টক্যতি ॥

ব্যামোহ-হীনং ব্রহ্মৈব বিষ্ণুশক্তিীশ-বিগ্রহং ।

জগ্রাহ, সংগ্রহাদস্মাদবেষ্যন্তীদমাস্তিকাঃ ॥

মহামোহসমূহস্য প্রাপ্ত্যা চির-তপস্তয়া ।

ভ্রান্তিঃ সৰ্ব্বত্র যুক্তানামুশ্নতোক্তিরিহং ন কিং ॥

অদ্বৈতবাদরসিকস্তাস্থা নাস্তত্র কিস্ততঃ ।

জলৌকসামনাস্বাদাদ্ রসালং কিং ঘৃণাম্পদং ॥

রচনেয়ং নবত্বেন ন দ্বেষ্যা দূরদর্শিভিঃ ।

পুরা পরকৃতগ্রন্থঃ কদাপ্যাসীমবো ন কিং ॥

নবৈষা রচনা বাচাং প্রাচ্যামাচারবোধিকা ।

সন্তঃ সন্তোষবন্তস্তং সন্ত নৈনাং দ্বিসন্ত বা ॥

ঘুক্তি-তর্ক-সিদ্ধ পদার্থসমূহের অপলাপ করতঃ অসঙ্গত ভাবে পদার্থ  
কল্পনা করিয়া তৎপক্ষে প্রতিসমর্থন করতঃ কোনও রস তুলিতে চেষ্টা  
করিলে সে রস অলীক মাত্র, তাহা নিম্ন-লিখিত কবিতায় শ্রায়রত্ন  
মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন,

বেদান্তবাক্কণমথাপ্যনুমানলেশ-

মদ্বৈতবাক্কবলদং ন বিলোকয়ামঃ ।

তস্মাত্তথাপি রসরাশিপিপাসবশেচ

দাকাশসারসরসং রসিকাঃ পিবন্তু ॥

ভগবতীও যে পদার্থ আমরাও তাহাই, তত্ত্ব-দার্শনিকের প্রাণে  
এ মীমাংসা বড়ই বাজিয়া থাকে । শ্রায়রত্ন মহাশয় অন্নপূর্ণার স্তবে  
কোনও স্থানে লিখিয়াছেন,

ত্বয়্যেব দেবি বরদে ত্রিজগৎপ্রভুত্বং

দাসা বয়স্ব ভবদঙ্ঘ্রিযুগলম্ নিত্বং ।

দ্ব্যং ঘিরাবগতিং বহুদ্রপাণ্ডিতানাং

নাহ্নে ত্বাদগমহনং বয়মাশ্রয়ামঃ ॥

মর্ম্মার্থ ।

ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী তুমি ব্রহ্মময়ী ভারী ।

ঐশ্বর্য-কমলে তোমার কিঙ্কর আমরা ॥

ভেদ-বুদ্ধি বিনাশিয়া এ চির-বিশ্বাস  
 ঋণাইতে যে পণ্ডিতে করে অভিলাষ,  
 তা'দের মা তত্ত্ব-কথা দাসেরা না শোনে  
 প্রবেশিয়া স্তম্ভীষণ অধৈত-গহনে ॥

অনেকে বলিতে পারেন, অজ্ঞানাবস্থায় বৈদান্তিকেরা কি ‘প্রভু’  
 ‘দাস’ বুদ্ধি ঋণাইতে চাহিয়াছেন? উত্তর এই, যুক্তি-জালের দ্বারা  
 এক রকমের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, তত্ত্ববিরোধি কার্যে সহস্র প্রয়োচনা  
 কর না কেন, সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্য্যকারী হইবে না। অর্থাৎ  
 সেরূপ করিলে সর্বজনীন জ্ঞানের দ্বারা যাহা যাহা সিদ্ধ, তদ্বিষয়ে  
 বুদ্ধির কোনও রূপ বৈলক্ষণ্য না ঘটতে পারে, কিন্তু কেবল যুক্তিজাল  
 ও শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা যে বিশ্বাস দৃঢ়ভূত, বিভিন্নমুখী যুক্তিজাল এবং  
 শাস্ত্রবাক্যের বিভিন্ন-মুখিনী ব্যাখ্যার বহুলপ্রচারে সে বিশ্বাস ধীরে  
 ধীরে শিথিল হইবে। সেরূপ হইলে, স্বর্গ নরকে, পাপপুণ্যে, আচার  
 অনাচারে পার্থক্য-বুদ্ধি, শিবজ্ঞাদির পরব্রহ্মে বিশ্বাস, এ সকল  
 ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইবে। বিবরের মধ্যে সর্প আছে, ইহা বেশ করিয়া  
 বুঝাইয়া দিয়া, তৎপরে হাজার কেন বল “গর্তের সর্পকে মৎস্ত জ্ঞান  
 করতঃ উহাতে হস্তপ্রবেশ করাও”, সে আদেশ সম্পূর্ণ ভাবে কার্য্যকারী  
 হয় না। আর যদি কার্য্যকারীও হয়, তথাপি ‘প্রভু’ (কর্তা) ‘দাস’  
 (অধীন) একই পদার্থ ইহা উচ্চারণ করাতেও পাপ। যেহেতু ব্রহ্মের  
 প্রভুত্ব-বিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানাবস্থার নহে। তত্ত্বজ্ঞান কালেও ঐরূপ বুদ্ধি  
 থাকে, তাহা ‘ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং’ ইত্যাদি  
 বাক্যের ব্যাখ্যা-কালে পূর্বে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ধর্মশাস্ত্রোক্ত অমুষ্ঠানাদির মীমাংসায় ভাষ্যরত মহাশয় আরও

সাবধান। শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান বিষয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের মধ্যে কখনও ভিন্ন ভিন্ন মত দাঁড়াইয়া যায়, তবে ত্রায়রত্ন মহাশয় এমন মীমাংসা করিতে ভালবাসেন, যদ্বারা কোনও পণ্ডিতই বলিতে পারিবেন না যে, সে ভাবে কার্য্য করিলে ক্রিয়াটি পণ্ড হইয়া যাইবে। বিজয়াদশমীর মুহূর্ত্তভঙ্গ-স্থলে পূর্বদিনে দেবী-বিসর্জন অথবা তদ্বিনেই বিসর্জন, ইহার মীমাংসা লইয়া পূর্বাধি গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে। পূর্বদিন বিসর্জন হওয়াই বিধেয়, ত্রায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ বিশ্বাস থাকিলেও উভয়মতের সামঞ্জস্য করা কর্তব্য মনে করিয়া ত্রীশ্রী অপরাধিতা পূজা করতঃ পূর্বদিনে দেবী-বিসর্জন করা শ্রেয়ঃকল্প স্থির করেন। এই মীমাংসায় উভয়-মতাবলম্বীদিগের বিবাদ মিটিয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সকল অনুষ্ঠানেই ত্রায়রত্ন মহাশয় এইরূপ সাবধান হইতে চেষ্টা করেন, এবং সেরূপ মীমাংসায় ধর্ম্মভীরু সকল অধ্যাপকেরই অনুমোদন পরিলক্ষিত হয়। ত্রায়রত্ন মহাশয়ের মত এই যে, কোনও কার্য্য করিয়া ফেলা হইয়া গিয়াছে, আর শোধনের উপায় নাই, এমন স্থলে যদি এক পক্ষ বলেন কার্য্য অসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন অগত্যা সে কথা গুনিতে হয়। যে ক্ষেত্রে উভয় দিক্ বজায় রাখিয়া মীমাংসা করা চলে না, সে ক্ষেত্রেও বিচার পূর্বক এক পক্ষ অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনও একরূপ মীমাংসা করিলে উভয়বাদীর সন্তুতি পাওয়া যাইতে পারে, সে ক্ষেত্রে সেই মীমাংসাই ধর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞাত করা উচিত।

সংস্কৃতবিজ্ঞার তিনটি সামগ্রী জগতে অনুপম। কাব্যো কবিগণের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, দর্শনশাস্ত্রে আধ্যাদর্শনকারগণের অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা, বেদ-পুরাণ-তন্ত্রাদিতে ধর্ম্মজীবনের অনুশাসন-প্রণালী। ত্রায়রত্ন মহাশয়ের জীবনে এই তিন অনুপম সামগ্রীরই প্রভাব প্রকটিত হইয়াছে। তিনি

কবি-জীবনে কাব্যরসাস্বাদ করেন, দার্শনিক-কর্কশতার সে জীবন কন্মুখিত নহে। তত্ত্ব-পথে মানব-যুক্তি কতদূর পৌছিতে পারে, শ্রায়রত্ন মহাশয় দার্শনিক-জীবনে তাহারই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার ঋষি-জীবন একমাত্র বেদ-পুরাণ-তত্ত্বাদিকে মূলভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে। দার্শনিকগণ অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিগণকে আশ্রমতে আনিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের যুক্তির অন্তরালে যদি কোনও তত্ত্ববিহীনতা প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া থাকে, তাহা হয়তো তাঁহারা নিজেও অনুধাবন করিতে পারেন না। এ কারণ, দার্শনিককে কখনও চার্সীকমত প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। ধার্মিকতা ও দার্শনিকতা স্বতন্ত্র সামগ্রী। দর্শনানভিজ্ঞ ব্যক্তিও পরমধার্মিক হইতে পারেন। ‘মহাজ্ঞানো যেন গতঃ স পশ্যঃ’ এই মহাবাক্য লিপিবদ্ধ করিয়া দর্শনকার স্বয়ং বাসদেব যে উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, ‘দেবানু ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাক্যম্ ॥’ এই মহাবাক্যের দ্বারা সর্বদর্শনোপদেষ্টা ভগবানু শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ধর্মজীবন-গঠনে তাহার উপরই মূল-ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। সে জীবনে আচারানুষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয়তা, দার্শনিকগণের পরস্পরের বাদ-প্রতিবাদ কলহ-বিদ্বেষ সে অংশে ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ নহে। ধর্মজীবন গঠনোপযোগী আচারানুষ্ঠান কি ভাবে নির্ণয় করিতে হয়, তাহা নিম্নলিখিত বাক্যের দ্বারা শ্রায়রত্ন মহাশয় উপদেশ দিতেছেন,

প্রজ্ঞাদোঽথ ভগীরথপ্রমৃতযজ্ঞোত্তানপাদাত্মজো

দেবীভক্তিয়ুতৌ সমাধিসুরথৌ শিষ্টান্ পরিব্রাজ্য তান্ ।

ভৌ ভৌ মিত্র পবিত্র তদগত-সদাচারঃ সদা শিষ্ট্যতাং

বাগ্জালৈর্বিজিগীষু দর্শনকৃতাং যুক্তৌ মনৌ মার্ধ্যতাং ॥

## মৰ্ম্মার্থ ।

প্রহ্লাদ পরম ভক্ত, ভক্ত ভগীরথ,  
 ভক্ত ধ্রুব, দেবীভক্ত সমাধি সুরথ ।  
 সেই সব সাধকেরে জেনে মহাজন,  
 শাস্ত্রে খোঁজ' তাহাদের কিবা আচরণ ।  
 সে পবিত্র সদাচার সদা শিক্ষা করি'  
 হে মিত্র, চলিবে তুমি সেই পথ ধরি' ।  
 দার্শনিক প্রত্যেকেই জিগীষার বলে  
 নিজ নিজ মতে পেতে গেছে বাক্যজালে ।  
 সে স্ব-স্ব-প্রধান কোন' যুক্তিজাল ধরে'  
 ধর্ম্মতত্ত্ব হির কিছু কর' না অন্তরে ॥

चिन्तं शोधय वेदबोध्यविधिना गौरीं गिरीशं हरिं  
 ध्यात्वा सत्यपरायणैर्मुनिगणैर्ध्यातं स्तुतं यत्पदं ।  
 योगैर्गहनिरूपणं न सुकरं तत्तत्त्वबोधाशया  
 द्वैताद्वैतविचारवाग्विरचनं कस्येदमारामधनं ॥

## মৰ্ম্মার্থ ।

চিন্তেরে শোধন কর শক্তি, শিব, হরি,  
 বেদবিধি অনুসারে আরাধনা করি' ॥  
 পুরাকালে মহা ঋষি মহামুনিগণ,  
 করেছে তাঁদেরি স্তব চরণ-বন্দন ॥  
 মিথ্যা না জানিত তা'রা সত্য-পরায়ণ,  
 তাঁদেরি দৃষ্টান্তে কর পথ নিরূপণ ॥

যোগেও ছুঁকর যেই ব্রহ্মের নির্ণয়,  
 হায় ভ্রান্তি, তাঁরি তত্ত্ব করিতে নিশ্চয়,  
 দর্শনেতে দ্বৈত আর অদ্বৈত বিচারে,  
 দার্শনিক পরস্পরে দোষাদোষি করে ॥  
 সে সব বিবাদ, যুক্তি, জল্পনা, কল্পনা,  
 বুঝাইয়া দাও মোরে কা'র আরাধনা ॥







## বিংশ পরিচ্ছেদ।

দার্শনিকের ইতিবৃত্তে দর্শনালোচনার আবশ্যক। রচিত গ্রন্থসমূহের  
বিবরণ। বঙ্গসাহিত্যে সমাদর। তাহার উন্নতি অবনতির  
আলোচনা। ছন্দের বিশেষ নিয়ম। নব্য ও প্রাচীন বঙ্গ  
কবিগণের প্রতি ত্যাক্ষর মহাশয়ের সহানুভূতি।

অবৈধ সাহিত্য-সমালোচনায় অপকারিতা।

জীবনচরিতে স্বাধীন মত প্রকাশের প্রয়ো-

জনীয়তা। ভট্টপল্লীতে পূর্বাপর বঙ্গ-

কবিতার আদর। উপন্যাস সম্বন্ধে

মত। পুরাণাদির প্রতি অবস্থা

কটাক্ষ সম্বন্ধে দুই

একটা কথা।

আমরা এই গ্রন্থে যে সকল দার্শনিক-বিষয় সন্নিবেশিত করিলাম,  
উহা এই গ্রন্থের পক্ষে কোনও রূপ অনুপযোগী বলিয়া বোধ করি না।  
রাজ-জীবনচরিতে রাজনৈতিক-চিত্রণ, বীরের ইতিবৃত্তে যুদ্ধ-বিবরণ  
যেমন প্রয়োজনীয়, শাস্ত্রসম্বল ভারতে দার্শনিক-শক্তি শাস্ত্রতত্ত্বে কত  
কোশল প্রদর্শন করাইতে পারে, দার্শনিকের জীবনে তাহা দেখান  
সেইরূপ প্রয়োজনীয়, ইহা আমাদের বিশ্বাস। এ কারণ, বঙ্গভাষার  
সাধারণ-পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে কি না, এ বিচার না করিয়া

শাস্ত্রজ্ঞগণের প্রতি দৃষ্টি করতঃ কতকটা শাস্ত্রীয় কথা এই গ্রন্থে সমাবেশিত করিতে হইয়াছে, এবং অনন্তোপায় হইয়া কতকগুলি সংস্কৃত ও বৈদিক ভাষা উল্লেখ এবং দার্শনিক সংজ্ঞাপর শব্দও স্থানে স্থানে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ভরসা করি, বঙ্গভাষার পাঠকগণের ইহাতে বিরক্তি হইবে না।

সকল জ্ঞানবান্ জাতির ভাষায়ই হুই শ্রেণীর গ্রন্থ আছে। এক শ্রেণী পাঠকের শক্তির অমুকূল করিয়া লিখিত। গ্রন্থের অমুকূলে পাঠকের শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে অপরশ্রেণী সংকলিত। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ সাধারণ-পাঠকের প্রীতি সম্পাদনে অধিক উপযোগী; দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ অনেকস্থলে গুরুপদেশ-সাপেক্ষ। কিন্তু তাহা পাঠকের জ্ঞান-বর্দ্ধনা পক্ষে উক্ত প্রথম-শ্রেণীর গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক-কার্যকারী। বঙ্গভাষার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ অপেক্ষা, প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থই অধিক পছন্দ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ বঙ্গভাষার পক্ষে উপকারী ভিন্ন অপকারী হইবে না, এই বিশ্বাসেও দার্শনিক বিচার-প্রক্রিয়া আমরা এই পুস্তকে যথাসম্ভব প্রকাশ করিয়াছি। তবে, যে সকল অব্যভিচারী নিয়মের দ্বারা দর্শন-শাস্ত্র, বিশেষতঃ জ্ঞানদর্শন পরিচালিত, তাহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। শ্রুতার্থ লইয়া আজকাল অভিজ্ঞ বিষয়িলোকের মধ্যে অনেকে আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহারই বৈচিত্র্য-মাত্র এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল আবশ্যক-বোধে প্রকৃত-পথে শ্রুতিসম্বন্ধ হইয়াছে কি না, ইহা অভিজ্ঞগণের নিকট সপ্রমাণ করিবার জন্য পদার্থসাধক হুই চারিটা মাত্র তর্কানুমানের আকার ব্যাস-সূত্র ব্যাখ্যা-কালে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। সেগুলির ভিতর কি কি বস্তু আছে, ইহা জ্ঞাত হইবার ইচ্ছার বঙ্গভাষার একজনও পাঠক

যদি যোগ্য-ব্যক্তির উপদেশ অপেক্ষা করেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান-বৃদ্ধিরই হেতু হইবে, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কঠিনতর দার্শনিক-সামগ্রী বঙ্গভাষায় প্রকাশ পাইবে। বঙ্গদেশের জ্ঞানদর্শন উৎকৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া দেশবাসীর মধ্যে অনেকের ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু কেন উৎকৃষ্ট, তাহা সকলে হয়তো জ্ঞাত নহেন। ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা বঙ্গভাষার পাঠকগণের একান্তই কর্তব্য। কারণ, দেশের গৌরববর্দ্ধক সামগ্রীর মহিমা সেই দেশবাসী প্রত্যেকে বুঝিতে শিক্ষা না করিলে দেশের গৌরব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

এই স্থলে অপর একটা কথা আমাদের বক্তব্য আছে। অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন দৃষ্টে জ্ঞানরত্ন-মহাশয়কে কেহ যেন শঙ্করাচার্য্যের বিদ্বেষী বলিয়া স্থির না করেন। দার্শনিকেরা জ্ঞাত আছেন, যিনি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তিনি সে সম্প্রদায়ের বিরোধি-মত খণ্ডন করিতে হইলে সম্পূর্ণ বিপক্ষতার ভান অবলম্বন করিয়াই সে কার্য্য করিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্যকেও গৌতম-কণাদাদি মহর্ষিগণের উপর পর্য্যন্ত কটাক্ষ করিতে হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই, ঋষিরা বা ঋষিকল্প-ব্যক্তির। যে বিভিন্ন দর্শনের স্রষ্টা, সে সমুদয় দর্শনই উপকারার্থ রচিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞানরত্ন মহাশয়ের সর্বদর্শন-বিষয়ে সার মীমাংসা। ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান দার্শনিক বিচারে হইতে পারে না। তাহা বহু তপস্তা-সাধ্য। গৌতম কণাদ বিবেচনা করিয়াছিলেন, শ্রুতি হইতে যখন নানা তাৎপর্য্য বাহির করা যায়, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ যখন শ্রুতি-সাহায্যে বুঝিবার উপায় নাই, তখন শ্রুতির একরূপ তাৎপর্য্য আমরা উপদেশ করিব যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র উপায় উপাসনা বিষয়ে লোকের মতি দৃঢ় হইবে। ‘সকলই ব্রহ্ম’ একরূপ তত্ত্বকথা শ্রুতি হইতে বাহির

করা অপেক্ষা ভেদসিদ্ধিই তাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্য-সাধনে অধিক উপযোগী জ্ঞান করিয়াছিলেন। জৈমিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ পদার্থ ইহা স্থূলভাবে প্রায় সকলেরই জ্ঞান আছে। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ-রূপে জ্ঞান আমি যদি যাগ-যজ্ঞ-মন্ত্রাদিতে করাইয়া দিতে পারি, তবেই জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। ‘ব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্ম’ করিয়া বিপথে পরিভ্রমণ করিলে কোনও ফলই হইবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন, “মন্ত্রই ব্রহ্ম। আর ব্রহ্ম নাই জানিও।” তিনি বিধিপ্রত্যয়-ঘটিত শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য গ্রহণ করিলেন। এবং তদনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতির তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করিলেন। যেক্রপ ভাবে শ্রুতি ব্যাখ্যা করিলে কোনও অনিষ্ট হইবে না, অথচ জীবের প্রকৃত উপকার হইবে, সকল আখ্যানদর্শনকারই তদুপযোগী দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋষিগণের কোন কার্য কি ফল উৎপন্ন করিতেছে স্থূলবুদ্ধি বশতঃ আমরা তাহা না বুঝিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের সংকার্যের উপকারিতা কোনও না কোনও বিষয়ে কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিশ্চয়ই সাধিত হইতেছে। ঋষিকল্প-শঙ্করাচার্য্যও সেইরূপ কোন সজ্জদেশে অদ্বৈতবাদ বিস্তার করিয়া থাকিবেন। শ্রীমদ্র মহাশয়ের ইহাই বিভিন্ন আখ্যানদর্শন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ-মীমাংসা। কিন্তু সমাজে তিনি লোকতঃ ধর্মতঃ শ্রায়শাস্ত্রেরই পরিপোষ্টা হইতে বাধ্য। সূত্রাং অদ্বৈতবাদী মহোদয়গণ শ্রায়মন্ত্র মহাশয়ের উপর দোষারোপ করিতে পারেন না।

শ্রায়মন্ত্র মহাশয় ‘অদ্বৈতবাদধণ্ডন’ নামক গ্রন্থ ব্যতীত, তত্ত্বসার জীবতত্ত্ব-নিরূপণ ও শক্তিবাদ-রহস্য নামক আরও তিন খানি দার্শনিক-গ্রন্থ এবং রসরত্ন ও কবিতাবলী নামে দুইখানি কবিতাগ্রন্থ লেখন করেন। ‘অদ্বৈতবাদধণ্ডন’ এবং ‘জীবতত্ত্বনিরূপণ’ অষ্টাঙ্গি মুদ্রিত

হয় নাই। অপর চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া পূর্বে অধ্যাপকসমাজে বিতরিত হইয়াছিল। এই ছয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত বিদ্যুৎসভায় আলোচনার উপযোগী অনেক পূর্বপক্ষ, শাস্ত্রীয় গূঢ় সন্ধান, জটিল বিষয়ের মীমাংসা, বহু প্রচলিত মীমাংসায় দোষোদ্ভাবন পূর্বক সূষ্ঠ ভাবে তাহার সমাধান, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আয়রত্ন মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিজ ছাত্রদিগের মধ্যে সেই সকল গূঢ় বিষয়ের আলোচনা করাইয়া থাকেন।

আয়রত্ন মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যের প্রতিও বিশেষ যত্ন আছে। ছাত্র-গণের অধ্যাপনা শেষ হইলে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে সময় তিনি বন্ধুগণের সহিত বিশ্রাম করেন, সেই সময়ে বাঙ্গালা উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকসমূহ ছাত্রেরা তাঁহাকে শুনাইয়া থাকে। বাঙ্গালা সংবাদপত্রও নিয়মিতরূপে আয়রত্ন মহাশয় শ্রবণ করেন। ভাল বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা পাইলে আয়রত্ন মহাশয়কে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। তিনি বলেন, দেশীয় সংবাদপত্রগুলিই বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে।

আয়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে আধুনিক রুচি অপেক্ষা প্রাচীন রুচির পক্ষপাতী। গণ্যংশে বঙ্গসাহিত্য যে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার মত-বৈধ নাই। বালক-সাধারণে সুস্পষ্ট মনোভাব লিপিবদ্ধ করিতেছে, ভাষা পূর্বাপেক্ষা কার্য্যকারিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এ সকলই তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, 'বাঙ্গালা কবিতায় পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে বহু সৌষ্ঠব-হানি হইয়াছে।

তিনি বলেন, ভাবাংশে নির্ভর করিলেই কবিতা হয় না। অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করাও ছন্দোময় শরীরের তাৎপর্য্য। কবিতা-

সুন্দরীর অঙ্গ-শোভা প্রকৃত কবির হৃদয়ে এতই জড়িত থাকে যে, কেবলমাত্র ক্ষুদ্র অক্ষরের ইতরবিশেষে নহে, অনাকাজ্জিত অঙ্গে বিরাম, অনুচিত অঙ্গে বিরাম-হানি, অসঙ্গত যতি-বিশ্লেষণ প্রভৃতি সংঘটিত হইবা মাত্র, প্রকৃত কবি মর্শ্ব-বাথা অনুভব করেন। গগ্নু যেমন ভাবগত বিরাম অপেক্ষা করে, ছন্দের তেমনি অঙ্গগত বিরামেরও আবশ্যক আছে। কি মিত্রাক্ষর, কি অমিত্রাক্ষর, সকল ছন্দেই অঙ্গগত শব্দাকাজ্জার অপেক্ষা করিয়া কবিকে চলিতে হইবে। বর্তমান কালের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গকবি মাইকেল মধুসূদনের কাব্যও, ছন্দোগত এই সকল গুণ হইতে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। একভাষার অনুকরণে ভাষান্তরে আকাজ্জা পরিতৃপ্ত হয় না। পূর্বে কোন কোন সংস্কৃত-পণ্ডিত সংস্কৃত-কাব্যের অনুকরণে ‘স্রগ্ধরা’ ‘শার্দূলবিক্রীড়িত’ প্রভৃতি ছন্দে সময়ে সময়ে বাঙ্গালা-কবিতা রচনা করিতেন। তাহা অশ্রাব্য হইত। বাঙ্গালা ছন্দের শব্দগত বিরাম চতুর্দশ অক্ষরেও সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সে ছন্দে অষ্টমাক্ষরের পর অঙ্গগত বিরামের প্রায়শঃই প্রয়োজনীয়তা আছে। গ্রায়রঙ্গ মহাশয় বলেন, অনেক প্রাচীন ছড়া ও বঙ্গকবি হেমচন্দ্রের ‘বাজিমাং’ প্রভৃতি কবিতায় ‘হসন্ত’ ও ‘অজন্ত’ হিসাবে ধরিলে, অক্ষরের নূনাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আকাজ্জা পরিতৃপ্ত হওয়ার তাহাতে ছন্দঃপাত নাই। পূর্বে বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট পাঁচালির চলন ছিল। তাহা ‘শ্রাব্য-কাব্যের’ অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। যেহেতু, ছন্দের অনাকাজ্জিত অংশে উচ্চারণ-গত এমন বিশেষ রাখিয়া, এবং আকাজ্জিত-অংশে হসন্তোচ্চারণাদির দ্বারা অতিরিক্ততার ও প্লুতোচ্চারণাদি দ্বারা নূনতার পরিহার পূর্বক, এমন সুন্দর ভাবে ঐগুলি শুনান হইত যে, ছন্দঃপাত-জ্ঞাত বেদনা কাহাকেও অনুভব করিতে হইত না।

কিন্তু পাঠ্যকাব্যে ছন্দোগত সকল গুণই পাঠকের সন্মুখে ধরিয়া দিতে হইবে। অতএব চতুর্দশ অক্ষর গুণিয়া গুণিয়া প্রতি ছত্রে বসাইয়া গেলেও, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অথবা স্থানে ছন্দঃপরিসমাপ্তি হইয়া না পড়ে এমন ব্যবস্থা করা উচিত। মিত্রাক্ষর ছন্দের পরিশেষে শব্দালঙ্কারের অহুরোধ থাকায়, আবৃত্তি-কালে শব্দগত সকল আকাজ্জা পরিতৃপ্ত করাইয়া, অর্থকালে অর্থগত আকাজ্জা অধেষণ করা হইয়া থাকে। অমিত্রাক্ষরে সে অহুরোধ না থাকায়, অর্থগত আকাজ্জার বিরামেই শব্দগত বিরাম লইবার নিয়ম। স্তায়রত্ন মহাশয় বলেন, মাইকেল যদি গণিয়া গণিয়া এক এক ছত্রে চতুর্দশ অক্ষর রাখিয়া ছত্র-বন্ধন করার পরিবর্তে, কবিতা-সুন্দরীর যে কোনও অবয়ব গ্রহণ করতঃ শব্দগত আকাজ্জা তৃপ্ত করাইয়া অর্থগত বিরাম স্থাপন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বরং ছন্দোবন্ধন হইত।

কেহ কেহ মধুসূদন প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিবার সময়, ঐ ভাবে শব্দাকাজ্জার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু মধুসূদন যে নিয়মে অক্ষর-বিভাগ করতঃ যে ভাবে ছন্দ-সম্মিলন করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রকৃতপ্রস্তাবে উক্ত পাঠকগণের পাঠ অনেক-স্থলে স্বীয় কল্পনাগ্রস্ত বাতীত আর কিছুই নহে। অমিত্রাক্ষরে যাহাতে ছন্দোগুণ বর্তে, তাহা বরং নাটককার গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি অধিক লক্ষ রাখিয়াছেন দেখা যায়। যেহেতু, তাঁহার চতুর্দশ-অক্ষরে নামমাত্র অঙ্গবদ্ধ করিয়া সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই ভিতর অথবা নিয়মে ছন্দঃপরিসমাপ্তি করিবার পরিবর্তে, শব্দগত আকাজ্জার সহিত যাহাতে ছন্দোময় অংশের বিরাম সংস্থাপিত থাকে, তাহা বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর-রচয়িতৃগণের পক্ষে এ অংশে দৃষ্টি রাখা একটা প্রধান কর্তব্যের মধ্যে। এতদ্ব্যতীত কোন্ বিষয়ে ঈদৃশ

বন্ধন অধিক কার্যাকারী হইবে, কোন্ বিষয়ে অল্প ছন্দের প্রয়োজন, কোন্ বিষয়ে গল্প উপযোগী, রঙ্গমঞ্চে তাহারও তাঁহারা ব্যবহার দেখাইয়াছেন। তবে, সাহিত্যের উন্নতির জন্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন উৎসর্গ করার পরিবর্তে, অনেক সময় পরমুখাপেক্ষী হইয়াই এই সম্প্রদায়কে কার্য্য করিতে হইয়াছে। একারণ, ছন্দোময় অবয়বের পূর্বোক্ত গুণ সকল তাঁহারা সকল স্থানে সমাবেশিত করিতে পারেন নাই। ছন্দে নাটক লিখিবার আশায় বালকেরা যেমন ছন্দোগুণ-বিশিষ্ট বন্ধনের পরিবর্তে যথেষ্ট ছত্রবন্ধন মাত্র করিয়া থাকেন, উক্ত নাট্যকার সম্প্রদায়কে নানা স্থানে সেইরূপ করিয়া ফেলিতে হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, আমরা এ স্থলে ছন্দোবিষয়ক যে নিয়মের উল্লেখ করিলাম, ছন্দের দোষগুণ বিচার করিতে হইলে এ অংশও আলোচ্য, জায়রত্নমহাশয়ের ইহাই মত। কেবল এই অংশের উৎকর্ষ অপকর্ষই যে কাব্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্দেশ করিবার অধিকারী, ইহা তিনি বলেন না। আত্মশক্তির বিশেষত্ব দেখাইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি যাহার নিকট যে আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, শক্তিগত তাঁহার বিশেষত্ব সেই আসনই তাঁহার জন্ত রক্ষা করুক, এ সম্বন্ধে জায়রত্ন মহাশয় কিছুমাত্র বিবাদী নহেন। অতএব আবশ্যকবোধে অংশবিশেষে জায়রত্ন মহাশয়ের মত লিপিবদ্ধ করা হইল বলিয়া, মধুসূদনের উপর তিনি উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন, ইহা যেন কেহ না মনে করেন। জায়রত্ন মহাশয় গুণের মর্ম্মগ্রাহী। হেমচন্দ্রের আর্থিকতা, মনীষিতা, চরিত্রশৃষ্টি ও ভূরিদৃষ্টি সহ বর্ণনা-পারিপাট্য, বহুচরিত্রে নবীনচন্দ্রের তেজস্বিতা ও উদারতা-সৃষ্টি, বহুস্থানে রবীন্দ্রের হৃদয়বত্তা, এ সকলেরই জায়রত্ন মহাশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, তিনি প্রাচীন কবির পক্ষপাতী বলিয়া কস্মিন্কালেও প্রকৃত গুণের অবজ্ঞাতা নহেন।



কিন্তু তিনি যথেষ্টতার অবজ্ঞাতা । অভিজ্ঞ হইবার পূর্বেই বঙ্গসাহিত্য-সেবীরা অনেকে এক্ষণে ছন্দঃ প্রভৃতি বিষয়ে নানারকম বিভ্রাট বাধাইয়া কবিতাদি রচনা করিয়া থাকেন । ভ্রায়রত্ন মহাশয় সে সকল রচনার উৎসাহদাতা নহেন । একদা সেইরূপ ভাবে রচিত কতকগুলি কবিতার শোভা সন্দর্শন করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বঙ্গভাষার উন্নতিসম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংস্কৃত-শ্লোকটী রচনা করেন ।

ত্বাং সংমেয় নবীন-কাব্য-রচনা নখ্যাপি সৈবাঙ্কনা  
 স্ত্রীণস্থূলতয়াতিদুষ্টচরণা হ্যোনা সুবর্ণাদিনা ।  
 নোবালঙ্করণং জলোদরমিব স্থূলং তদীযোদরং  
 তত্तां ভোক্তুমহং কদাপি ন যত্নে ভো বঙ্গভাষোন্নতি ॥

মর্ম্মার্থ ।

বঙ্গভাষা-সেবকের পাইয়া রচনা  
 কবিতা-ললনা কিবা হয়েছে নবীনা !  
 হায়, কিন্তু বামা-অঙ্গে করি নিরীক্ষণ  
 কোথাও হয়েছে সরু, ফুলেছে চরণ !  
 গাত্রে নাহি সে সুবর্ণ অলঙ্কার আর,  
 ক্ষীতোদর, ঘটেছে বা উদরী তাহার !  
 আহা নব্যা নারী, তবু সম্ভোগেতে মত্তি  
 নাহি হয়, হায় বঙ্গভাষার উন্নতি !!

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ সম্বন্ধে ভ্রায়রত্ন মহাশয়ের যেরূপ মত লিখিত হইয়াছে, বঙ্গকবি হেমচন্দ্রের অভিপ্রায়ও শেষাবস্থায় ঐরূপই হইয়াছিল । শেষাবস্থায় তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ ব্যবহার করিতেন না । কাশী-

ধামে অবস্থান কালে, দেখিবার জন্ত ত্রায়রত্ন-মহাশয়কে তিনি নিজের একখানি গ্রন্থাবলি প্রেরণ করেন। তাহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দোঘটিত অংশসমূহ বাদ দিয়া, যে যে স্থানে অর্থিকতা সহ ছন্দঃপারিপাট্য প্রকাশ পাইয়াছে, কাব্যের সেই সেই অংশ এবং ‘বাহ্মিমাং’ ‘ভারতোদ্ধার’ প্রভৃতি খণ্ড-কবিতা সকলই ত্রায়রত্ন মহাশয়ের জন্ত নির্বাচন করিয়া পাঠান। শব্দাকাজ্জ্বল্য সহিত যোগা-যোগ করিয়া বিরাম সংস্থাপন না করিতে পারিলে, চতুর্দশ অঙ্কে ছত্র সাংজ্ঞান বিফল, এ বিষয়েও তাঁহার অনুমোদন দেখা গিয়াছিল। শাস্ত্রিক-আকাজ্জ্বল্য ও বিরামে সম্বন্ধ রক্ষা করতঃ একখানি নাট্যকাব্য রচনা করিয়া, কোনও গ্রন্থকার হেমচন্দ্রকে শুনাইবার জন্ত কালীধামে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। অমিত্রাক্ষরের ঐরূপ বন্ধনে তিনি তৎকালে অধিকতর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঘটনাবৈচিত্র্য অপেক্ষা, ভাষা ভাব ও বর্ণনাগত-বৈচিত্র্যেরই ত্রায়-রত্ন মহাশয় অধিক পক্ষপাতী। ঘটনাগত-বৈচিত্র্যের প্রভাবে যে সকল পুস্তকের প্রভাব পরিব্যাপ্ত, ঘটনাবলী জ্ঞাত হওয়ার পর সে সকল পুস্তক লোকে সর্বদা আর অধ্যয়ন করে না। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে যে গ্রন্থের উৎকর্ষ সিদ্ধ, তাহার অনেকাংশ লোকে মুগ্ধ না করিয়া থাকিতে পারে না। দাশরথি, রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামবল্লভ, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতির রচনা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বর্তমান সময়ের রুচি-অপেক্ষা প্রাচীন রুচিরই ত্রায়রত্ন মহাশয় কিছু অধিক পক্ষপাতী। এরূপ সমালোচনা সেই রুচিরই ফল বলা যাইতে পারে।

লৌকিক-ভাবে ঘটনাবলী বর্ণনা অপেক্ষা, পারমার্থিক-বর্ণনারই ত্রায়রত্ন মহাশয় অধিক পক্ষপাতী, এবং ভাবের মধ্যে বাৎসল্যতাব ও

ভক্তিভাবের বর্ণনায় তাঁহার সমধিক অনুরাগ। এ কারণ, আদিরসের গ্রন্থে অথবা বর্তমান উপজাতিগণ পাঠে তিনি যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করেন, ৬দাশরথি প্রভৃতির পাচালী শ্রবণে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ করেন।

সমালোচক-হিসাবে গ্রায়রত্ন মহাশয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী। সাধারণের সহিত কোনও বিষয়ে তাঁহার মতের অনৈক্য হইলে, তিনি আত্মমত গোপন করার পরিবর্তে, ক্ষুদ্র কবিতা যোগে এমন সরস ভাবে স্বরূপ বর্ণনা করেন যে, প্রবীণ অভিজ্ঞগণের চক্ষে তিনি একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক বলিয়া প্রতিভাত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মধুসূদনের ছন্দোবিবাক্ষী প্রতিভা গ্রায়রত্ন মহাশয়কে কুহক অর্পণ করিতে পারে নাই। একদা কতিপয় যুবক তাঁহার বিশ্বাস অপনোদন করিবার জন্ত তাঁহাকে 'মেঘনাদবধ' কাব্য শুনাইতে বসে। কিছুক্ষণ শুনিলে পর তাহার গ্রায়রত্ন মহাশয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করিল। গ্রায়রত্ন মহাশয় অধিক কথা না বলিয়া, হাসিতে হাসিতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত-শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন।

নব্যাং মধুধ্বনি সুসজ্জিত পাদযুগ্মাং

বিন্ধ্যায় বঙ্ককবিতাং নবসম্মুখসেব্যাং ।

একত্র নূপুরমিতাং বলয়ং পরত্র

পাদে চ নর্ত্তনবতীং যুবতীং স্মরামি ॥

মর্ম্মার্থ।

ছ'চরণে আজি হার বঙ্ক-কবিতার

মরি কি মধুর মিল মধুর বাহার !

নব-রূপ ধরিয়াছে নব-ভাবনার,  
নব-সভো সেবা করে, আঁচীনে না চায়।  
চরণের শব্দে হয় কতই স্মরণ ;  
একবার এক নারী করে' আগমন,—  
এক পা বাল্য শোভে, এক পা নুপুরে,  
নেচে গিয়াছিল বামা, মনে পড়ে তারে !! \*

একজন সংস্কৃতভাষা-সেবী নৈরায়িক-পণ্ডিতের বঙ্গভাষার বহু  
দেখিয়া পাঠক বিস্মিত হইবেন না। ভারতবর্ষ মহাশয়ের ভট্টপল্লী  
জন্মস্থান। ঐ পল্লীতে বহুকালাবধি সংস্কৃতভাষার উন্নতির সহিত বঙ্গ-  
ভাষারও চর্চা হইয়া আসিতেছে। হুই একজন নিপুণ বঙ্গভাষার কবিও  
ঐ স্থানে অধ্যাপক-সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন। আমাদের সামান্য  
জ্ঞানে, ঐ কবিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশেষত্ব ছিল। সেই  
হেতু, কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা পূর্বোক্ত-শ্রেণীর কবির  
মধ্যে ৬ আনন্দচন্দ্রশিরোমণি মহাশয়ের রচিত হুই একটা কবিতা নিয়ে  
উদ্ধৃত করিলাম। ভরসা করি, পাঠকের কবিতাগুলি পাঠকালীন  
বিরক্তি হইবে না।

ত্রিক্ষণের অবলম্বন করিয়া কবি লিখিয়াছেন,

পূর্ণব্রহ্ম নিরাকার

জীবজন্তু সবাকার

করিতে পরম উপকার,

\* মিত্রাকর ছন্দের উত্তর চরণে শব্দের মিল থাকে। সেই মিলগুলিকে মধুসূদন-  
দত্ত কবিতাগুলির নিম্নরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গীয়-পাঠকগণ সেরূপ না  
বুঝিয়া ঐ মিলগুলিকে কবিতার অলঙ্কার বলিয়া বিশ্বাস রাখেন, ভারতবর্ষ মহাশয়ের  
ইহাই যে ইচ্ছা, কবিতাটির দ্বারা হলভঃ তাহাও উপদেশ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণরূপে অবতার                      দীনবন্ধু গুণাধার,  
 ধরি' মনোরঞ্জন আকার !  
 দৃষ্টি-পথে এলে ব্রহ্ম                      যোগী ছাড়ে যোগধর্ম,  
 রাজ্যকর্ম ছাড়িলেন যম,  
 ধর্মিষ্ঠ হইল পুষ্ট,                      তাপিতের গেল কষ্ট,  
 নষ্ট হ'ল নাস্তিকের ভ্রম !  
 সাধু সবে করে' যুক্তি                      সার করে কৃষ্ণভক্তি,  
 মুক্তি হ'ল দাসীর সমান,  
 শুধু ভক্তিভাবে নয়                      কতজন ভবে লয়  
 কত ভাবে ভাবিয়ে নির্মাণ !  
 জরাসিদ্ধ আদি জন                      বৈরিভাবে দিল মন  
 মেহভাবে নন্দ নন্দরাণী,  
 বৃন্দাবনে যত রাখাল                      সুহৃদ্রাবে ভেবে গোপাল  
 পরকালে পেল চক্রপাণি !  
 এইরূপে কত ভাবে                      কত জন মাধবে ভেবে  
 মরে' ভবে নাহি এল আর  
 গোপিকা ভেবে অন্তরে                      কাম-ভাবে শ্রীনাথেরে  
 ব্রহ্মভাব পেল সারাৎসার !!

\*                      \*                      \*

স্বহস্ত-প্রিয়া দূতীর উক্তি—

শুনেছি সই প্রেম সিদ্ধ, নাহি তার কুল,  
 অকূলে ভাসিবে সখি হইবে আকুল !  
 গুরুজন্য পঙ্কনা তার তরঙ্গ তুফান,  
 আতঙ্কে কাঁপিবে অঙ্গ হারাণি পরাণ

অতলস্পর্শ তার পরের মন রাখা,  
সেখানে সাতার ভার, তার বেচে থাকা !  
প্রেমসিদ্ধ জলে অঙ্গ না হবে নীতল,  
বিরহ-বাড়ব তাহে প্রবল অনল !  
সুধার সমান বটে আঁখির মিলন,  
কলঙ্ক-বিষেতে বেড়া, না হবে গ্রহণ !

\* \* \*

শ্রীরাধার উত্তর—

তুমি সই সুবোধ হ'য়ে অবোধ হ'লে হায়,  
আমার কি আর সে বোধ আছে, প্রবোধ দিবে কা'র ?  
কুলশীলে আমার কি সই তোমার যত বেশি,  
সাধে কি প্রমাদ-সাধ করি গো রূপসি ?  
আগে অমন ভাব্তেম কত, মন ছিল সই বশ,  
আপনার আপ্নি নয়তো এখন, রয় কেমনে গণ ?  
পরে সব ব'লতে পারে না কেনে পরের প্রাণ,  
পরের পিপাসা পরের না হয় অসুমান ।  
কি জালা অন্তরে দৃতি জানাব কেমনে,  
অঙ্গ জলে' যায় হায়, সে অঙ্গ বিহনে !  
ইচ্ছা করে পাখী হ'য়ে শূন্যে উড়ে যাই,  
জামরার কোথা হায়, কিরূপেতে পাই !  
ইচ্ছা করে সাগর-পারে করি সই গমন,  
ইচ্ছা করে সাগর ছেঁচে তুলি সে রতন !  
ইচ্ছা করে হারে তারে পাখিয়া সজনি  
জদর মাঝারে রাখি দিগল-রজনী !

ইচ্ছা করে কুঙ্কুমে তার মিশাইয়া মাখি  
 ইচ্ছা করে কাজল ক'রে কাণার চোখে রাখি ।  
 ইচ্ছা করে বুক বিদরে' বাহির করে' প্রাণ,  
 প্রাণের স্থানে রেখে তারে তাজি আপন প্রাণ !  
 ইচ্ছা সেই অলধরে ধরিয়া সজনি  
 প্রেমজলেতে শীতল করি অলস্ত পরানী !  
 ইচ্ছা করে শ্রামশরীরে মিশাইয়া বাই,  
 তবে তো বিচ্ছেদ খেদ সকলি এড়াই !

\* \* \*

দ্বিতীয় পরিচয়—

কর'বি কি সই, কুলবতী করেছে বিধাতা,  
 অন্তরে মিশাতে হবে অন্তরের ব্যথা !  
 কুলবতী জনার এমন ইচ্ছা ক'ন্তে নাই,  
 ইচ্ছা তুচ্ছ কর' নইলে ঘটবে বালাই !  
 কুলবতীর প্রেমে ইচ্ছা, দীনের ইচ্ছা ধনে,  
 বামনের চাঁদ ধ'ন্তে ইচ্ছা, পশুর ইচ্ছা রণে !  
 কুজোর ইচ্ছা চিং হ'য়ে শোয়, খোড়ার ইচ্ছা ছোটে,  
 বোবার ইচ্ছা কথা কর, সতত মুখ কোটে !  
 কালা করে গুন্তে ইচ্ছা, কাণার ইচ্ছা চার,  
 ইচ্ছা করলে কর'বি কি সই বিধি বাধী তার !  
 মূর্খের ইচ্ছা মান বাড়াতে, হুখীর ইচ্ছা স্তম্ভ,  
 চোরে করে ধর্ম ইচ্ছা, সে কেবলি চুক !  
 দাড়ের পাখী ইচ্ছা করে উড়ে যায় কানন,  
 সে যেমন বোঝে না পায় কঠিন বন্ধন !

ভেম্বতি সুন্দরি তোরে কুলের কুলুপ  
বিধাতা দিরাছে, তাতে তেটিবে কিরূপ ?

\* \* \*

অভিসারোক্তা নারিকার প্রতি সধীগণের রহস্ত—

একি ধনি ! বিনোদিনি ! দেখালি নতুন,  
ভাল ভাল ভালবাসায় হয়েছ নিপুণ !  
সরোবর অগ্রসর পিপাসার কারণ,  
ভ্রমরের অবেষণে পদ্মিনীর ভ্রমণ !  
চকোরেরে সুখা দিতে ভূমে নামল চাঁদ,  
নদ-নদীর কাছে বেতে সমুদ্রের সাধ !  
চাতকে দেখিতে যেষের উৎকণ্ঠিত মন,  
বাচকেরে বেচে বেড়ার অনুলা-রতন !  
লৌহ-সন্নিধানে ধায় অয়্যকামণি,  
নারী যার পুরুষের কাছে ভেম্বতি বাথানি !! †

বঙ্গদেশের প্রধান উপজাতি-লেখক বঙ্গবচস্করের উপজাতি-বিষয়ে  
লেখনী-চাতুর্যের জায়গার মহাশয় স্থখ্যাতি করেন । তবে উপজাতি-  
গ্রন্থ সকল জায়গার মহাশয়ের চক্ষে তাদৃশ হিতকর নহে । উপজাতি-  
কথকিং উপদেশের আভাস আছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে,  
উপজাতি বালক-বালিকাগণকে অনেকক্ষেত্রে এমন একটি স্থানে  
পৌছিয়া দিতে চাহে, যে স্থানে পৌছিলে কোনও জাতি অতি উচ্চ-  
স্থানে উঠিল ভাবিয়া কৃতার্থমন্ত হইতে পারে, কিন্তু অশ্রদ্ধেলীর নর-  
নারীগণের পক্ষে সে স্থানে উপনীত হওয়া আরো অনেক উচ্চস্থান

† পাচালীতে অক্ষরের সূত্রাধিক্য বিষয়ে বাহা বক্তব্য, এলা হইয়াছে ।



হইতে নিয়ে নামিয়া আসা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভায়রঙ্গ মহাশয়ের বিবেচনায়, পুরাণের কোশলপূর্ণ উপদেশ বড় হিতকর। তাঁহার বাল্যাবস্থায় জীলোকগণকে ঐ সকল উপদেশপূর্ণ পুরাণাদি পাঠ করিতে দেখিয়াছেন। বর্তমান সময়ে সে রুচির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এক্ষণে স্ত্রী-সমাজে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস, মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থের স্থান অধিকার করিয়াছে। এখনকার নব্য জীলোকগণের হাতে প্রায় বঙ্কিমবাবুর বা অপরা কোন' উপন্যাস-লেখকের গ্রন্থ আছেই। আবার কেবল তাহাই নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিয়া জীলোকগণ কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা করিতে বসে, এবং উক্ত পুস্তকের উপদেশানুসারে মহাভারতাদি গ্রন্থে কতপ্রকার দোষ বাহির করিয়া থাকে। ইহা লক্ষ করিয়া ভায়রঙ্গ মহাশয়ের মনে হয়, বঙ্কিমবাবু যদি উপন্যাস-লেখা সমাপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহাহইলে বড় ভাল হইত। ইহাতে তাঁহার গৌরব অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকিত। পাঠক, একবার চিন্তা করিবেন, যে মহাভারত ও ভাগবত হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে ব্রহ্মদেশের সীমা পর্য্যন্ত, বিশাল হিন্দু-ভূখণ্ডে হিন্দু নর-নারীগণ স্বর্গসাধক ও মুক্তিপ্রযোজক বোধে পাঠ করিয়া থাকেন, যে গ্রন্থের প্রত্যেক অক্ষর আপামর জননী ভক্তিপূতচিত্তে পাঠ ও শ্রবণ করিয়া, “পুণা সঞ্চয় করিলাম” এই জ্ঞানে কৃতার্থ ও ধন্ত হন, আত্মবুদ্ধিতে অসঙ্গত বোধ হইলেই সেই মহাভারত ভাগবতাদি গ্রন্থকে কথায় কথায় “আবাত্তে” “ঔপন্যাসিক” “রূপক” “অসঙ্গত” “অপ্রকৃত” “অতিরঞ্জিত” ইত্যাদি যথেষ্ট ঝাক্যে বিদ্রূপ করা, হয় বিধর্মী, না হয় বাতুলের কার্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থের সমালোচনা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। ভায়রঙ্গ মহাশয় ঐ গ্রন্থের সমালোচনা করিতে কোনও কালেই প্রস্তুত নহেন।

সেইজন্য আমরাও এই গ্রন্থের সমালোচনা করিব না। তবে, আবশ্যিক-বোধে সাধারণ হই একটা কথা বলিয়া আমরা এ প্রসঙ্গের উপ-সংহার করিব।

নিজের বুদ্ধিতে সঙ্গত বোধ হইলেই তাহা অধিকৃত, এবং নিজের বুদ্ধিতে অসঙ্গত বোধ হইলেই তাহা প্রক্ষিপ্ত, যুক্তিপরিচয়গণের এই যুক্তিতে নির্ভর করা উচিত নহে। প্রক্ষেপকারেরাও আমাদেরই জ্ঞান লৌকিকবুদ্ধিসম্পন্ন। যেরূপে প্রক্ষেপ করিলে লৌকিকবুদ্ধিতে অসঙ্গত বোধ না হয়, কেহ কিছু প্রক্ষেপ করিলে সেইরূপেই ঐ কার্য করা সম্ভব। কারণ, ধরা পড়িবার জন্য কেহই প্রক্ষেপ করে না। অতএব লৌকিক-বুদ্ধিতে বাহ্য সঙ্গত বোধ হয়, প্রক্ষিপ্ত থাকিলে তাহার ভিতরেও থাকিতে পারে। যখন লোকবুদ্ধির অতীত কার্যাবলী বর্ণনা না করাই তাহাদের পক্ষে অধিক সম্ভব, তখন অলৌকিক কার্যাবলী নির্ভীক মহাবিশ্বেরই রচিত, লৌকিক-যুক্তিপরিচয়গণের পক্ষে ইহাই ভো বিবাস করা উচিত। হুলকথা এই, স্বধর্মপরিচয় মহাজন-পরম্পরার শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধার দৃষ্টি করিয়া, দীর্ঘকাল শাস্ত্রমীমাংসা-রীতি অনুশীলন করিয়া এবং ধর্ম জীবন উৎসর্গ করিয়া, তৎপরে ধর্মগ্রন্থ মীমাংসায় হস্তার্পণ করা উচিত, ইহাই জ্ঞানরত মহাশয় বিবেচনা করেন। ঋষ্যাক ক্ষুদ্র শব্দে পর্ষ্যাক্ত অসামঞ্জস্য বাহির হইলে “শক্তি” “লক্ষণা” প্রভৃতি কত প্রকার মীমাংসা-কৌশল শাস্ত্রকারেরা প্রদর্শন করাইলেন, কিন্তু আবুযুদ্ধিতে অসঙ্গত বোধ হইবা মাত্র, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিবার পদ্ধতি কোনও প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞই অবলম্বন করেন নাই।

দেবলীলা ও ঈশ্বরলীলা লৌকিক-বুদ্ধির অতীত। অলৌকিক-কার্য্যকারিত্বই ঐ সকল লীলার সৌন্দর্য্য। যোগবলে মহাবিশ্ব ঐ সকল

জানিতে পারিতেন । এ কারণ, লৌকিক-বুদ্ধিতে যাহা অসম্ভব মনে হয়, ঐশ্ব-বুদ্ধিতে তাহা সম্ভব । ভগবৎ-লীলাদিতে শ্রদ্ধা শিক্ষা দিবার জন্যই ঐশ্বদ্বিগের জন্ম এবং মহাত্ম্যতাদি গ্রন্থের সৃষ্টি । শ্রদ্ধা যে কি অমূল্য গুণ, তাহা লিখিবার শক্তি আমাদের নাই । সেই শ্রদ্ধার বে মহাত্ম্যত-ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে উৎপত্তি, যে গ্রন্থাদি হইতে সেই শ্রদ্ধাশ্রোতঃ বহির্ভূত হইয়া আৰ্ধ্যজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে অসামঞ্জস্য বা প্রতিকূলতা দোষ অর্পণ করা যে কি ভ্রমজনক, তাহা ভায়রত্ন মহাশয়ের কল্পনায় আসে না । তিনি বলেন, আমি আজীবন ধর্মগ্রন্থ সকল অতুলন করিয়া অলীতিবর্ষে উপনীত হইতে চলিলাম, তথাপি কল্পনা করিয়াও বুঝিতে পারি না, মহাত্ম্যতাদি গ্রন্থের একছত্রেও অসামঞ্জস্য আছে কি না ।

মহাত্ম্যতাদির উপর কটাক্ষ দৃষ্টি করিয়া ভায়রত্ন মহাশয় যে কেবল এই বৃদ্ধাবস্থারই কাতর, তাহা নহে । যাবৎকাল কৃষ্ণচরিত্র বা ভাগবত গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে, তাবৎকাল তিনি ছঃখিত । বহুমুখ কৃষ্ণচরিত্রের উপক্রমে লিখিয়াছেন

আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি । পাশ্চাত্যশিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে । \* \* \* । তাই আমি ইয়োৰোপীয় মতেরও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত । ঐহাদের কাছে বিলাতী সব ভাল, ঐহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়ের বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, \* \* ঐহাদের আমি কিছু করিতে

পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে  
অনেকেই সত্যপ্রিয় ও দেশবৎসল। তাঁহাদের জন্ত  
লিখিব।

এইরূপে ইরোরোপীয় মতের প্রতিবাদে ও ধর্মগ্রন্থসংস্থাপনে  
ব্রতী হইরা বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে ঐ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, কোনও  
সময় তাহা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতারত্ন মহাশয় বলেন, “উপজ্ঞাস-লেখায় এবং  
ভ্রাক্ষণপণ্ডিত-বিদেষে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ দক্ষ, ধর্মগ্রন্থ-সংস্থাপনে সেরূপ  
কোনও দক্ষতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।” বঙ্কিমচন্দ্রের বাদি-  
নিরাসপ্রণালী এবং ধর্মগ্রন্থ-সংস্থাপন-কৌশল কিরূপ হস্তজনক, ভ্রাতা-  
রত্ন মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত সংস্কৃত-শ্লোকগুলির দ্বারা তাহা সম্যক  
রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

তৃমিস্তূর্ণণাতী স্মৃতস্য কিমিদং সম্ভাষ্যতে যিঞ্জিতে-  
র্মন্থে ক্লিস্তচয়েন শাস্ত্রনিচয়ে প্রজ্ঞিসমেতদ্বষঃ।  
তদু ভৌ বজ্জগতা ভবন্তু ভবতামাখ্যা হি শাস্ত্রোদিতৈ  
শাস্ত্রস্বেদমিতিপ্রবোধবিধুরং জামীত গৌরং নরং ॥

মর্ম্মার্থ ।

মঠে ব'সে জল ঢেলে করিছ তর্পণ  
পরলোকে সুখী হবে মৃতব্যক্তিগণ,  
এ কথা মনেতে মোর না লয় সঙ্গত,  
শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ ইহা ক্রিপ্তের রচিত।  
হেন সুমীমাংসা যদি রহিয়াছে তবে,  
আর কেন ? শাস্ত্রে তবে প্রজ্ঞা কর সবে।

ନା ନହେଓ କହୁ ଆମ୍ଭ ଯୁକ୍ତି ବିଳାତୀର,  
ଆହେ କି ଶ୍ରୀମାତା-ବୋଧ ମାନ୍ଦାତା-କାଠିର ?

ମୃତ୍ୟୁକ୍ଷେପେ ଦୃଶ୍ୟତସୁ ଦେବ୍ୟଜନଂ ବଞ୍ଚିତଃ ହବିଃକ୍ଷେପଂ  
କିଂ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ନୟେନ୍ନରଂ ବିଧିବଦଃ ପ୍ରସିଦ୍ଧମେତତ୍ପରଂ ।  
ତଦ୍ ଭୋ ବଞ୍ଚିତା ଭବନ୍ତୁ ଭବତାମାତ୍ମା ହି ଶାସ୍ତ୍ରୋଦିତେ  
ଶାସ୍ତ୍ରଞ୍ଚେଦମିତିପ୍ରବୋଧବିଧୁରଂ ଜାନୀତ ଗୌରଂ ନରଂ ॥

ସମ୍ପର୍କ ।

ଯୁକ୍ତିକା-ପ୍ରସ୍ତରେ କର ଦେବତା-ଅର୍ଚ୍ଚନ  
ବହି ଯାହା କରିତେହ ହବିଃ-ବିକ୍ଷେପଂ,  
ଇହା ସ୍ୱର୍ଗେ ତୁଲେ ଯେବେ ବୁଦ୍ଧିତେ ନା ଧରେ,  
ଅନ୍ଧିତୁ ନିଷ୍ଠୁର ତବେ, ଗଢ଼େ କିନ୍ତୁ ନରେ ।  
ହେନ ଶ୍ରୀମାତା ଯଦି ରହିଯାହେ ତବେ,  
ଆମ୍ଭ କେନ ? ଶାସ୍ତ୍ରେ ତବେ ଅନ୍ଧା କର ମଧେ ।  
ନା ନହେଓ କହୁ ଆମ୍ଭ ଯୁକ୍ତି ବିଳାତୀର,  
ଆହେ କି ଶ୍ରୀମାତା-ବୋଧ ମାନ୍ଦାତା-କାଠିର ?

କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱଂ ଜଗତାଂ କରାଦି-ରହିତେ ବ୍ୟାପାରସ୍ତୁନ୍ୟେନ୍ନରେ  
ଯଦ୍ବାକ୍ୟଂ ବଦତିଷ୍ଠା ବିଜ୍ଞାୟକରଂ ନୋ ତସ୍ୟ ବେଦାଂଶତା ।  
ତଦ୍ ଭୋ ବିଜ୍ଞାୟତା ଭବନ୍ତୁ ଭବତାମାତ୍ମା ହି ଶାସ୍ତ୍ରୋଦିତେ  
ଶାସ୍ତ୍ରଞ୍ଚେଦମିତି-ପ୍ରବୋଧବିଧୁରଂ ଜାନୀତ ମୁଖ୍ୟାଧିମଂ ॥

ସମ୍ପର୍କ ।

ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ତିନି, ହେ ମନ ନାହି,  
ଘଟା ନାହି, ଘଟା ଓବୁ ବନିତେହ ଭାହି ।

যে জাতিই বল এই অসমত-বানী  
 সুবিশ্বকর ব'লে আমি মনে মানি ।  
 অতএব তুমি ভাই, প্রকৃষ্ট এ কথা,  
 যে যার শাস্ত্রেতে শ্রদ্ধা ছাড়িও না বুধা ।  
 শাস্ত্রের মীমাংসা-রীতি যে জাতি না জানে  
 মূর্খাধম সেই জাতি কেন' মনে মনে ॥

যে ভক্তাঃ শূনি দূরদর্শিনি যথা, শ্বেতাঙ্কদেয়োত্তম  
 নো সম্ভাব্যমিদং বচো মম ভবেৎ তেষাম্ভু তোষাঙ্গদং ।  
 শিষ্যাসুস্বধিয়া ময়া বিরচিতাদ্ ভূয়ান্নিবন্ধ্যচ্ছুভং  
 শাস্ত্রজ্ঞান-সচেষ্ট-শিচ্চিত-সতাং বহুস্বলীস্বায়িনাং ॥

মন্ত্যার্থ ।

শাস্ত্রে যোঁর যে বিশ্বাস বালো নাহি ছিল,  
 শিক্ষা-শ্রুণে একে একে সব উপজিল ।  
 বিলাতী-পণ্ডিত হ'তে যে বোধবিধুর,  
 সেবা করে লাগায়ের বিলাতী-কুকুর,  
 যে পুত মীমাংসা আমি করিলাম ভাই,  
 সে জন মানিবে ইহা, এ বিশ্বাস নাই ।  
 জাতে আছে, ধাতে আছে, যে সকল লোক,  
 তাহাধেরি তরে যোঁর মীমাংসার প্রোক ॥

কৃষ্ণচরিত্রাদির ভ্রাতৃ গ্রন্থের ফলে, বালকেও সময়ে সময়ে বাসের  
 উপর কটাক করে। ভ্রাতৃর বহান্ন বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিতে অনিচ্ছিত

হঠাৎ সময়ে সময়ে আক্ষেপের সহিত বলিয়া থাকেন, যে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির ফল ব্যাসের উপর বালকের কটাক্ষ, তাহার উন্নতি সর্বাংশে মঙ্গলবিধায়ক নহে। নিম্নলিখিত শ্লোকটি তাঁহার মনের সেই ভাবের ব্যঞ্জক।

বিদ্যাভ্যাসমপাশ্ব্য তাবকরসানাংস্বাদয়ন্ মন্যতে  
 ব্যাসং স্ত্রীণবলং গুরুং দৃষ্টতুলং বালোঽপি কালক্রমাৎ ।  
 বিদ্যারম্যচরৈর্নরৈরিব পরৈঃ স্বাচার্য্যতা জ্ঞাপ্যতে  
 গুহ্যত্বং গুরুতা গতা গুরুগতা হা বদ্ধভাষোন্নতে ॥

মর্ম্মার্থ ।

হায় ! তব রস-পানে বিদ্যাচর্চা ছেড়ে,  
 শিশুরা অবজ্ঞা করে ব্যাস-ভার্গবেরে !  
 মনে হ'লে কোন' কথা, প্রকাশিতে নাই,  
 কি বিদ্বান্, কিবা মূর্খ, আচার্য্য সবাই !  
 গুরুর গুরুতা আর খাটে না সম্মতি,  
 কি করিলে হায়, বঙ্গভাষার উন্নতি !!





## একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

উচ্ছ্রাজল ধর্ম্মানুষ্ঠাতা, অনধিকারী ধর্ম্মবক্তা,  
বঙ্গীয় বিদ্যুৎসমাজের বিদ্যেষ্ঠা প্রভৃতির প্রতি  
শ্লেষচ্ছলে ভুরি উপদেশ । প্রাচীন  
ও আধুনিক সমাজের চিত্র ।  
উপসংহার ।

ধর্ম্মকার্য্য-সমালোচক হিসাবে, ভারতীয় মহাশয়ের অতিপ্রাণ এই, হিন্দুর কোনও অনুষ্ঠান যেন শাস্ত্রের সহিত অনৈক্য করিয়া সম্পন্ন করা না হয় । সন্ধ্যাপূজাদি-সকলনিত্যকার্য্য-বর্জিত একটি বিষয়ী লোক, কোনও উপায়ে কিছু কিছু আসন-প্রাণায়াম শিক্ষা করিয়া অবৈধ সময়ে অতি অবৈধ-ভাবে ঐ সকল অনুশীলন করিতেন । কাশীধামে কোন' কোন' ভিক্ষুক, সন্ন্যাসি-বেশে ঐ সকল আসনাদি প্রদর্শন করাইয়া ভিক্ষার্জন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে । স্ব স্ব অধিকার মতে বখাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করার পরিবর্তে, বাহারা অবৈধ-ভাবে ঐ সকল আসন-প্রাণায়াম অভ্যাসে বাস্ত, “কাশীধাম” প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে ব্যাসদেব তাঁহাদের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন । ভারতীয় মহাশয়ও তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,

ईये श्रौतविधानधीत-मनसो योगो धनं योगिनां  
तद्योगः परयोग एव, नतु स श्वासावरोधात्मक ।



শ্রীতাবাসকোঽপি যস্য বিধিবৎ সচ্ছিন্তনং ন জ্ঞানং  
নো কিং নরকবদেয় কুশলকবিধৌ মল্লাদিবদ্যাসনে ॥

মৰ্ম্মার্থ ।

খাপরোধ আসনাদি ক্রিয়া অবাস্তব,  
জানিও পরম-যোগ নহে ইহা নর ।  
যথাশাস্ত্র এ সকল করে' আচরণ,  
জগতে নিশ্চয় চিত্ত হইবে যখন,  
ব্রহ্ম মনে সেই চিন্তে ঘটিলে সংযোগ  
তাহাই পরম ধন, যোগীদের যোগ ।  
অমুঠানে নাহি ঐক্য শাস্ত্রের সহিত,  
ব্রহ্মে ভাবে, চিন্তা কিন্তু বিধি-বিগর্হিত,  
এ হেন অবৈধ-ভাবে যে মানবদল,  
ক্রিয়া করে স্বেচ্ছামত ভবে অবিরল,  
কুন্তকে কুন্তীর তা'রা লয় মোর ছদে,  
আসনেতে কষ্টো করে পলোয়ান্ বেদে !!

এইরূপে ভায়রব মহাশয়ের চরিতাবলী অধ্যয়ন করিলে জানা যায়, বহু উচ্ছ্রাল কার্যেই চিরদিন তিনি ভীকৃ দৃষ্টি রাখিয়া আসিয়াছেন। এই যে অনাচারী, অভোজ্যভোজী, অস্পৃশ্য-ব্যক্তিগণ ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করতঃ, হিন্দুধর্ম্মবক্তা রূপে হিন্দুধর্ম্মোপদেশ করতঃ বহু লোককে ভুলাইতেছেন, ভায়রব মহাশয় ইহা একটা গ্রহসন মনে করেন। ধর্ম্মোপদেশ করিতে হইলে তাঁহার সঙ্গী, সংযতাহারী, ত্রিকালীন আত্মিক-পুত্ৰ হোন, এই উদ্দেশ্যেই বোধহয় ভায়রব মহাশয় লিখিয়াছেন,

ত্বত্ত্বং যত্ সুরব্রহ্মবন্দনমপি ত্বত্ত্বং চিসম্ব্যাদিকং  
 যত্নত্ সঙ্ঘমভোজ্যভোজনমতোঃপ্যম্বস্বয়া যত্ কৃতং ।  
 সঙ্ঘাং অরতরিদং সদা তব কদাচারে ন দুঃখমদাঃ  
 সৌদুং কিন্তু ন শক্যতে তব তু যা দশেন বাচরসতা ।

মন্ত্যার্থ ।

ছাড়িয়াছ দেব-সেবা, ত্রিসঙ্ঘা-বন্দনা,  
 তাহা সহ হয় প্রাণে, লাগে না বেদনা ।  
 নিয়ত কতই কর অভোজ্য-ভোজন,  
 তাহাতেও প্রাণে আমি না পাই বেদন ।  
 ছেড়ে বত অমুষ্ঠান, ঘোর কদাচারে  
 কাণ যাপ' নিরন্তর, তা'ও নেজে হেরে  
 ওহে সুধী সহ হয় প্রাণে সমুদয়,  
 একটি আমার প্রাণে সহ নাহি হয় ।  
 বস্তু উপদেশ ছলে তুমি দত্ত করে'  
 বক্তৃতা করিয়া ঘোর' কুলাইয়া নরে,  
 পাপ-মুখে বাচালতা শুনে অনিবার  
 প্রাণে বড় বাজে, হয় অসহ আমার!!

বাহার বঙ্গীয়-বিদ্যৎসমাজ লিখিল করিবার অল্প আবির্ভূত, তাঁহাদের  
 উপর জ্ঞানরত্ন মহাশয়ের উক্তি আরও কর্কশ । সমগ্র বর্ণনশাস্ত্রের  
 অস্বিমজ্জা দ্বারা যে অসুমানবগাদি প্রণয়ন করিয়া দেখে প্রাচীন  
 আচার্যগণ বঙ্গীয়-বিদ্যৎসমাজকে বস্ত্র-আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়া  
 গিয়াছেন, সেই অসুমানবগাদির উপর কোনও কোনও অপ্রশিক্ষিত

আধুনিক ব্যক্তি এক্ষণে কিরূপ আক্রোশ প্রকাশ করেন, তাহার আভাস এই গ্রন্থে মধ্যো মধ্যো আমরা দিয়া আসিয়াছি। স্বদেশদ্রোহী এই সকল ধুষ্টব্যক্তিকে কখন কখন বলিতে শুনা যায় “অমুমান-খণ্ডী অসার সামগ্রী। ইহা “ঘটক” “পটক” “অবচ্ছেদকতা” “নিরূপকতা” এই চারিটা কথা লইয়া গলাবাজি করিবার শাস্ত্র।” স্মৃতিশক্তি-প্রভাবে এই সকল শিক্ষাভিমानी আধুনিক-ব্যক্তি এক একটা জগন্নাথতর্কপঞ্চানন-বিশেষ। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, ইংরাজি ভাষা না বুঝিলেও, একবার দুই সাহেবকে ইংরাজিতে পরস্পর গালি-বর্ষণ করিতে শুনিয়া আদালতে অবিকল সেই ইংরাজি কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া আসিয়াছিলেন। তবে, তিনি বুদ্ধিবলে সমাজ বন্ধন করিয়া গিয়াছেন। নব্য-জগন্নাথতর্কপঞ্চাননদিগের তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাব বঙ্গীয়-সমাজকে সকল শাস্ত্রীয়-শক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে। বৃথা শিক্ষাভিমानी কুশিক্ষিতগণের স্বরূপ-বর্ণনা ভায়রত্ন মহাশয় একদা কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট বড় সুন্দর ভাবে করিয়াছিলেন। যথা,

জ্ঞাত্বার্থং পচমুঙ্ক্ষুগচ্ছবচসাং য়ে স্বং দ্বিতীয়ং গুরুং  
মত্বা দর্শনতত্ত্ববর্ষণবিধৌ ব্রহ্মতা: পয়োদগ্নতা: ।  
বিস্মাতুং প্রমদগ্নিরত্মিসুপমা: ক্লপস্থমেকৈ: সমা  
নাং ক্রিন্তে নবভীমবর্ষরনরা: শ্বেতাঙ্কসেবাপর: ॥

মর্ম্মার্থ ।

‘পচ’ ‘ভুঙ্ক’, ‘গচ্ছ’ শব্দ ব্যাখ্যা করে’ ভবে  
মনে মনে আপনারে বৃহস্পতি ভেবে,  
দর্শনের তত্ত্ববৃষ্টি করিবার আশে  
যে জন বিরাজ করে পয়োদগ্ন বেশে,

হে সুবোধ ! হিরভাবে ভাব' একবার  
কা'র সনে তুলা মোরা দিতে পারি তার,  
যেই ডেক বাস করে কুপের মাঝারে,  
কতু সাধ্য নহে যার উঠিতে উপরে,  
অনন্ত সাগর-শোভা সে বুঝিতে গেলে  
তারি সনে একমাত্র যোগ্য তুলা মেলে ।  
সেবা-বিজ্ঞা শিক্ষা করে' আছ সেবা ল'রে  
শাস্ত্র-তবে ইচ্ছামত কি কাজ বকিয়ে ?  
'পচ' 'ভুজ্জু', 'গচ্ছ' এই তিন লয়ে থাক',  
পাক কর, খাও, যাও, বাজে কথা রাখ ।

সत्तर्कैः कविशुष्टयुक्तिनिचयैः संमथ्य शास्त्राम्बुधिं  
वाचानालिकयार्पयन्तु कवयः कर्णेषु तत्त्वामृतं ।  
किन्त्वेतन्महদেव चित्रमधুना निःसारवाग्विस्तरे-  
जाननं वक्त्रगिरं नरश्चरति यत् तत्त्वप्रचारव्रती ॥

মন্ত্যার্থ ।

শাস্ত্রোক্ত-উপায়ে সং তর্ক-জাল ধরে'  
শাস্ত্রকার-প্রদর্শিত যুক্তি অগুসারে,  
সুগভীর শাস্ত্র-সিদ্ধ করিয়া মন্থন,  
এই ধরাভল মাঝে যে পবিত্র জন,  
সরল বাহুল্যে দিয়া ঢালিতে সক্ষম  
পরকর্ণে তদানুত অতি মনোরম,  
তত্ব উপদেশ করা তারি শোভা পার ;  
কিছু কি আশ্চর্য্য দেখ হ'তেছে ধরায়,

কোন' বস্তু নাই শুধু বাক্য-রাশি ঢেলে  
লিখিয়া বাজালা-কথা তত্ত্ব-কথা বলে !!

সূত্রে সাধুসমাট্যতামৃতফলং দুস্তক্ৰমতকাটবি  
যস্য্যং দুর্জয়-ধোর-সিংহনিচয়ঃ প্রীতঃ সদা ক্রীড়তি ।  
যানং তত্র সুদূরতোঽস্তু ন কদাপ্যাকর্ষণং সম্ভবে-  
দাজীবং খলু খেলতাং তনুভূতাং কাব্যাদিকস্চীবনে ॥

মর্ম্মার্থ ।

তর্করূপ যে বিষম দুর্গম অটবী  
দেয় সাধু-সমাট্যত অমৃত-পদবী,  
যে কানন আলোড়িয়া মহাস্বধীগণ,  
দুর্জয় যুগেন্দ্র রূপে করে বিচরণ,  
কাব্য-আদি কচ্চী-বনে যেই জীবগণ,  
ক্রোড়া ক'রে চিরদিন কাটায় জীবন,  
তাহারা কেননে যাবে সে কাননে হার,  
কর্ণেও শোনেনি বস্তু কিবা তাহে রয় !!

একশ্রেণী আর পণ্ডিত-মোহজনক শাস্ত্রীয়-তর্ক নাই। শাস্ত্রাংশ  
লৌকিক-ভাবে কাগজ-পত্রে লিখিয়া ও বস্তুতা দ্বারা বিষয়লোকে  
ভুলাইয়া নবীন-শিক্ষিতেরা আপনাদের এবং আপনাদের সিদ্ধান্তের  
সারবত্তা উপলব্ধি করিতেছে। বিদ্যৎসভায় বিচার পরিচয় না দিয়া  
এইরূপ কাগজে পত্রে বিষয়-লোকের মাঝে আফালন করিবার  
প্রয়াসও দেশীয় নবশিক্ষিতগণকে ক্রমশঃ শাস্ত্রীয়-শক্তি হইতে বিচ্যুত  
করিয়া দিচ্ছে। প্রকৃত অভিজ্ঞগণের অনাদৃত কতকগুলো বাগ্জাল

লইয়া একদা কতকগুলি বিষয়লোকের মধ্যে কোনও শিক্ষাভি-  
মানীকে আফালন করিতে দেখিয়া জ্ঞানরত্নমহাশয় নিম্নলিখিত-  
মহুপদেশপূর্ণ কবিতাটি রচনা করেন ।

লীলাঙ্গৈর্নটনৃত্যদর্শক ! সমা যা শোভিতা পণ্ডিতে:  
শক্তিষেদ্ বুদ্ধবীর ! তত্র গমনৈঃ সম্যগ্ জয় প্রীণয় ।  
যা যো দর্শনমর্ম্মলেশমপি নো জানাতি তত্‌সম্বিধা  
বক্তৃত্বশ্রবণেন শারদঘনধ্বানং স্মারামো বয়ং ॥

অর্থ ।

ওহে বাগ্মী ! মনে পড়ে দেখিয়া তোমারে,  
নাটকের নট যেন হাত মুখ নাড়ে !  
বস্তু কিছু আছে তব জ্ঞান যদি গির,  
কিন্তু হে আগার বাক্য, পণ্ডিতের বীর !  
পণ্ডিতের সভা মাঝে হ'য়ে উপনীত,  
তাদের করিও মুগ্ধ, ক'র পরাজিত ।  
দর্শনের কিছু মর্ম্ম যাহারা বোঝে না,  
যাদের করেছে বিজ্ঞ আপন কল্পনা,  
কুনিদ্রা তাদের সাথে দর্শনের বাদ  
মনে পড়ে শরতের মেঘের নিনাদ ॥

জ্ঞানরত্নমহাশয় মনে করেন, আখ্যানশাস্ত্রমূহ পাশ্চাত্য-নিয়মে শিক্ষা  
করিলে উত্তম শিক্ষা হয় না। দেশীয় ধনবানেরা কেহ শাস্ত্ররক্ষায়  
মনোযোগী হইলে তিনি যেন চতুর্পাঠীর নিয়মে শিক্ষার ব্যবস্থা  
করেন, ইহাই জ্ঞানরত্ন মহাশয়ের ইচ্ছা। সেসময় করিতে হইলে, ঐ

তিয় বিভাগ প্রস্তুত করিতে হইবে। পল্লবগ্রাহী অধ্যাপক নিযুক্ত না করিয়া, প্রত্যেক বিভাগে কৃতশ্রম শ্রুধী অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে। নানা বিষয়ের ভার মস্তকে অর্পণ করিবার পরিবর্তে, ছাত্রগণ এক বিষয়েই আত্মোপাস্ত যাঁহাতে গাঢ়রূপে চিন্তা করিতে পারেন, তাহার অবসর দিতে হইবে। কেবল অধ্যয়নে শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যায় না। শাস্ত্রীয়-সমাজের একজন অদ্বিতীয় নেতা রঘুনাতথশিরোমণি লিখিয়াছেন “অধ্যয়ন ভাবনাভ্যাং সারং নির্ণয় নিখিল-তদ্রাগাং। দীধিতিমধিচিন্তামণিস্তনুতে তার্কিক-শিরোমণিঃ শ্রীমান্।” দর্শন-শাস্ত্রের অন্ততম নেতা মনীষিচূড়ামণি গদাধর ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন “পাঠো বৃথা চিন্তনমন্তরেণ।” ৬মহতব্চাঁদ, ৬ প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি যে সকল বিদ্যোৎসাহী প্রাচীন-ধনবানের বিষয় ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ সকল বিষয়েই দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা বিজ্ঞানমন্দিরাদি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়েও মুর্শিদাবাদের দেশ-হিতৈষিনী বিদ্যুৎপালিনী রানী শ্রীমতী আম্মাকালী দেবী প্রভৃতি দূরদর্শিনী ও দূরদর্শিগণ পূর্বোক্ত নিয়ম সকল সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া দেশীয় বিজ্ঞান বিস্তার করিতেছেন। পাশ্চাত্য-নিয়মে আলোচিত শাস্ত্রের কিরূপ দুর্দশা হয়, তাহা নিম্নলিখিত সংস্কৃত-শ্লোকটির দ্বারা জ্ঞানরত্ন মহাশয় কোনও সময় অদ্বুত ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

অন্বীক্ষাদিকভারতী স্মৃতিময়ী বাণী সभागामिनी  
 দানীমালপতীতি রোদনবতী পাশ্চাত্যবিদ্যালয়ে ।  
 যক্তিঃ সঙ্কতিসংহতিঃ কুমতিभिः সংघातिता मादृशां  
 हाहा नृत्यपरा चरामि च कथं विद्यार्थिकयहाश्रिता ॥

### মর্ম্মার্থ ।

সভারে নেহায়ে যদি বিদগ্ধ-সঙ্কুল  
অধুনা যতক শাস্ত্র কেঁদেই আকুল !  
সভায় প্রবেশি তারা সক্রম ভাবে  
পরিচয় দিতে থাকে বিদ্বানের পাশে,  
“পাশ্চাত্যের বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য-প্রথায়  
ক্রমশঃ হ’তেছে দেখ কি হৃদশা হয় !  
সব শক্তি গেছে ঘুচে, নড়াচড়া ভার,  
ভাবি শুধু কি হ’বে গো, কি হ’বে এবার !  
কেমনে আমরা আর নৃত্যপরা হ’য়ে  
বিজ্ঞার্থি-মুবার আহা ক’ঠ আলিঙ্গিয়ে,  
পূর্বমত সভা মাঝে করিব বিহার,  
বল গো মোদের হৃৎকণ্ঠে কি আর ?”  
সভায় গেলেই এট মর্ম্মভেদি-খেদে  
দ্বুতি-তর্ক যত শাস্ত্র ডাক ছেড়ে কাঁদে !!

জাগরত মহাশয়ের কানীয়াস উপলক্ষ করিয়া তাঁহার পূর্বাচরিত  
জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হইল। এইখানেই আমরা পাঠকগণের নিকট  
বিদায় লইতেছি। বর্তমান-সমাজের সম্পূর্ণ রোচক করিয়া জাগরত  
মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সকল এই গ্রন্থে আমরা বিবৃত করিতে পারি নাই।  
জাগরতমহাশয় নিঃস্বার্থ-ভাবে সম্পূর্ণ দ্বি-নিঃস্বার্থে আত্মমত প্রকাশ  
করিয়াছেন। মহাবীরা, সর্বজনীন-প্রীতিপ্রদ না হইলেও কল্যাণকর  
সত্যের আদর করিতেন। এ কারণ, অনেক বিষয় লিখিয়া মহাবী-  
রণকে তাঁহাদের বংশধরগণের নিকট সময়ে সময়ে পাগল সাজিতে হই-



তেছে। ঐশ্বরিক অদ্বুত-কাহিনীসকল লিপিবদ্ধ করিয়া সময়ে সময়ে উপকথা-প্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হইতেছে। কিরূপ লিপি কোন্ সম্প্রদায়ের অবিখ্যাত ও অগ্রাহ্য হইবে, কিরূপ লিপির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, কিরূপ লিপি কোন্ সময়ে অপমানের হেতু হইবে, তাহা ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ বিলক্ষণ জানিতেন। তথাপি তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, লেখকতা করিতে হইলে সর্বজনীন-প্রীতির দিকে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা, কল্যাণকর সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করাই প্রয়োজন। জ্ঞানরত্নমহাশয়ও, সেই হেতু নিবন্ধন প্রাচীন-সমাজের বহু সারবত্তার প্রশংসা এবং আধুনিক-সমাজে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা বহু অসার-বস্তুর উপর কটাক্ষ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ভূমিকায়ই আমরা ব্যস্ত করিয়াছি, বর্তমান-সমাজে শিক্ষা অপেক্ষা সমালোচনার স্রোতই প্রবল। সমাজে যখন শিক্ষার স্রোতঃ প্রবল ছিল, তখন লৌকিক-বুদ্ধি, লৌকিক-যুক্তি ও লৌকিক-তর্কে পরিচালিত হইয়া সকলে সকল বিষয়ে কথা কহিতেন না। প্রাচীনেরা বুঝিতেন, লৌকিক-বুদ্ধি, লৌকিক-তর্ক ও লৌকিক-যুক্তির প্রামাণ্য অতি অল্প। আজ বাল্যকালে তোমার সহস্র উপদেশে আমি যে কথা বুঝিলাম না, যে কথার বিরুদ্ধে অথওনীয় সহস্র সহস্র প্রতিবাদ অন্তর আমার মনে উদ্ভূত হইতে লাগিল, কুলা যৌবনে অনেক-স্থলে বিনা তর্কে, বিনা উপদেশে, আমি সেই কথাই বুঝিয়া ফেলি। পরবশে বার্ককে আবার আর এক প্রকার অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হই। যদি বার্ককের পর প্রত্যক্ষগোচর আরও দুই চারিটা অবস্থা থাকিত, তাহাহইলে তখনও বোধ হয় আরও নব নব সিদ্ধান্তে চিত্ত সমাহিত হইত। এ কারণ, আত্ম-সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র প্রামাণ্য-বুদ্ধি না করিয়া পূর্বে বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতি সমুদয় সামগ্রী শাস্ত্রাহুকুল করিতে আধ্যসমাজ

শিক্ষা করিত। হিন্দুশাস্ত্র এমনই সামগ্রী যে, ইহাতে ধর্ম-নীতি, স্বভাব-নীতি, আচার-নীতি, ব্যবহার-নীতি কিছুই অভাব নাই। নৈতিক-আলোচনায় সকল নীতি বিষয়েই প্রকৃত-শাস্ত্রজ্ঞগণের দৃষ্টি খুলিয়া যাইত। লোকে অতি শৈশবাবস্থা হইতে শাস্ত্রজ্ঞ-স্তম্বর গৃহে বাস করিয়া, তাঁহার আচার, ব্যবহার, মনোভাব, শিক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে নিজ-মনোবৃত্তি গঠিত করিত। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের অবস্থা এক্ষণে আর পূর্ববৎ নহে। যদি এই পুস্তকে মহাপুরুষের মানিকর কোনও বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে, যদি মহাপুরুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুদ্ধিতে ভ্রম করিয়া অশ্রুভাবে কোনও বিষয় বিবৃত হইয়া থাকে, তাঁহাকে ধার করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত প্রচার করিবার জন্ত কোথাও যদি চেষ্টা করা হইয়া থাকে, যদি সিদ্ধ-প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে কোনও সিদ্ধান্ত চলিয়া থাকে, তবে বুদ্ধাচারের পক্ষপাতী, সেই কাণীবাসী দেশবৎসল বৃদ্ধমহাত্মা এই গ্রন্থকারকে ক্ষমা করুন।

অনেক-ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমার জীবনে যাহা শোভাকর, তোমার জীবনে তাহা শোভাকর নহে। ভৃত্য-জীবনে যাহা শোভাকর, প্রভু-জীবনে তাহা শোভাকর নহে। প্রজার জীবনে যাহা শোভাকর, রাজ্যের জীবনে তাহা শোভাকর নহে। বীর-জীবনে যাহা শোভাকর, বিপ্র-জীবনে তাহা শোভাকর নহে। পুরুষ-জীবনে যাহা শোভাকর, নারী-জীবনে তাহা শোভাকর নহে। যাহারা নবীনশিক্ষিত নব-সংস্কারের প্রয়াসী, তাঁহাদের জীবনে হয়তো সংস্কার-চেষ্টা, প্রাচীন-সমাজের সারবস্তায় অবিশ্বাস, প্রাচীনগণের বুদ্ধিমত্তায় অপ্রামাণ্য-বুদ্ধি, স্ব-স্ব-প্রধান বুদ্ধিজালে নির্ভর প্রভৃতি শোভাকর হইতে পারে। কিন্তু স্ভারয়ত্মমহাশয়ের জীবনের পক্ষে সেগুলি শোভাকর বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। প্রাচীন-সমাজ রক্ষা, শাস্ত্রতত্ত্ব-

নির্ণয়ে প্রাচীনগণের বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বাস, নবসংস্কারপ্রয়াসিগণের প্রতি উপেক্ষা, প্রাচীনাবলম্বিত-শাস্ত্রসমূহের সারবত্তা-প্রকাশে যত্ন, স্বেচ্ছাচার-নিবারণ-পক্ষে আগ্রহ, ইত্যাদি কার্য্যই ভ্রায়রত্ন মহাশয়ের জীবনের শোভাস্পদ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভ্রায়রত্নমহাশয়ের জীবনে যাহা শোভাস্পদ হওয়া উচিত, ভ্রায়রত্নমহাশয়ের জীবন যে তদ্বারাই গঠিত, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য বিবিধ সমালোচনা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। ভ্রায়রত্নমহাশয়ের জীবনে যাহা শোভাকর, সকলের জীবনে যে তাহা শোভাবর্দ্ধক, এমন কথা আমরা বলি নাই। যাহারা এই সকলের বিরুদ্ধবাদী ও প্রতিষ্ঠিত, হইতে পারে তাঁহাদের জীবনের পক্ষে তাঁহাদের সিদ্ধান্তই শোভাসম্পাদক। অতএব ভ্রায়রত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি কেহ মত প্রকাশ করেন, তাঁহার জীবনের তাহা শোভাসম্পাদক, এই বিশ্বাসে আমাদের কোনই আপত্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

নিষ্ঠাপূতকলেবরে ক্ষিতিস্থরে প্রোদ্যৎযশোভাস্থরে  
ভক্তিক্রীতমহেশ্বরে হিতকরে শাস্ত্রৈকসেবাপরে ।  
ধীরে ধৈর্য্যধরাধরে গুণধরে কারুণ্যধরাধরে  
রৌষো মান্ত চরাচরে মতিমতাং সদৃজ্ঞানরত্নাকরে ॥



মহামহোপাধায় ক্রীযুক্ত রাখালদাস ঝায়রত্ন মহাশয়ের

হস্তাক্ষর ।

শ্রীদুর্গ

কৈবল্যগগনসাহসী মূৰ্ধন্যসী কালীচক্ৰবল্যদা  
মুক্তকৈবল্যমেষজাতিভগবানস্তমহা মূৰ্ধন্যদা  
গাগবদ্য বিজ্ঞপ্তিসি—দিকগজযোনিমূদাচানন্দা  
ক্ৰীমমূৰ্ধে বিপদাম্পদেপম্পদেবীভবনাভীষাঙ্গি ।







